প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯০

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যালোক। ৩১/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলিকাতা ৬

প্রকাশকের নিবেদন

ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, ছন্দশাস্ত্রবিদ্, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের গবেষক, এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় স্মরণে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও প্রথিতযশা সাহিত্যসমালোচক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই সঙ্কলন সম্পাদনা করেছেন। বঙ্গ-বিহার-অসমের উনিশজন অধ্যাপক ও কৃতী পুরুষ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে স্মৃতিকথা লিখেছেন এবং তাঁর সৃষ্টি ও সাধনার পর্যালোচনা করেছেন। মাননীয় সম্পাদক ও লেখকদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হল। আমরা তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। প্রুফ সংশোধনে দাশরথি মুখোপাধ্যায় এবং অশোক উপাধ্যায় সাহায্য করেছেন। এঁদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ। আশা করি, অমূল্যধন-অনুরাগী-সমাজ এই গ্রন্থপাঠে তৃপ্ত হবেন।

লেখক-পরিচিতি

তারাপদ মুখোপাধ্যায় : কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান।

যতীন্দ্রনাথ তালুকদার : ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূতপূর্ব চীফ সেক্রেটারী।

শৈবালকুমার গুপ্ত : ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য ও কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ, জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে সবিশেষ পরিচিত।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। বঙ্কিম পুরস্কার বিজয়ী।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত : গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রীডার। কবি, প্রবন্ধকার, ছন্দ-গবেষক।

শোভনলাল মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং কলা বিভাগের ভূতপূর্ব ডীন।

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর কলেজের বাংলার অধ্যাপক (অবসর-প্রাপ্ত)।

অলোক রায় : স্কটিশচার্চ কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু : দেশবন্ধু গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত)।

প্রণব মিত্র : চক্রধরপুর কলেজে (বিহার) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান।

রঞ্জিত সিংহ : কবি ও প্রবন্ধকার। 'শ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি' নামক আধুনিক বাংলা কবিতা-বিষয়ক গ্রন্থপ্রণেতা।

ভূদেব চৌধুরী : কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক।

অজিতকুমার ঘোষ : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান এবং কলা বিভাগের ভূতপূর্ব ডীন।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক।

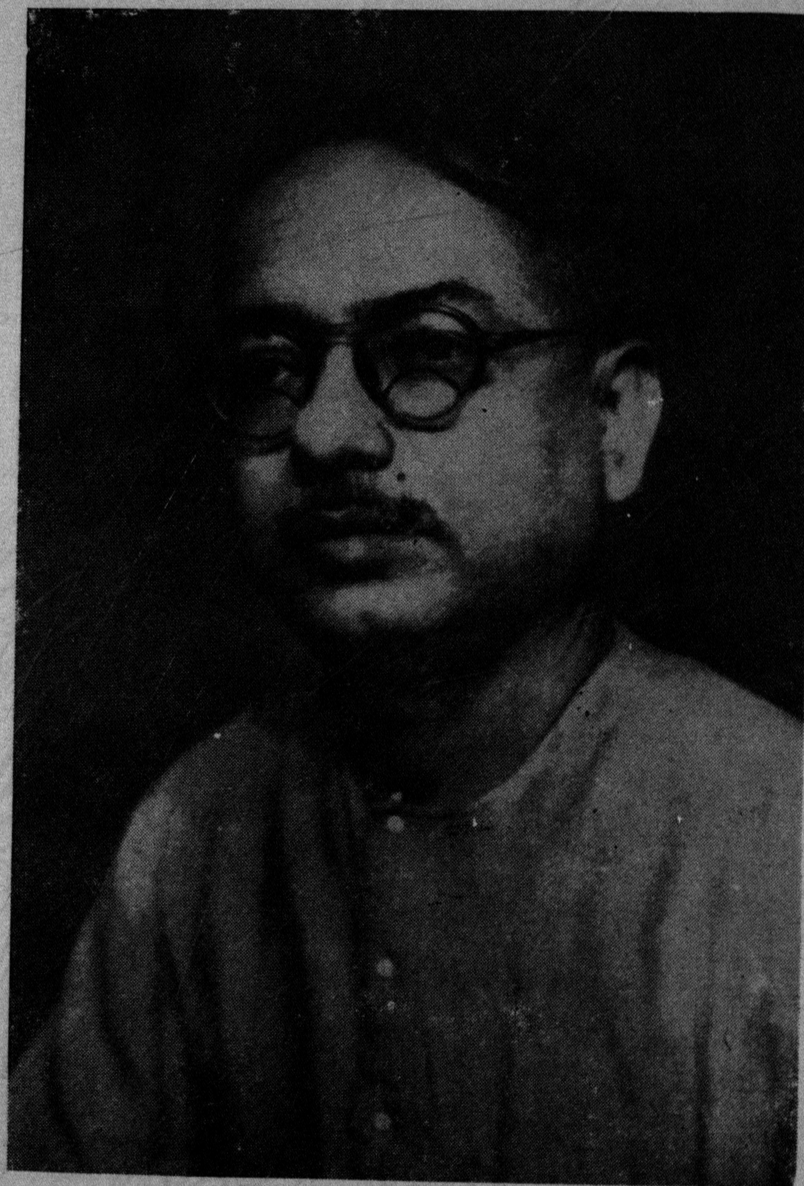
অপূর্বকুমার রায় : গুরুদাস কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অতিথি অধ্যাপক।

অনন্তলাল গঙ্গোপাধ্যায় : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সচিব এবং রবীন্দ্রভারতী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অতিথি-অধ্যাপক; গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ ও হুগলী মহসীন কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক।

আদিত্য ওহ্‌দেদার : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক।

নির্মলেন্দু ভৌমিক : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রীডার।

সূচীপত্র



অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় (১৯০২—১৯৮৪)

বন্ধু অমূল্যধন

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

অমূল্যধন ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি তার বন্ধু, আবার ভক্তও বটে। আমাদের দুজনের মধ্যে ছিল গভীর সম্প্রীতি, যার সূচনা হয়েছিল ছাত্রজীবনে। ছাত্রজীবনের স্তর পেরিয়ে কীভাবে তা পৌঁছেছিল পারিবারিক পর্যায়ে তা এক আশ্চর্য কাহিনী।

অমূল্য সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে ভালো করে না লিখতে পারলে না-লেখাই উচিত। আমার শরীর এখন ভেঙে গেছে, চোখে ভালো দেখি না, কানে কম শুনি। তাই অমূল্য সম্পর্কে লিখতে বা বলতে দ্বিধা করি।

হিন্দু হস্টেলে আমাদের উভয়েরই আস্তানা ছিল বটে, কিন্তু অমূল্যর সহপাঠী আমি ছিলাম না। ওর থেকে এক বছরের জুনিয়র। ১৯২০-২২ সাল। পড়ি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. অনার্স। বিষয় ইংরেজি। হিন্দু হস্টেলের চার নম্বর ওআর্ডে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গী অমূল্য। আদৌ একঘরের সাথী ছিলাম না আমরা। কিন্তু ঘটনাচক্রে একটা অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত ঘটে গেল। তখন কি ভেবেছিলাম, এই বন্ধুত্বের যাত্রাপথ থাকবে আমৃত্যু প্রলম্বিত। এক রাতে অমূল্যর খুব ডায়রিয়া হলো, তার ঘরে সেদিন রুম-মেটরা কেউ নেই—সুতরাং আমাকেই জেগে থেকে সারারাত ধরে তার শুশ্রূষা করতে হলো। এভাবেই আমাদের বাল্যসখ্যের সূত্রপাত।

স্বাস্থ্য তার কোনোদিনই ভালো ছিল না। বরাবরই দুর্বল। ছোটখাট ক্ষীণ-জীবী মানুষ। কিন্তু তখনই আবিষ্কার করেছিলাম ওই স্বল্প পরিসরের আকারের মধ্যেই নিহিত বিরাট প্রতিভাকে। মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'চয়নিকা' সঙ্কলনটি তখন আমাদের উত্তপ্ত আলোচনার বিষয়। সেই আলোচনার সময়ে দেখতাম, একটা গভীর 'ইনসাইট' ছিল অমূল্যর, যা দিয়ে নিজস্ব স্বতন্ত্র মাত্রায় যে-কোনো বস্তুকে সে বিচার করতে পারত। বোধের, অনুভবের, রিয়ালিজেশনের এক ধরনের গূঢ়তা ও গভীরতা ছিল। আর ঈর্ষণীয় ছিল অমূল্যর প্রখর স্মরণশক্তি। তখন সে সত্যেন দত্তর কবিতার বেশ ভক্ত। প্রায়ই আপনমনে আবৃত্তি করত 'কুহু ও কেকা' কাব্যের কবিতা। এছাড়া অমূল্যর প্রিয় ছিল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গবেষণা। এবিষয়ে সেদিন আমাদের

কল্পনার তো অন্ত ছিল না। আমাদের এইসব সাহিত্যের আড্ডায় বেশির ভাগ সময়েই মধ্যমণি হতো অমূল্য। তখনকার খুব নামজাদা ইংরেজির অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের (শ্রীঅরবিন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা) স্নেহধন্য ছাত্র ছিল অমূল্য। আবার অমূল্যর কাছে আমরা কতো কী জানতাম, কতো দামি কথা 'নোট' করেও রেখেছিলাম।

হিন্দু হস্টেলে অমূল্যর বসবাসের মেয়াদ ছিল মাত্র দু' বছর। বি. এ. পরীক্ষা দেবার পর এম. এ. পড়ার কোনো সঙ্কল্প তাঁর মাথায় ছিল না। তার কারণ অমূল্যর জীবনটা আদৌ মসৃণ ছিল না। আর্থিক অনটন আর সাংসারিক দায়িত্বের কারণে পড়াশুনার থেকে একটা চাকরিই তখন তার বেশি দরকার। কমপিটিটিভ পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল অব্ বেঙ্গলের অফিসে অমূল্য একটা চাকরি নিল। পদটার নাম যতদূর মনে পড়ে 'ডেপুটি অ্যাকাউন্টস্ অফিসার'। তখন সে আমাদের নানা রকম মজার গল্প বলত—একবার নাকি সে চেক তৈরী করে "গবর্ণরকে বেতন দিয়েছিল"। অবশ্য এই চাকরিটা তার পক্ষে বেশিদিন করা সম্ভব হয়নি, কারণটা তার শারীরিক দুর্বলতা। বয়সের অনুপাতে দেহের ওজন কম ছিল এবং চোখও ভালো ছিল না। সেকারণে সরকারী চাকরিটা তাকে খোয়াতে হয়।

এসময় কলকাতাবাসের খরচ চালানোর জন্য অমূল্যকে প্রাইভেট ট্যুইশন করতে হোত। প্রখ্যাত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ভাইপো হেমকে সে পড়াত। থাকত ধীরেন্দ্রনাথ সেনের (যিনি পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হন) সঙ্গে মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের একটা মেসে। সময়টা ১৯২৪-২৫ সাল। এসময়ে আমার সঙ্গে তার যোগাযোগটা কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও যখনই দেখা হোত, এম. এ. পরীক্ষাটায় বসে যাবার জন্য তাকে চাপ দিতাম। আমাদের নিশ্চিন্ত ধারণা ছিল, অমূল্য ফার্স্ট ক্লাস তো পাবেই, ফার্স্টও হতে পারে। আমাদের এই অনর্গল তাগাদায় অমূল্য এম. এ. পরীক্ষা দিল। এবং সে ফার্স্ট ক্লাস পেল। পিনাকীরঞ্জন মিত্র হলেন ফার্স্ট, অমূল্য সেকেণ্ড। তবে 'প্রবন্ধ লেখার পেপারে' সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিল অমূল্য।

ইতিমধ্যে আমার জীবনেও অজস্র ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে। আইন পড়তে পড়তে তিন-চার মাসের ব্যবধানে বাবা-মা উভয়েই মারা গেছেন। বাড়িতে

অভিভাবক বলতে শুধু ঠাকুমা, আর আছে ছোট দশ বছরের বোন। এম. এ. পরীক্ষা দেবার নানারকম বাস্তব প্রতিকূলতা দেখা দিল। জ্যাঠামশাই বললেন, 'আর পড়াশুনায় কাজ নেই, এবার জমি-জায়গা দেখ।' কিন্তু কোনো কোনো আত্মীয় ও বন্ধু বোঝাল পরীক্ষা দেবার কথা। পরীক্ষা দিলাম এবং ফার্স্ট ক্লাস ফোর্থ হলাম। অমূল্য ইতিমধ্যে পাশ করেই অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে রংপুর কারমাইকেল কলেজে চলে গেছে। ঐ কলেজে তখনকার কিছু নামকরা অধ্যাপক ছিলেন। যেমন দর্শনের গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, ইতিহাসের হরেন চন্দ্র, ইংরেজির হৃদয়রঞ্জন লাহিড়ী—এঁরা সকলেই অমূল্যকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন। অধ্যক্ষ ডি. এন. মল্লিকের সস্নেহ সহানুভূতিও অমূল্য পেয়েছিল। তাছাড়া স্কলার ছাত্র হিসাবে তখন তার যথেষ্ট নামডাক। গৌরগোবিন্দবাবু ছিলেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রথম তিনজন ছাত্রের অন্যতম; অপর দুজন হলেন, কবিপুত্র রথী ঠাকুর আর সন্তোষ মজুমদার। গৌরগোবিন্দবাবুর উৎসাহ আর প্রেরণাতেই অমূল্য বাংলা ছন্দের গবেষণার কাজটা আরম্ভ করেছিল।

অমূল্যর সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছিল যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ার সময় সে রামপুরহাটে আমাদের গ্রামের বাড়িতে গেল। সময়টা ১৯২২ সাল। রামপুরহাট স্টেশনে নেমে গোরুর গাড়িতে চড়ে একেবারে ভিতরের দিকের গ্রাম—নাম সন্ধ্যাজোল। অজ পাড়াগাঁ। কলেজে-পড়া লোক বলতে কেবল অমূল্য আর আমি, আর তখনকার এনট্রান্স-পাশ স্কুলের মাস্টারমশাই। এর মধ্যে গিয়ে পড়ল অমূল্য। কিন্তু অমূল্য ছিল ভারি অদ্ভুত মানুষ। শিক্ষা-দীক্ষা-বুদ্ধি-সংস্কৃতি সমস্ত ব্যবধান অবলীলায় অতিক্রম করে মুহূর্তে মিশে যেতে পারত গ্রামের লোকেদের মধ্যে। অমূল্যকে পরিচর্যা করার মতো, সমাদর করার মতো আমাদের কিছু ছিল না। শুধু পুকুরে অঢেল মাছ। বললাম, 'তোমার আতিথেয়তা আর কোনোভাবে তো করতে পারবো না। প্রাণভরে মাছ খাও।' তো অমূল্য মাছ খেতে খুব ভালবাসত, বেশ তৃপ্তি করে মাছের ঝোল-ঝাল টক-অম্বল খেয়েছিল।

দ্বিতীয়বার অমূল্য আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল আমার বিয়ের সময়। কলকাতা থেকে একদল বন্ধু সাঁইথিয়ার কাছে অণ্ডালে বরযাত্রী গিয়েছিলেন। অমূল্যও ছিল এই দলে। বিয়ে-টা চুকে যাবার পর এঁরা কলকাতা ফিরে যান। অমূল্য কিছুদিন আমাদের বাড়িতে ছিল। সেই সুবাদে আমাদের

মধ্যে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা আরো গভীর হয়েছিল।

ইতিমধ্যে শোনা গেল, আশুতোষ কলেজে নাকি ইংরেজির নতুন অধ্যাপক নিয়োগ হবে। ভালো ছাত্র হিসেবে আশুতোষ কলেজের কর্তা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অমূল্যর নামটাই মনে ছিল। উনি বললেন, 'অমূল্য কি পারবে আশুতোষ কলেজে চাকরি করতে?' আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'রংপুর কলেজ তো আশুতোষ কলেজের চেয়ে ছোট নয়।' যাই হোক, অবশেষে রংপুর কলেজ থেকে আশুতোষ কলেজে অমূল্যকে তিনিই নিয়ে এসেছিলেন ১৯৩৮ সালে। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগে পার্টটাইম অধ্যাপনার দায়িত্বও অমূল্য কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছিল। ক্রমে তার সব বিষয়ে অধিকারের বৃত্তান্ত সবাই জানতে পারে। ইংরেজি তো অমূল্যর নিজের বিষয়, তা ই পড়াতো। আশুতোষ কলেজে বাংলাও পড়িয়েছে। বাংলা আর সংস্কৃতে গভীর জ্ঞানের পরিচয় ঐ ছন্দের গবেষণা। অঙ্ক জানত খুব ভালো, সবচেয়ে গভীর ধারণা ছিল অ্যালজেব্রার। বাংলায় কৃতিত্বের পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক, যেটা দেওয়া হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পরীক্ষায় বাংলায় শীর্ষস্থানীয়কে।

এর মধ্যে আবার বিয়ে-থা করে গ্রোয়িং ফ্যামিলি অমূল্যর। বড় সংসারে যতোটা উপাজন হলে সাফল্যের মুখ দেখা যায়, সেই অনুপাতে উপার্জন তার ছিল না। সন্তানদের সম্পর্কে দুঃখ-অভিমান-গবর্বোধ সব কিছুই সংগত মাত্রায় মিলেমিশে ছিল তার ভিতরে। পরিণত বয়সে আমাদের হৃদ্যতা আরও গাঢ়, আরও উষ্ণ হয়ে ওঠে। রবিবার সকালের দিকে আসত আমার বাড়িতে। চা খেতাম, গল্প-গুজব করতাম। মাঝে মাঝে ক্ষোভ প্রকাশ করত। আমি দু'চার কথায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতাম। বেশির ভাগ দিনই লক্ষ্য করেছি, অমূল্য যে 'মুড' নিয়ে আমার বাড়িতে আসত ফিরে যাবার সময় তা বদলে গেছে, বেশ তাজা মন নিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

যে কথাটা বারবার বলতে ইচ্ছে করে তা হলো—অমূল্যর কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমি নানা বিষয় শিখেছি—ইংরেজি, বাংলা। ওর ভিতর যে দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা আর বিশ্লেষণের গভীর অথচ নিরপেক্ষ দৃষ্টি ছিল তা আমাকে আকৃষ্ট করতো, মুগ্ধ করতো। যে কোন বিষয় কঠিন হলেও তার ভেতরে এত দ্রুত পৌঁছে যেতে পারত অমূল্য—আর সেজন্যেই সেকালের দুই নামজাদা অধ্যাপক

পি. সি. ঘোষ আর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় হয়ে উঠেছিল অমূল্য। শ্রীকুমারবাবুর কাছে প্রেসিডেন্সি কলেজের টিউটোরিয়ালে অমূল্য কখনো শতকরা আশির কম নম্বর পায়নি। শেক্‌স্‌পীয়ারের ট্রাজেডি পড়তে খুব ভালবাসত অমূল্য, বিশেষ করে 'কিং লিয়র' প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই বলত, 'ক্যারেকটার ক্রিয়েশনে কিং লিয়রের জুড়ি নেই।' কখন কখন আমরাও ঠাট্টা করতাম, 'তোমার দেখছি আজ "কিং লিয়র"-মুড এসেছে।' কোলব্রীজের অ্যানসিয়েন্ট মেরিনার দারুণ পড়াতেন শ্রীকুমারবাবু; আর, পি. সি. ঘোষের শেক্‌স্‌পীরীয় ট্রাজেডির বক্তৃতা বিখ্যাত ছিল। টেনিসন, ম্যাথু আর্নল্ড, ব্রাউনিং—এ সমস্ত ভিক্টোরীয় কবিদের কবিতা দুর্দান্ত পড়াত অমূল্য। মনে পড়ে ব্রাউনিং-এর 'Barrow' পড়াতে পড়াতে তার যেন বাহ্যজ্ঞান থাকত না।

আমরা দুজনে দুজন মাস্টারমশাইয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলাম। মনোমোহন ঘোষ অমূল্যকে খুব স্নেহ করতেন আর হোম্ সাহেবের বিশেষ ভক্ত ছিলাম আমি। উনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন, বেশ ভারি ভারি নম্বর দিতেন।

মনে পড়ছে বাঁশবেড়েতে অমূল্যদের বাড়িতে একদিন গিয়েছিলাম। যাওয়াটা ঠিক লক্ষ্যে নয়, যতটা উপলক্ষ্যে। কালনায় ছোটবোনের বাড়ি থেকে ফিরছিলাম ট্রেনে। দুর্ভাগ্যবশত বাঁশবেড়ে স্টেশনে এসেই ট্রেনটা 'ডিরেল্ড' হয়ে গেল। অনির্দিষ্ট সময় বসে থাকা। ভাবলাম নেমে চলে যাই অমূল্যর বাড়িতে। রাতটা কাটিয়ে সকালে চলে যাবো কলকাতায় নিজ গন্তব্যে। ব্যাস্। নেমে গেলাম। বেশ লেগেছিল সেবার। অপ্রত্যাশিত আনন্দ। অমূল্য ও তার ভাইদের সঙ্গে অনেক গল্পগুজব হলো। মনে পড়ছে সেবার সঙ্গে করে অনেক গঙ্গার ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছিলাম। আমাদের পারিবারিক হৃদ্যতাটা এই সময়ে খুব বেশি ছিল।

তখন আমি দক্ষিণ কলকাতায় প্রথমে পরাশর রোডে থাকতাম, পরে ল্যানস্‌ডাউন রোডে উঠে এসেছিলাম। অমূল্য থাকত লেক রোডে। সেটা ১৯৩৮-৩৯ সালের কথা। একদিন ওর বাড়িতে একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ওর সেজ ছেলে অজয় দোতলার বারান্দা থেকে একতলার শান-বাঁধানো উঠোনে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন অমূল্য বাড়ি ছিল না। আমি খবর পাওয়া মাত্র একগোছা নোট আর একটা ট্যাক্‌সি নিয়ে বেরিয়ে অমূল্যর বাড়িতে গিয়ে অজ্ঞান ছেলেটিকে নিয়ে সোজা রওনা দিলাম মেডিকেল কলেজে। আঘাতটা

খুবই সিরিয়াস ছিল। মাথা ফেটে ব্রেনটা পর্যন্ত বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। কর্ণেল পঞ্চানন চ্যাটার্জি তাকে চিকিৎসা করেছিলেন। দিন সাতেক লড়াই করে ঐ ছেলে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসে।

আমাদের দুজনেরই বয়স বাড়ছিল সুস্থতা-অসুস্থতার মধ্য দিয়ে। অমূল্য তো কোনদিনই সুঠাম সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল না। শেষজীবনে হার্ট-ব্লকেডের ফলে তাকে বুকে পেস-মেকার লাগাতে হয়। এই সময়ে যোগাযোগটা আবার একটু ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, কারণ সিঁড়ি-ভাঙা বা বেশি হাঁটা-চলা তো তখন ওর বারণ। এটা হল ১৯৭৩-এর পরবর্তী বছর দশেক। তা সত্ত্বেও মাঝে-মাঝেই অমূল্য সকালের দিকে ট্রামে চলে আসত আড্ডা দিতে। ভালোই হতো, মনের ভার কিছুক্ষণের জন্য লাঘব হতো, দুই বন্ধুতে মনের সুখে গল্প করতাম।

একবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির বিভাগীয় প্রধান হবার জন্য অনুরোধ অমূল্যর কাছে আসে। নির্বাচকদের কাছে অমূল্যর নামটিই প্রস্তাবিত হয়েছিল। অনেক প্রার্থীরই ইন্টারভিউ হচ্ছিল, কিন্তু যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশ্য অমূল্য শেষ পর্যন্ত এই অফারটা নেয়নি। তখন ভবতোষ চাটুজ্জেকে পাঠানো হল।

অমূল্যর ইংরেজি সাহিত্য-গবেষণার একটি অসামান্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে প্রকাশিত শেক্‌স্‌পীয়র স্মারক গ্রন্থে, প্রবন্ধটির নাম: 'দ্য লাষ্ট লাইনস্ ইন্ শেক্‌স্‌পিরীয়ান ট্রাজেডি'। শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিটি ট্রাজেডি-নাটকের শেষ পঙক্তির এতো বিস্তৃত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও পাণ্ডিত্যসমৃদ্ধ আলোচনা আর দেখিনি।

অমূল্য অবশ্য যশস্বী হয়েছে ছন্দ-গবেষণায়। আর সে-গবেষণা কেবল বাংলা ছন্দে নয়, সংস্কৃত ছন্দেও। 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' প্রথম বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বাংলা ছন্দ-গবেষণা। এই বইটি বহুকাল অ্যাকাডেমিক প্রয়োজন মিটিয়েছে, ভবিষ্যতেও নানা দিক থেকে দিগ্‌দর্শী হয়ে থাকবে। আমাদের সবরকম ছন্দ-জিজ্ঞাসাকে উস্‌কে দিতে পারে এই বই। শেষবয়সে অমূল্য এর চেয়ে বড় গবেষণা করেছে। নিজ বাড়িতে আর আমার বাড়িতে বসে সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন ও আধুনিক য়ুরোপীয় আর ভারতীয় ভাষার ছন্দের ব্যবহার নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। এই ব্যাপক গবেষণার ফল আমার মনে হয় তার লেখা : **Sanskrit Prosody : Its Evolution** গ্রন্থটি। 'বাংলা ছন্দের

মূলসূত্র' বইয়ের চেয়ে এই কাজটি আরো বেশি মূল্যবান। এটি সম্পর্কে সুনীতি-বাবু (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) লিখেছিলেন, 'এমন কাজ কি আর দ্বিতীয় কেউ করতে পারবে ?'

আমার ভারি কষ্ট হয় এই ভেবে যে, অমূল্যর মধ্যে এমন একটা বিরল প্রতিভা ছিল, অথচ সমস্ত জীবন আর্থিক অপ্রাচুর্য তাকে পীড়ন করে গেল। মাঝে মাঝে তার মধ্যে অসহিষ্ণু অভিমান আর বিক্ষোভ যে জাগত না তা নয়, কিন্তু মূলত মানুষটি ছিল ধীর স্থির শান্ত। উত্তেজনা, ক্রোধ বা সংকটে তাকে বেশিক্ষণ অস্থির থাকতে দেখিনি। চরিত্রের এক ধরনের সরল ঔদার্য দিয়ে এই জাগতিক অপ্রাপ্তির ব্যথাকে মুহূর্তে নস্যাৎ করতে পারত অমূল্য। খোলামেলা আমুদে মিশুকে আর কোমল স্বভাবের মানুষ ছিল অমূল্য। সকলের সঙ্গে মিশে যেতে পারত, যে কোন রকমের দূরত্বকে অনায়াসে লঙ্ঘন করে।

বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী অর্জন করতে গেলে যে উদার অমলিন হৃদয়ের অধিকারী হওয়া দরকার, সেইরকম নিরহঙ্কার স্বচ্ছ ব্যক্তিত্বই ছিল অমূল্যের ঐশ্বর্য। সাংসারিক অনটন তাকে নির্যাতিত করেছিল বটে কিন্তু নিঃস্ব হতে দেয়-নি। সমবয়সী এবং অসমবয়সী অজস্র বন্ধুধনে ধনাঢ্য ছিল অমূল্যধন; লাভ করে-ছিল তার অধ্যাপকদের অকৃপণ স্নেহ মমতা আর সহযোগিতা। আর আমরা যে-কালে কলকাতায় ছাত্র ছিলাম, সে সময়টা ব্রিটিশ শাসিত হলেও, সেই ১৯২০-২২ সালের কলকাতা ছিল পৃথিবীর সর্বোত্তম নগরী। সেই স্বর্ণযুগে আমাদের প্রধান মানসিক আহার ছিল প্রাণের আশ মিটিয়ে সাহিত্যচর্চা। অর্থকষ্ট আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনকে অল্পবিস্তর আহত করেছিল, কিন্তু সাহিত্য আবাহনের অবাধ সুযোগ এবং ঘনীভূত সম্পর্কের উত্তাপ আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করে রেখেছিল। ক্ষীণকলেবর কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত অমূল্যধন ছিল আমাদের মধ্যেকার এক উজ্জ্বল রত্ন। তার স্মৃতি আমৃত্যু আমাকে ঘিরে থাকবে।

---

২৭ এপ্রিল ১৯৮৬ তারিখে লেখকের বাসভবনে গৃহীত বক্তব্যের হুবহু অনুলিপি

সহপাঠী অমূল্যধন

যতীন্দ্রনাথ তালুকদার

অমূল্য আমার স্কুলের সতীর্থ। আমি পড়তাম উত্তরবঙ্গে দেবীগঞ্জ হাইস্কুলে। এখনো মনে মনে স্কুলের বাড়ি আর মাঠের দৃশ্য দেখি। একতলা বাড়ি ; অনেক ঘর। সামনে খেলার মাঠ। তারপর ধানের ক্ষেত। সেটা পেরিয়ে গেলেই করতোয়া নদী।

সময়টা এই শতাব্দের দ্বিতীয় দশক। অমূল্য ফোর্থ ক্লাসে এসে ভর্তি হল। তার আগে পর্যন্ত আমি ছিলাম ফার্স্ট বয়। অমূল্য আসার পরই বুঝলাম এ-ই হল ফার্স্ট বয়। তার সেদিনকার চেহারাটা আজও মনে পড়ে। ছোটখাটো, গৌরবর্ণ। মিষ্টভাষী। খেলাধুলায় খুব একটা উৎসাহ ছিল না। আমরা যখন স্কুলমাঠে ফুটবল খেলতাম, ও দাঁড়িয়ে দেখত, মাঝে মাঝে উৎসাহ দিত।

অমূল্যর দাদা মন্মথধন দেবীগঞ্জে কোচবিহার রাজ এস্টেটের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। অমূল্য তাঁর বাড়িতে থেকেই লেখাপড়া করত। মনে পড়ে মাঝে-মাঝেই আমরা চার-পাঁচজন অমূল্যর দাদার বাড়িতে যেতাম। বৈকালিক জলযোগ সেখানেই হতো। তাঁর নাটকে উৎসাহ ছিল। গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যাভিনয় মঞ্চস্থ করায় তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। তাঁদের বাড়িতেই মহলা হতো। অমূল্যর ত বটেই, আমাদেরও ঐ সব নাটকের কিছু কিছু অংশ সেদিন মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এ ব্যাপারে বড়োরা আমাদের বিশেষ পাত্তা দিতেন না। শুনেছি, অমূল্যর বাবা নাটক লিখতেন, তিনি তো কোচবিহার রাজদরবারের কর্মচারী ছিলেন। নাটকে গানে দক্ষতার জন্যই রাজদরবারে তাঁর একটা খাতির ছিল। অমূল্যর দাদা বেহালা বাজাতেন। হয়ত বাবা-দাদার কাছ থেকেই অমূল্য সাহিত্য-সংগীত-ছন্দ সম্পর্কে প্রীতি অর্জন করেছিল।

স্কুলে আমরা ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছি, পরীক্ষা দিয়েছি। ফাইনাল পরীক্ষায় অমূল্য রংপুর জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে ডিস্‌ট্রিক্ট-স্কলারশিপ পায়। এখনকার লোকেদের কাছে এটা একটা বড় কৃতিত্বের বলে মনে হবে না। কিন্তু সেদিন এটা খুব সম্মান ও কৃতিত্বের বলে গণ্য হত। অমূল্য তিনটি বিষয়ে 'লেটার' পেয়েছিল।

অমূল্যর মতো মেধাবী ছাত্র বিশেষ দেখিনি। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সী

কলেজেও এমন মেধাবী চৌখস ছাত্র ছিল না, তার কারণ সব বিষয়েই ছিল তার সমান দক্ষতা। সে যেমন ইংরেজি-বাংলা লিখত, তেমনি অঙ্কে নিপুণ ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে তখনকার দিনে বি. এ. পড়বার সময় সেরা ছাত্ররা যে বিষয়ে অনার্স নিত অমূল্য সে বিষয়েই অনার্স নিয়েছিল। ইংরেজিতে অনার্স। সেই সঙ্গে কম্‌বিনেশন ছিল—অঙ্ক আর সংস্কৃত। কলেজ জীবনে ও পরবর্তী জীবনে সে বলত, অঙ্ক আর সংস্কৃত নতুন করে পড়বার কী আছে, ও ত ম্যাট্রিকেই তৈরি করে নিয়েছি। সত্যি তাই। স্কুলে ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, অঙ্ক—সবকিছুতেই সে ছিল চৌখস।

অমূল্য বরাবরই ক্ষীণাঙ্গ। ক্ষুরধার ছিল তার মেধা। তার হাতের লেখাটি ছিল মুক্তোর মতো। পরবর্তী জীবনেও তা-ই। সে যা-কিছুই লিখত, প্রথম প্রয়াসেই লিখে ফেলত। দশবার কাটাকুটি করে লেখা তৈরি করার দরকারই হত না।

দেবীগঞ্জে বিকেলে খেলার শেষে বাড়ি ফেরার আগে খানিকক্ষণ গল্প করতাম। তাতে অমূল্যর খুব উৎসাহ ছিল। মাঝে মাঝে দেখতাম, আপন মনে গানের কলি গুন্‌গুন্ করত। সে-সময়ে তার দিকে তাকালে লজ্জা পেয়ে হাসত। অমূল্যর সে-হাসিটি আজো মনে পড়ে।

শ্রীযুক্ত তালুকদারের বাসভবনে ১৯৮৬ সালের জুন মাসে গৃহীত বক্তব্যের অনুলেখন

সতীর্থ অমূল্যধন

শৈবালকুমার গুপ্ত

অমূল্যধন ও আমি ছিলাম সহপাঠী প্রেসিডেন্সি কলেজে দু'বছরের মতো। সে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়ত। আর আমি ছিলাম অর্থনীতিতে অনার্স ক্লাসের ছাত্র। আমরা দুজনেই থাকতাম হিন্দু হোস্টেলে এবং একই ঘরে। সুতরাং সব দিক থেকেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ ঘটে। বি. এ. পাশ করার পর আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য চলে যাই, আর অমূল্যধনকে তার সাংসারিক কারণে কিছুদিনের জন্য অস্থায়ী ভাবে সরকারী চাকরীতে ঢুকতে হয়। কিন্তু নিজের প্রচেষ্টায় সে আবার তার সাহিত্যচর্চায় ফিরে আসে এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে। বি. এ (অনার্স) এবং এম. এ. দুটি পরীক্ষাতেই সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। আমার কাছে এটাই ছিল সুপ্রত্যাশিত, কেননা তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে আমি তার বুদ্ধি ও মেধা সম্পর্কে সব সময়েই উচ্চ ধারণা পোষণ করতে বাধ্য হই।

আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিই, সে বছর দেখতে পাই যে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় নামে এক ছাত্র সকল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একেবারে উঁচুর দিকে রয়েছে। মফঃস্বলের কোন কলেজ থেকে কোন ছাত্র এত ভাল ফল দেখাতে পারে তা দেখে আমরা তখন একরকম বিস্মিতই হয়েছিলাম। পরে দেখলাম সে বি. এ. পড়ার জন্য আমাদের কলেজেই ভর্তি হয়েছে এবং ঘটনাচক্রে সে হোস্টেলে আমার 'রুম-মেট'।

পরবর্তীকালে অমূল্যধন অধ্যাপনা পেশায় প্রবেশ করে এবং আমি সিভিল সার্ভিসে যোগ দিই। খুব একটা ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ হতো না, কিন্তু আমরা সাধ্যমতো পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতাম। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ও পরে বাংলা ছন্দের গবেষক হিসেবে তার প্রতিষ্ঠালাভ করাতে আমি খুবই আনন্দ পাই এবং অনেক বন্ধু-বান্ধবদের আমাদের বন্ধুতা সম্বন্ধে গল্প করি। একেবারে সমবয়সী ও সহপাঠী হলেও অমূল্যধন সম্পর্কে আমার মনে একটা সপ্রশংস শ্রদ্ধার ভাবও বরাবর ছিল। সেটা যে হঠাৎ গড়ে ওঠেনি

সে সম্পর্কে দু'একটি কথা বলি।

আমরা তখন হিন্দু হোস্টেলের বাসিন্দা। দেশময় তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগের জোয়ার বইছে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সে-আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো। অমূল্যধন কোনদিনই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ভালো না বাসলেও রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তার বিচক্ষণ মতামত আমরা শুনতে পেতুম। তখন আমাদের অনেকেই গান্ধীজীর প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধ ছিল কিন্তু মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌ও যে একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী নেতা এবং তাঁকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় এমন কথা অমূল্যধনের কাছে শুনেছিলাম। তারপর অনেক জল গঙ্গানদী দিয়ে বয়ে গেছে, বিশের দশককে অনেক পেছনে ফেলে এসেছি এবং আমাদের দেশে অনেক রকম পরিবর্তন হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় তার ছাত্রজীবনের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার কথা যে, জিন্নাহ্‌-কে অবজ্ঞা করা আমাদের জাতীয় নেতাদের একাংশের পক্ষে উচিত হয়নি। যতদূর মনে পড়ছে, বোধ হয় "হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড" কাগজে পরবর্তীকালে জিন্নাহ্‌ সম্পর্কে অমূল্যধনের লেখা একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম 'The Lost Leader' নামে। অমূল্যধন যখন আশুতোষ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক তখন মাঝে মাঝে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে পাক্ষিক পর্যালোচনা করে বক্তৃতা করেছে। আর ছাত্রাবস্থা থেকেই দেখতাম তার অঙ্কশাস্ত্র সম্পর্কে ধারণাও খুব স্বচ্ছ ছিল। এসব দেখে মনে হয় যে, যদি অমূল্যধন সাহিত্যচর্চা বা ছন্দ গবেষণা না করে অন্য কোন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করতো তাহলেও সে অনায়াসেই সে সকল বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে পারতো।

এখন অমূল্যধনের সাহিত্যবোধ সম্পর্কে দু'একটা কথা বলি। আমাদের সময়ে হিন্দু হোস্টেলে একটি হাতে-লেখা পত্রিকা চালানো হতো যাতে হোষ্টেলে বাসিন্দাদের ও বাইরের লোকদেরও লেখা প্রকাশ করা হতো। সময়টা বোধ করি উনিশ শ' কুড়ি-একুশ বা বাইশ সাল হবে। একবার অচেনা এক ব্যক্তির একটি কবিতা প্রকাশ করা হয় যেটা অনেকেরই নজর এড়িয়ে যায়। একদিন কবিতাটি পড়ে অমূল্য আমাকে বলে যে, ছেলেটির কবিত্বশক্তি আছে, মনে হয় বড় হলে ভালো একজন কবি হয়ে উঠবে। সত্যিই পরবর্তীকালে সেদিনকার অচেনা ছেলেটি একজন বড় কবি হয়ে ওঠেন—তাঁর নাম কাজী

নজরুল ইসলাম। আজ আমার ঘটনাটি মনে পড়ছে এই কারণে যে, আমাদের বন্ধুমহলে কবি নজরুলকে আবিষ্কার করার বা স্বীকৃতি জানানোর কৃতিত্ব আমাদের সতীর্থ, তখন ইংরেজি অনার্স ক্লাসের ছাত্র অমূল্যধনের।

অমূল্যধনের সাহিত্যবোধ বা কাব্য আস্বাদনের যে ক্ষমতা ছিল সে সম্বন্ধে আর একটি মজার ঘটনার কথা বলি। ইংরেজি অনার্স বা ইংরেজিতে এম. এ. ক্লাসে পাঠরত আমাদের বন্ধু ও সমসাময়িকদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের একটু বেশি করে সাহিত্যবোদ্ধা বলে গর্ব করতো। এরকম কিছু সাহিত্যবোদ্ধাকে পরীক্ষা করার জন্য আমাদের এক বন্ধু এক মজার কাণ্ড করে। সে নিজে একটি ছোট কবিতা লেখে একটি ছোট কাগজে এবং তারপর সেটিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলে এই ধরনের সাহিত্যবোদ্ধা বন্ধুদের সেটি দেখায় এবং তার মর্মার্থ ব্যাখ্যা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। খুব গম্ভীর ভাবেই সে অনুরোধ করে। এক এক করে প্রায় জনা তিনেক সাহিত্যবোদ্ধা বন্ধুদের সেটি দেখালে তারা সেটিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা হিসেবেই বড়বড় ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি পরবর্তীকালে যথেষ্ট খ্যাতিমান অধ্যাপক হয়ে ওঠেন এবং আর একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক হয়েছিলেন। যাই হোক, কবিতাটি যখন অমূল্যধনকে দেখানো হল এবং "রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটির" অর্থ জিজ্ঞাসা করা হল, তখন সে অন্যান্যদের মতো সঙ্গে সঙ্গেই বড়ো কোন ব্যাখ্যা দিল না। কয়েকবার মন দিয়ে কবিতাটি পড়ল এবং পরে সেটি আমাদের বন্ধুটির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল যে, মনে হচ্ছে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের লেখা নয় কারণ তাতে কয়েকটি ছন্দ ত্রুটি রয়ে গেছে যা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় থাকা সম্ভব নয়। অবশেষে আমাদের বন্ধুটি হাসতে আরম্ভ করে এবং আমরা বুঝতে পারি অমূল্যধনের কাব্য-বিচারশক্তি কতখানি ছিল।

পরবর্তী জীবনে আমরা যখন উদ্যোগ নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সংসদ (Presidency College Alumni Association) প্রতিষ্ঠা করি তখন আমিই তাকে আমাদের সংগঠনের মধ্যে সদস্য করে টেনে আনি। কিছুদিন বাদে যখন অ্যাসোশিয়েশন তার শারদ পত্রিকা Autumn Annual প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করে তখন কার্যকরী সমিতি এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার অমূল্যধনের ওপরই দেওয়া সিদ্ধান্ত করে। তার সাহিত্যপ্রতিভার এটাও ছিল একটি বিশেষ স্বীকৃতি।

আর বেশি কিছু বলতে চাই না। ছাত্রজীবনের পর অমূল্যধন ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছে। বাংলা ছন্দ সম্পর্কে তার গবেষণা তাকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে তার বিশিষ্ট কাজের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক প্রদান করে সম্মান দেখিয়েছে। কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও যেরকম নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে তাকে সংস্কৃত ছন্দ সম্বন্ধে গবেষণা করতে দেখেছি তাতে আমি আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হয়েছি। তার শরীর কোনদিনই খুব মজবুত ছিল না, এবং শেষবয়সে তা বেশ খারাপই হয়েছিল কিন্তু তার সাহিত্যসাধনাই তাকে সকল কষ্ট সহ্য করতে সাহায্য করেছে।

---

* দক্ষিণ কলকাতায় তানসেন সঙ্গীত সভাগৃহে ১১ মে ১৯৮০ সালে অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা-সভায় প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত অনুলিপি ।

সুহৃৎ অমূল্যধন

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

অমূল্যধন মুখার্জী (১৯০২—৮৪) এবং আমি ১৯২০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে ও তৎসংলগ্ন ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে প্রবেশ করি। কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের মধ্যে বন্ধুতা গড়ে ওঠে এবং তখন থেকেই আমাদের মধ্যে মেলামেশা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে একেবারে ১৯৮৪ সালের ২০শে মার্চ পর্যন্ত যখন মৃত্যু এসে তাঁকে আমাদের মধ্যে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। যদিও আমরা একই সঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করি, তিনি লেখাপড়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে দু'বছরের বড় ছিলেন, কারণ ১৯২০ সালে তিনি ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. ক্লাসে পড়তেন, আর আমি ছিলাম ইণ্টারমিডিয়েটের প্রথম বর্ষে। এখন যার নাম বাংলাদেশ সেখানকার এক সুদূরপ্রান্তবর্তী গ্রাম থেকে আমি তখন একেবারেই নবাগত ছাত্র, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে ওপরের দিকে স্থানাধিকারী বুদ্ধিমান ছাত্রদের সম্বন্ধে তখন আমার কৌতূহল ছিল অসীম এবং এ ধরনের ডজন ডজন ছাত্রদের কলেজে এবং হোষ্টেলে দেখা যেত। আমাদের সময়ে ম্যাট্রিকুলেশন বা মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিন পর্যায়ের স্কলারশিপ দেওয়া হতো। প্রথম দশজনকে বলা হতো "জেনারেল স্কলার", তার পরের পর্যায়ে ছিল "ডিভিসনাল স্কলার", এবং তারপর জেলা-ভিত্তিক বৃত্তি দেওয়া হতো। জলপাই-গুড়ি জেলার একটি স্কুল থেকে ১৯১৮ সালে অমূল্যধন মুখার্জী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি "প্রথম দশজনের" মধ্যে না থাকলেও দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের তালিকায় তাঁর নাম ছিল সর্বাগ্রে। রাজশাহী বিভাগে তখন সাতটি জেলা ছিল এবং এই বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজে ইণ্টার-মিডিয়েট আর্ট'স ক্লাসে পড়াশুনা করেন। সেখান থেকেই তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আই. এ. (ইণ্টারমিডিয়েট আর্ট'স্) পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন, এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান।

অমূল্যধন সম্বন্ধে আমার আগ্রহ আরো বেড়ে যায় আরো দুজনের সঙ্গে বন্ধুত্বের মাধ্যমে। কলেজ এবং-হোষ্টেলে ভর্তি হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই পবিত্র কুমার বসু এবং তারাপদ মুখার্জীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তাঁরা একবছর

আগেই কলেজে ও হোষ্টেলে যোগদান করেন এবং তাঁরা ইতিমধ্যেই অমূল্যধনকে পছন্দ করতে আরম্ভ করেছেন। অমূল্যধন মুখার্জী বা সংক্ষেপে এ. ডি. এম.-এর জীবন খুব একটা ঘটনাবহুল নয়, খুব তাড়াতাড়ি যার একটা বর্ণনা দেওয়া যায়। ১৯১৮ সালের ব্যাচে অনেক বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন। আরো একটি কারণে তাঁদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়। হোষ্টেলে আমার সঙ্গে একই ঘরে থাকতেন শৈবাল গুপ্ত, যিনি ১৯২২ সালে অর্থনীতিতে ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হন এবং পরের বছর সসম্মানে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে (ICS) প্রবেশ করেন। তাঁর কাছাকাছি থাকার দরুন অন্যান্য বিভাগে তাঁর সতীর্থদের সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা করা আমার পক্ষে সহজ হয়। আমাদের কলেজ জীবনে পিনাকীরঞ্জন সিংহ ছিলেন, আমার মতে ছাত্র হিসাবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং একাধিক কারণে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই আগ্রহ জন্মায়। তিনি ছিলেন সদা-প্রফুল্ল, হাসি-খুশী এক যুবক। কেউ কদাচিৎ তাঁকে বই নিয়ে বসে থাকতে দেখেছে অথচ সাধারণত সব পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম হতেন। পরবর্তী সময়ে যখন আমি অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নিকট-সংস্পর্শে আসি, তখন আমি বিরাট পণ্ডিত শিক্ষককে তাঁর এই বিশিষ্ট ছাত্র সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতে দেখি, যাঁর কখনই খুব একটা পুস্তকপ্রীতি ছিল না। ১৯২২ সালে ইংরেজি অনার্সে পিনাকী সিংহ প্রথম হন এবং অমূল্যধন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এঁরা দুজনেই ১৯২৪ এবং ১৯২৫ সালের এম. এ. পরীক্ষা না দিয়ে ১৯২৬ সালে ইংরেজিতে এম. এ. পরীক্ষা দেন। পিনাকীরঞ্জন সিংহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং অমূল্যধন মুখার্জী প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হন। পরবর্তী জীবনে ১৯১৮ সালের ব্যাচের অনেক ছাত্রই সিভিল সার্ভিসে বা অন্যত্র বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। যতদূর জানি এই ব্যাচের অর্থনীতির ছাত্রদের মধ্যে একজন সারা ভারতে উজ্জ্বলতম আইন-জীবী হয়েছিলেন। কিন্তু আমার মতে এঁদের মধ্যে একমাত্র অমূল্যধনই স্থায়ী মূল্যবান কিছু রেখে যেতে পেরেছেন এবং আমার এই ধারণার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে।

একথা সত্যি যে আমি অমূল্যধন মুখার্জীর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হই পরীক্ষায় তাঁর কৃতিত্বের জন্য, কিন্তু তিনি আমার মনে যে স্থায়ী ছাপ ফেলে গেছেন সেটা তাঁর পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য নয়। পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষক হিসেবে পরীক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে আমার গভীর পরিচয় আছে, যার ফলে পরীক্ষার কৃতিত্বের মাপ-

কাঠিতে কারোর যথার্থ গুণ বা পাণ্ডিত্যের মূল্যায়ন করার পক্ষে বিশ্বাস রাখা যায় না। তারাপদ মুখার্জী ও পবিত্র বসুর মতো আমিও অমূল্যধনের প্রতি আকৃষ্ট হই তাঁর বুদ্ধির প্রাখর্য, মার্জিত সাহিত্যরসবোধ এবং গদ্য ও কবিতার সৌন্দর্যপ্রেমের জন্য। মনে হয় তাঁর এই গুণাবলী অংশত তিনি তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। অমূল্যধনের পিতৃদেবকে আমি কখনো দেখিনি কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যা শুনেছিলাম তার থেকে কিছুটা ধারণা করতে পারি তাঁর পিতৃদেব সম্বন্ধে। যতদূর জানি দুর্গাচরণ মুখার্জী তাঁর প্রথমজীবন অতিবাহিত করেন কুচবিহার শহরে। কুচবিহার ছিল একটি দেশীয় রাজ্যের রাজধানী এবং ঐ রাজ্যের দেওয়ান (অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী) ছিলেন কালিকাদাস দত্ত। দুর্গাচরণ মুখার্জী তখন কালিকাদাস দত্তের পুত্র চারুচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। চারুচন্দ্র ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত হন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন কট্টর জাতীয়তাবাদী এবং গোপন বৈপ্লবিক কাজ-কর্মে অরবিন্দের সহযোগী ; কিন্তু তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল চারুচন্দ্র দত্ত একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং চাকুরী থেকে অবসরগ্রহণের পর তিনি যে-সব বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলি আমাদের সাহিত্যের সম্পদ হয়ে আছে। অরবিন্দের "বন্দেমাতরম" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গে ঠিক কোন্ সময়ে দুর্গাচরণ মুখার্জীর পরিচয় হয় জানি না। কিন্তু একথা জানা যায় যে, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় "সার্ভেণ্ট" পত্রিকার অফিসে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গে অমূল্যধন দেখা করেন এবং প্রবীণ সাংবাদিক ও স্বাধীনতা-যোদ্ধা সেদিন দুর্গাচরণের পুত্রকে দু'হাত বাড়িয়ে সাশ্রুনয়নে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

জলপাইগুড়ি জেলার দেবীগঞ্জে কুচবিহার রাজ্যের জমিদারী তালুকে দুর্গাচরণ তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু তিনি বই পড়তে খুব ভাল-বাসতেন এবং তাঁর বাংলা কাব্য ও কবিতার বইয়ের অত্যন্ত সুন্দর নিজস্ব সংগ্রহ ছিল। সেখানে ছিল বৈষ্ণব গীতিকবিতা, মঙ্গলকাব্য, অন্নদামঙ্গল-রচয়িতা ভারত-চন্দ্রের কাব্য এবং রামপ্রসাদ, মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থাদি। দুর্গাচরণের দ্বিতীয় পুত্র অমূল্যধন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কাব্যরাজির রসাস্বাদন করতেন এবং অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে এই কাব্যগুলির ছন্দোৎকর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হন। অমূল্যধন দেবীগঞ্জের হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ শেষ করে উচ্চ-

মাধ্যমিক স্তরে পড়াশুনার জন্য রংপুর কলেজে আই. এ. পড়তে এসে সেখানে দর্শন বিভাগে একজন উৎসাহী অধ্যাপককে দেখতে পান। তাঁর নাম অধ্যাপক গৌরগোবিন্দ গুপ্ত এবং তিনি ছিলেন "রামকৃষ্ণকথামৃত"-রচয়িতা প্রখ্যাত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (শ্রী-ম) ভাই। গৌরগোবিন্দের বাংলা কাব্যে ভালোরকম পড়াশুনা ছিল এবং বাংলা কবিতার ছন্দ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। অমূল্যধনের মধ্যে বাংলা কবিতার ছন্দ সম্বন্ধে আগ্রহ ও দখল তিনিই প্রথম দেখতে পান এবং সে-সম্বন্ধে আরো গভীর গবেষণার জন্য তাঁকে উৎসাহিত করেন। এই সময় থেকে পরবর্তী আটবছর অমূল্যধন অন্য পড়াশুনা ও কাজের মধ্যে ডুবে যান, বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যের পড়াশুনাতেই তাঁকে বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। কিন্তু অধ্যাপক গুপ্তের কাছ থেকে পাওয়া ইঙ্গিত তাঁর মনের মধ্যে রয়েই যায়, কেননা আমার এখনো মনে পড়ে যখন আমরা প্রথমে কলেজ ছাত্রাবাসে এবং পরে একটি 'মেসে'একসঙ্গে ছিলাম তখন কখনো কখনো অমূল্যধন বাংলা কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতেন এবং সেগুলির ছন্দ-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতেন। ১৯২৭ সালের প্রথমদিকে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে অমূল্যধন রংপুর কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে যান। সেখানে তিনি তাঁর পুরানো অধ্যাপকের দেখা পান এবং অধ্যাপক গৌরগোবিন্দ গুপ্তই বোধ হয় তাঁকে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে গবেষণার কাজে প্ররোচিত করেন। কি-ভাবে কী হল জানি না, কিন্তু দেখা গেল মাত্র দু'বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় অমূল্যধন Fundamental Principles of Bengali Prosody শীর্ষক তাঁর গবেষণা-সন্দর্ভ লিখে ফেলেন এবং এর ভিত্তিতে ১৯৩০ সালে "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্টুডেন্টশিপ (PRS)" ও পরে মোয়াট পদক লাভ করেন।

অন্যত্র আমি বলেছি যে, "পি. আর. এস." একসময়ে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান, কিন্তু ক্রমান্বয়ে অপপ্রশাসনের দরুন তার সম্মান অনেকাংশেই নষ্ট হয় এবং বর্তমানে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এই মরুভূমির অবস্থায় অমূল্যধনের গবেষণা ছিল মরূদ্যানের মতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো ছন্দোশিল্পী সমেত অনেকেই বাংলা ছন্দ সম্পর্কে অনেক লেখা লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের কারুর প্রতি কোন অসম্মান না দেখিয়েও একথা বলতে চাই যে, ছন্দের রূপ ও কাঠামো সংক্রান্ত আলোচনায় অমূল্যধন এমন তাত্ত্বিক বক্তব্য দাঁড় করিয়েছেন যাকে নস্যাৎ করা যায় না। এই বিষয়ে আমি

বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, আমার এই সিদ্ধান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর গবেষণা-সন্দর্ভ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছে এবং পরীক্ষার্থীদের জন্য সেটিকে একটি মাননির্দেশক পাঠ্য হিসাবে সুপারিশ করেছে।

অমূল্যধন মুখার্জী ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে প্রথমে রংপুর কারমাইকেল কলেজে কাজ করেন (১৯২৭—১৯৩৮) এবং পরে কলকাতার আশুতোষ কলেজে যোগদান করেন। সেখান থেকে এই কলেজের প্রাতর্বিভাগ যোগমায়া দেবী কলেজে অধ্যাপনা করে ১৯৬০ সালে অবসরগ্রহণ করেন। এই সময়ে কয়েক বছর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে ইংরেজির পার্টটাইম শিক্ষক হিসেবে অধ্যাপনা করেন। এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর অধ্যাপনা করেন এবং সেখানে তিনি আমার সহকর্মী হন। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য প্রসঙ্গে যে-সব আলোচনা আমার হয়েছিল সেগুলির কথা মনে পড়লে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে ওঠে। অমূল্যধন তাঁর কর্মজীবনে সবশেষে যে কাজ করেন তা হল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের Senior Research Fellow হিসেবে গবেষকের কাজ। এই গবেষণার কাজে তিনি সংস্কৃত ছন্দের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য সমস্যার গভীরে চলে যান। তাঁর এই গবেষণার ফল বিধৃত হয়েছে Sanskrit Prosody : Its Evolution নামক মূল্যবান গ্রন্থটিতে। বিশেষজ্ঞদের কাছে আমি শুনেছি এই গবেষণার মাধ্যমে তিনি একটি পুরানো ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। বোধ হয় তাঁর এই গবেষণার জন্যই এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে ১৯৭৮ সালে "ফেলোশিপ" প্রদান করে।

ছয়দশকব্যাপী অমূল্যধন মুখার্জীর সঙ্গে আমার যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তা তাঁর ছন্দ-সম্পর্কিত গবেষণার প্রতি আমার আকর্ষণের জন্য নয়, কেননা ছন্দ সম্পর্কে আমার জ্ঞান নিতান্তই সাধারণ। তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ আকর্ষণের কারণ হল তাঁর উচ্চ সাহিত্যরসবোধ। তিনি সু-গদ্য ও সু-কাব্য ভালবাসতেন, এবং কোন-রকম পূর্ব-নির্ধারিত ধারণার সাহায্য ব্যতিরেকেই তার রসাস্বাদন করতে পারতেন। তাঁর মতো কোনরকম "ইজমে"র (-ism) দ্বারা চালিত নন এবং তাঁর মতো নিজেদের স্বচ্ছ ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে পারেন এমন লোক আমি খুব কমই দেখেছি। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্ম-গ্রন্থকার হিসেবে তিনি Leaves from English Poetry নামে ইংরেজি কবিতার টীকা-

সম্বলিত যে সঙ্কলনটি সম্পাদনা করেন সেটি একসময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গৃহীত হয়। এই সম্পাদিত গ্রন্থটিতে তাঁর কাব্য-রসাস্বাদনের ও তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দেখা যায়। বাংলায় তিনি "কবিগুরু" ও "রবীন্দ্রনাথের মানসী" নামে রবীন্দ্রকাব্যের দুইটি সমালোচনা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। "আধুনিক সাহিত্যজিজ্ঞাসা" গ্রন্থটিতে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দানের স্বীকৃতি হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক' প্রদান করেন। কিন্তু এসব কিছুর চাইতেও বেশী মূল্যবান ছিল সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর আলোচনা ও সুতীক্ষ্ণ মন্তব্য যা তাঁর বন্ধুদের কাছে সবসময়ই আনন্দের খোরাক যোগাত। প্রতিদিনই তাঁর প্রত্যক্ষ বন্ধুদের সংখ্যা কমে আসছে, কিন্তু বাংলা কবিতার পাঠক মাত্রেই তাঁর বাংলা ছন্দ সম্পর্কে মাননির্ধারক গ্রন্থটিকে কখনই ভুলতে পারবে না।

গুরু-প্রণাম

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের কথা নয়, ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সময়কালের কথা, যখন আমি আশুতোষ কলেজের ছাত্র ছিলাম। যাঁর কথা লিখতে বসেছি, সেই 'এ. ডি. এম' বা অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের ক্লাসগুলিতে অনেক ছাত্রের সঙ্গে আমিও বসতাম। সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ের সম্ভাবনা নেই, ক্লাসে আমরা এক এক জন এক একটি নম্বর (যাকে বলে রোল-নাম্বার); ক্লাসে অন্যান্য অধ্যাপকদের মতো তিনিও 'রোল-কল' করতে এক-একটি 'নম্বর' উচ্চারণ করতেন, আমরাও সেই অনুসারে সাড়া দিতাম। তারপর শুরু হতো পড়া। তিনি আমাদের কাছে ছিলেন খুবই গম্ভীর, কিন্তু পড়াতেন বড়ো প্রাঞ্জলভাবে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম। তাঁর ক্লাসে আমরা কেউ কখনও ফাঁকি দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। পড়ানো হলে, গম্ভীর মুখে যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে যেতেন। পড়ার বইয়ের কোনো প্রসঙ্গ অবান্তরভাবে কখনো তুলতেন না। না, কোনো হাল্কা মন্তব্য করতেন না। এইরকমভাবেই ক্লাস চলতো, আমরা তাঁর কাছে শুধুই 'নম্বর', আমাদের কারুরই নাম তিনি জানতেন না, জানার কথাও নয় এত ছেলের নাম! তাই সেদিন আমার 'রোল-কল'টা করে আমি সাড়া দেবামাত্র তিনি যখন আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তখন অবাক না হয়ে পারলাম না। তিনি চোখ নামিয়ে খাতার দিকে তাকালেন, কিন্তু পরের 'নম্বর' ডাকলেন না, আমার দিকে আবার চোখ তুলে তাকিয়ে আমার নামটা উচ্চারণ করে বললেন, তোমার নাম এই? আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়তই তিনি বললেন, ক্লাসের পর আমার সঙ্গে দেখা কোরো তো।— বলেই যথারীতি পরবর্তী নম্বরগুলো ডাকতে থাকলেন।

ছাত্রদের প্রায় সকলেই আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একবার তাকিয়ে নিল। পাশের ছেলেটি ফিসফিস করে আমাকে বললে, কি হে—এ. ডি. এম, তোমাকে ডাকলেন—কী ব্যাপার?

—জানি না।

পরের ঘণ্টায় আমার ক্লাস ছিল না। উনি চলে যেতেই আমার অন্তরঙ্গরা আমাকে গোল হয়ে ঘিরে ধরলো : কী? ব্যাপার কী? এমন করে তো কখনো কাউকে ডাকতে শুনিনি?

—বুঝতে পারছি না।

আমার পাশের বন্ধুটি বললে, যাও দেখা করে এসো, প্রফেসর-রুমে এতক্ষণে গিয়ে উনি বসে পড়েছেন বোধহয়।

আমি তাই আর দ্বিরুক্তি না করে ধীরে ধীরে চলে গেলাম ওঁদের কক্ষে। ঘরে উনি, আর অন্য এক কোণে দুই অধ্যাপক, এ-ছাড়া কেউ ছিলেন না। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, বোসো।

আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে প্রায় ধমকেই বললেন, বোসো।

অগত্যা বসতে হলো। উনি আমার দিকে তাকালেন, ঠোঁটের কোণে অল্প হাসি; বললেন, এবারকার কলেজ ম্যাগাজিনে তুমি একটি প্রবন্ধ লিখেছো, তাই না?

একটু অবাক হলাম। —আপনি পড়েছেন স্যার?

—না পড়লে তোমাকে ডাকবো কেন? তোমার প্রবন্ধের সঙ্গে তোমার নাম ছাড়া ক্লাসের বিভাগ, কতো বর্ষ, ইত্যাদি সবই ছিল। পড়ে বুঝলাম, তুমি আমারই ছাত্র। আনন্দ হলো খুব। কিন্তু একটা কথা। প্রবন্ধের নাম দিয়েছ 'চিত্রশিল্পে নব্য আন্দোলন',—হঠাৎ—'চিত্রশিল্প' নিয়ে মাথা ঘামালে কেন? ছবিটবি আঁকো নাকি?

বললাম, না স্যার! এমনি বিষয়টি আমার ভালো লাগে, তাই একটু পড়াশোনা—

অল্প একটু হাসলেন; বললেন, না হে—তা বলে আমার অপ্রসন্নতা জানাচ্ছি না, এই যে গতানুগতিক আলোচনার পথ ছেড়ে অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছ, এটাই আমার ভালো লেগেছে। সেইজন্যই তোমাকে খুঁজে বার করে তোমার সঙ্গে আলাপ করলাম। আর কোথায় কোথায় লেখো?

তখনকার দিনে খ্যাত-অখ্যাত দু-চারটি কাগজের নাম করলাম।

—কী লেখো? শুধুই প্রবন্ধ?

বললাম, না স্যার! প্রথমে কবিতাই লিখতাম, আজকাল গল্প লিখছি।

—বাঃ! বেশ। দেখিয়ো তো আমাকে।

এইভাবে ওঁর সঙ্গে আলাপ। কলেজে আরও অনেক অধ্যাপক আছেন, কেউ আমাকে ডেকে এমন করে আমার সঙ্গে আলাপ করেননি, বা আমার লেখার কথা জিজ্ঞাসা করেননি, উনিই একমাত্র ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমটুকু পেয়েছিলাম বলে সাহিত্যের পথে হাঁটা আমার সহজ হয়েছিল। আমি পরদিনই 'মানসী' বলে একটা পত্রিকা ওঁর হাতে দিলাম। পৃষ্ঠা উল্টে আমার গল্পটি বার করা মাত্রই তাঁর চোখ পড়ল ফুট-নোটের দিকে। বলে উঠলেন, আরে! এ-যে দেখছি পুরস্কারপ্রাপ্ত 'গল্প'। গল্পের প্রতিযোগিতা হয়েছিল বুঝি?

—হ্যাঁ, স্যার!

—আমি পড়ে ফেলছি। তুমি বিকেলে এসে আমার হাত থেকে নিয়ে যেয়ো।

বিকেলে ওঁর কাছে যেতেই পত্রিকাটি হাতে তুলে দিয়ে বললেন, সাধুভাষায় গল্পটা লিখেছো দেখছি! প্রবন্ধে চলতি ভাষা, গল্পে সাধুভাষা। হঠাৎ এ-উল্টো স্রোত কেন?

—কী জানি কেন এ ইচ্ছে হলো! পরের গল্পগুলিতে আর সাধুভাষা ব্যবহার করিনি।

একটু হাসলেন, তারপরে উঠে দাঁড়ালেন; বললেন, চলো ক্লাস তো শেষ, হাঁটতে হাঁটতে তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাই। আমি কালীঘাট ট্রাম-ডিপোতে গিয়ে বেহালার ট্রাম ধরবো। চলো—

সেদিনকার কথা কখনো ভুলবো না। ডিপোর মুখের দিকে—খানিকটা ভিতরে ঢুকে আমার সঙ্গে উনি কথা বলছেন, বেহালার ট্রাম এসে দাঁড়ালো, উনি উঠলেন না; বললেন, যাকগে, পরেরটা ধরবো। শোনো, গল্পটায় পুরস্কার পেয়েছো, আমার কিছু বলার নেই। ব্রাত্য জীবন নিয়ে লিখেছো, অথচ ব্রাত্য শব্দের ছড়াছড়ি নেই, এটা আমার ভালো লাগল। কিন্তু একটা কথা, উচ্ছ্বাসের দিকে বেশি ঝুঁকো না, ওখানকার ভারসাম্যই সবথেকে বড়ো জিনিস।

ওঁর ভালো-লাগার প্রকাশ ছিল এমনি। ক্লাসের পড়া নিয়ে ক্লাসের বাইরে কখনো ওঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি, এমন মনে পড়ে না। উনি হাজরার মোড়ে এসে ট্রাম ধরতেন, কিন্তু যেদিন আমাকে সঙ্গী করতেন, সেদিন হেঁটে যেতেন ট্রাম-ডিপো পর্যন্ত। কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর আগে একটা গীর্জা আছে। ওই গীর্জার সামনে দাঁড়িয়ে একদিন আমার আরও কয়েকটি গল্প নিয়ে আলোচনা

করলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, সুযোগ-সুবিধা মতো ক্লাসিক সাহিত্য প'ড়ো। ছোটগল্প যখন লিখছো, 'ছোটগল্প'ই আগে পড়ো। রবীন্দ্রনাথ তো পড়বেই, কন্টিনেন্টাল সাহিত্যও প'ড়ো। 'ফর্ম' সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবে। ছোটগল্পের 'ফর্ম' সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের লেখকরা যথেষ্ট সচেতন, তাঁদের দক্ষতাও প্রশ্নাতীত। কিন্তু আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ছোটগল্পের 'ফর্ম' নিয়ে খুব বেশি লোক যথেষ্ট ভেবেছেন বলে মনে হয় না। 'ছোট আকারের গল্প' লিখেছেন অনেকেই, কিন্তু ছোটগল্পের 'ফর্ম' সম্বন্ধে তেমন দক্ষতার প্রকাশ ঘটছে কতটুকু ?

বলা বাহুল্য, এইসব আলোচনা আমাকে যে কতখানি উদ্বুদ্ধ করতো, তা বলে বোঝাবার নয়। পথ-নির্দেশও পেতাম তাঁর কাছে। সোজাসুজি পথ দেখাতেন না, কিন্তু পথ কী করে পাবো, আদর্শ গুরুর মতো সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেন। কখনো তাঁর বাড়ি যাইনি, তিনি যেতেও বলেননি, কিন্তু কালীঘাট ট্রাম-ডিপো পর্যন্ত তাঁর পথসঙ্গী হ'য়েছি অনেকবার। মনে আছে, আমি ঐ সময়ে একবার হাতে পেয়েছিলাম ম্যাক্সিম গোর্কির উপন্যাস 'মাদার'। এই উপন্যাসটি সেদিন আমাকে যে কী ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল, তা বলার নয়। পথ চলতে চলতে স্যারকে আমি উচ্ছ্বাসের বাক্যে সে-কথা বলেওছিলাম। একটু প্রগল্‌ভতাও করেছিলাম মনে পড়ে। তিনি চুপ করে সব শুনে গেলেন, তারপরে বললেন, বইটা তুমি আর একবার প'ড়ো।' 'মাদার'-এর 'মা' কিন্তু রাশিয়াকে ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন 'মা' হয়ে গেছে, আর কী করে হয়েছে, সেটা খুঁজে বার করো। তাহলেই বুঝবে সাহিত্যজগতে 'মাদার'-এর কেন এতো দাম !

বহুদিন আগেকার কথা বলছি, কিছু ভুলে গেছি, কিছু মনে আছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম, মন্তব্যে কখনো কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন না। পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, কিন্তু তুলনায় রসবোধ ছিল সর্বাধিক। আমি তখন ছাত্র মাত্র, আমি যে পাঠ্যবিষয় ছেড়ে অন্য দিক নিয়ে চর্চা করছি, এক কথায় গল্প পড়ছি, গল্প লিখছি—এজন্য তিনি আমার জেঠামশাইয়ের মতো (আমার জেঠামশাইও ছিলেন অধ্যাপক, তবে অন্য কলেজের) ধমক-টমক দেননি, বলেননি যে, আগে পাস-টাস করে বেরোও, তারপরে গল্প লিখো। বরং বলতেন, রোজ নিয়ম করে চার লাইন হলেও লিখবে।

মনে আছে, ঐ 'গীর্জা'র সামনের ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে আমাকে একদিন

বললেন (আমার সদ্য প্রকাশিত একটি গল্প পাঠের পর)—তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ভঙ্গি দিয়ে পাঠকের মন ভোলাতে চেষ্টা কোরো না। ফর্মের প্রতি আনুগত্য অবশ্যই থাকবে, কিন্তু ভঙ্গির বাহুল্য বিষয়বস্তুকে লঘু করে দেয়, রস-প্রকাশে বাধা ঘটে।

মনে আছে, যেদিন কলেজ ছেড়ে যাবার মুহূর্তে ওঁকে প্রণাম করতে যাই, সেদিনকার কথা। কালীঘাট ট্রাম-ডিপোতে এসে ট্রামে না উঠে আমাকে নিয়ে বসলেন পাশের কালীঘাট পার্কের একটি খালি বেঞ্চিতে। তাও বেশিক্ষণের জন্য নয়। বললেন, সাহিত্যের পথে যখন পা ফেলতে এসেছো, তখন একটি কথা ভুলো না, মমতার পথই আসল পথ। বুদ্ধি তোমাকে দেবে 'ফর্ম', বুদ্ধি তোমাকে দেবে 'ভাষা', কিন্তু রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে মমতা যেন ফল্গুনদীর মতো তার কাজ করে যায়! এই মমতা তোমার মনের গঠনের ওপর নির্ভর করে, তোমার চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। সেইভাবে নিজেকে তৈরি করবে। আর একটি কথা, যা জানবে না তা লিখতে যেয়ো না, যার ওপর প্রত্যয় নেই, তা-ও লিখতে যেয়ো না। যে-কথা নিজে অনুভব করেছো, যে-কথা নিজে বিশ্বাস করেছো, তাই লিখবে। যে নিজে চুরি করে, সে যদি লেখে, 'চুরি করা মহাপাপ'—তাহলে তা পাঠকের হৃদয়কে কিছুতেই স্পর্শ করবে না।

স্যার সেদিন আরও অনেক কথা বলেছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সব আমি স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারিনি। কলেজ ছাড়ার পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি চলে যাই বাইরে। বহুকাল পরে যখন কলকাতায় ফিরে আসি, তখন উনি চলে গেছেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

স্বল্পবাক্ ছিলেন, অন্ততঃ আমাদের কাছে। কিন্তু যেটুকু বলতেন, প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতেন। ঐ যে বলেছিলেন 'মমতার পথ'—সেই মমতা প্রকাশ পেতো ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে। যারা ওঁর কাছে জিজ্ঞাসু হয়ে এসে দাঁড়াতো, তাদের উনি বিমুখ করতেন না, বরং অতি মমতার সঙ্গেই আলোচনার মাধ্যমে পথ-নির্দেশ দিতেন।

আমার পরম সৌভাগ্য, আমার সাহিত্য-জীবনের অতি প্রত্যূষে তাঁর মতো গুরু পেয়েছিলাম। আজ জীবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে এসে পৌছে তাঁর সেই কথাটি চরম কথা বলে বুঝতে পেরেছি, 'মমতার পথই আসল পথ'।

অমূল্যধন ও শিলঙের দিনগুলি

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে, একদিন এক পড়ন্ত বিকেলবেলায়, এই শিলঙপাহাড়ে আমাদের কয়েকদিনের অতিথি হয়ে এলেন তিনি। অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। ছান্দসিক ও সাহিত্যসমালোচক।

বিশেষভাবে ইংরেজির অধ্যাপক হয়েও তিনি বাংলাসাহিত্যের নানা বিষয়ে লিখেছেন নিবন্ধ ও বই, কখনো ইংরেজিতে, কখনো বাংলাভাষায়। লিখেছেন অবশ্য খুবই কম। তবুও এরই মধ্যে, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাংলা ছন্দের মূলসূত্র আবিষ্কার। আর সংস্কৃত ছন্দ-বিবর্তনের তুলনামূলক পুনর্মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ। তাঁর ছন্দ-"বিচারের প্রবীণতা-"কে একদা মান্য বলে মনে করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। আর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সেই ১৯৩৩-এও, তাঁর বাংলা ছন্দের মূলসূত্র আবিষ্কারের গৌরবে প্রীত, তাঁকে "ঐক্যসাধনব্রতের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা" বলে উল্লেখ করেন। লেখেন: "…অমূল্যধন বাংলা ছন্দের প্রকৃতি-সম্বন্ধে যা বলেন নি, তা বক্তব্যই নয়।" আর সেই অমূল্যধনই তো মৃত্যুর মাত্র বছর কয়েক আগেও রেখে যান তাঁর সংস্কৃত-ছন্দ-বিষয়ক এক অবিস্মরণীয় গবেষণা-কর্ম Sanskrit Prosody : Its Evolution (1976)। যে-কাজ, একমাত্র ছান্দসিকরূপেও তাঁর পরিচিতিকে করে তুলতে পারে আন্তর্জাতিক।

অথচ কী প্রচারবিমুখই না ছিলেন তিনি! প্রচারবিমুখ আর নেপথ্যচারী। তাঁর অধীনে ছন্দ-নিয়ে সামান্য কাজ-করার সূত্রেই আমি তাঁকে কিছুটা কাছে পেয়েছিলাম একদিন। এ আমার পরম সৌভাগ্য। আর আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যে একদিন শিলঙ এসেছিলেন, আজ ভাবি, সেও কম ভাগ্যের কথা নয়। তখন তিনি আশুতোষ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকর্ম-থেকে অবসরগ্রহণ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ইউ. জি. সি.-র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হয়ে আছেন। তখনই, এক গ্রীষ্মাবকাশে তিনি শিলঙে এলেন।

দিনটি স্পষ্ট মনে আছে। ১২ মে ১৯৬৮ সাল। তাঁর টেলিগ্রাম পেয়ে আমি

গৌহাটির আই. এ. সি. সিটি আপিসে গিয়ে উপস্থিত হই। দুপুরের দিকেই তিনি যথারীতি এয়ারলাইনসের বাসে করে এসে গেলেন ও আমাকে দেখে আশ্বস্ত হলেন। তখন আই. এ. সি.-র সিটি আপিসটি ছিলো পানবাজারের নাককাটা পুকুরের সামনে। তার কাছেই অধুনালুপ্ত ডে-লাইট রেস্টুরেণ্টে আমরা দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। মনে আছে, খুবই সসঙ্কোচে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করছি, 'স্যার, মুরগির মাংসে আপনার আপত্তি নেই তো ?'

শুনে হেসে ফেললেন। বললেন, 'কিছুমাত্র আপত্তি নেই।' তারপর কৌতুক করেই এক মধুর কটাক্ষ করলেন : 'তুমি বোধহয় আমাকে এক কুলীন বামুন মনে করেই কথাটা বলেছো ?' আমিও হেসে ফেললাম। খাওয়ার পর তাঁর একটু বিশ্রামের প্রয়োজন হবে মনে করে আগেভাগেই একটা ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। তখন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক যোগীরাজ বসু পানবাজারেই থাকতেন। খুব স্নেহ করতেন আমাকে। অমূল্যধনকেও বিলক্ষণই জানতেন। তবে সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিলো না। তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিলো অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মশাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু তিনি থাকেন বেশ একটু দূরে। আটগাঁয়ে। সেইসব ভেবেই, যোগীরাজ বসু নিজেই আমাকে বলেছিলেন, 'ওঁকে আমার এই আশ্রমবাড়িতে নিয়ে এসো। তাতে ওঁর কিছুটা বিশ্রামও হবে আর আমাদের আলাপ-পরিচয়ও হয়ে যাবে।'

পানবাজার 'মানি মেকিং ফার্মাসি'র দোতলায় সেই আশ্রমবাড়ি। যোগীরাজ বসু যার অধ্যক্ষ। সাধুসন্ত-প্রকৃতির পণ্ডিত মানুষ। কিন্তু অন্তঃকরণটি শিশুর মতো। অমূল্যধনকে পেয়ে কী খুশিই হলেন! অমূল্যধনও নিমেষেই মজে গেলেন। কোথায় বিশ্রাম! বিছানায় আধোশোওয়া অবস্থাতেই তাঁদের দুজনের অনর্গল কথাবার্তায় ঘণ্টাদেড়েক সময় কীভাবে কেটে গেলো। যোগীরাজ বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত, দর্শনশাস্ত্র ও ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ.। ডিব্রুগড় কনট কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপনায় তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হয়। অনেক দেরিতে শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ-উপরোধে পি. এইচ. ডি. করেন এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক-পদে যোগদান করেন। মাত্র কয়েক বছরই তিনি গৌহাটিতে ছিলেন। পরে হৃদ্‌রোগে আকস্মিক অকালপ্রয়াত হন। যোগীরাজ বসু অধ্যাপক সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক তারকনাথ সেনের প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

সেদিন অমূল্যধনের সঙ্গে যোগীরাজের প্রথম দর্শনেই তাঁদের অবিরল স্মৃতি-রোমন্থনে কী করে সময় কেটে গেলো ! কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে তখন সদ্য অমূল্যধনের জয়দেবের ছন্দ-বিষয়ক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার একটি অফ্‌প্রিণ্ট যোগীরাজকে উপহার দিয়ে ট্যুরিস্ট ট্যাক্সিতে এসে উঠলেন।

গৌহাটি থেকে শিলঙ একশো কিলোমিটারের পথ। সমতল থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে। বিকেলের মায়াবী আলোয় আঁকাবাঁকা পাহাড়ী বনপথ ধরে আমাদের ট্যাক্সি ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছে। অমূল্যধন দেখছেন, সেই রাস্তার ধারের ইতস্তত ছড়ানো ছোটো ছোটো কুঁড়েঘর আর পাহাড়ী মানুষদের। পিঠে থাপা বসিয়ে দূর-দূরান্ত ঝর্ণা থেকে ঘড়া করে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে যূথবদ্ধ খাসি মেয়েরা। কোথাও বা বড়োরাস্তায় পাহাড়ের গায়ে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে কোনো খাসি দিনমজুর তার পিঠের কাঠকুটোর বোঝাসুদ্ধই একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, মুখে কড়া তামাকের পাইপ। এক-একটা বাঁকের মুখে, অতর্কিত কোনো ট্রাক কি স্টেট বাস, নয়তো ট্যাক্সিই হুস করে প্রায় কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের রাস্তা থেকে আশপাশের দূরের পাহাড়ী পুঞ্জির চকিত আভাস আসে। ছোটো ছোটো কুঁড়ের মাথায় চিমনির ধোঁয়া। তারই ঢালে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে জুমচাষের সিঁড়ি-ক্ষেত। প্রচুর ভুট্টার ফলন হয়েছে। আর, এয়োতির সিঁথের মতো লালমাটির সরু রাস্তা। এঁকেবেঁকে দিগন্তে—বুঝি খুব নিচু হয়ে নেমে-আসা আকাশতলে উধাও হারিয়ে গেছে। প্রায় পাশা-পাশিই যেন সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মাইলের পর মাইল অগভীর জঙ্গল। আর তারই মাঝে মাঝে কলাবন। নিচে বড়োরাস্তারই সমান্তরে টানা ছোট্ট পাহাড়ী নদী। সেইদিকে তাকিয়ে কতকটা আপনমনে অস্ফুট বলে উঠলেন অমূল্যধন, 'কোথায়, পাইনগাছ তো দেখছি না !'

তাঁকে বলি, 'বরাপানি লেকের পর থেকে পাইনগাছ দেখা যাবে।'

'বরাপানি লেক আর কতো দূর ?'

'তা আরো পনেরো-কুড়ি মাইল পথ', তাঁকে জানাই। 'আর একটু পরেই নংপো আসছে। গৌহাটি-শিলঙের মাঝপথ। নংপোতে আধঘণ্টার মতো গাড়ি থামে। যাত্রীরা চা-টা খায়।'

তিনি বলেন, 'তা মন্দ কী, আমরাও একটু চা খেয়ে নেবো না-হয়।'

নংপোতে আমাদের ট্যাক্সি এসে গেলে ড্রাইভারকে থামতে বলি। ড্রাইভার

চেয়েছিল না-থেমে সোজা বেরিয়ে যাবে। আমাদের অনুরোধে সে থামলো। নংপো ছোট্ট পাহাড়ী শহর। থানা-পোস্টাপিস আর কিছু সরকারী আপিস আর দোকানপাট। প্রধানত আসা-যাওয়ার যাত্রীদের কল্যাণেই দিনের বেলায় জায়গাটা সরগরম হয়ে থাকে। সন্ধ্যের পর নিঝুম হয়ে যায়।

নংপোর রাস্তার ধারের ফলের দোকানগুলি দেখে মুগ্ধ হলেন অমূল্যধন। প্রচুর প্লাম ন্যাসপাতি পীচ এপ্রিকট, আর বড়ো-বড়ো পাকা পেঁপে, খুবই দীঘল পাকা-পাকা কলা আর আনারসের স্তূপ। সবই থরেবিথরে সাজানো।

'রাস্তায় কাটা ফল খেতে প্রবৃত্তি হয় না। এমনকি চোখের সামনে কেটেকুটে দিলেও না।' কয়েকটা টুকটুকে লাল প্লাম নাড়াচাড়া করতে-করতে তিনি বলেন, 'নয়তো, চা না-খেয়ে কিছু ফলই খাওয়া যেতো।'

"এ প্লামগুলো কিন্তু টক। ডোরিস প্লাম, মানে—শাদাটে আর লালরঙের ছোপ লাগা—এই প্লামগুলো—' আমি তাঁর হাতে একটি প্লাম তুলে দিই : 'খেয়ে দেখুন স্যার, কী মিষ্টি!' পথে খাবো ব'লে কিছু ডোরিস প্লাম কিনে আমরা আবার রওনা হই।

মে মাসের বিকেল এরই মধ্যে অনেক পড়ে এসেছে। বরাপানি পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার রঙ আরো ঘন হয়ে উঠলো। দীর্ঘ লেকের জলে সূর্যাস্তের ছায়া পড়ে কেমন ধূসররঙিন হয়ে উঠেছে তার নিস্তরঙ্গ জল।

'একটু যেন শীতই করছে হে—'

আমি তাঁকে সোয়েটার আর জহরকোটটা ভালো করে পরে নিতে বলি।

তিনি হাসেন : 'কলকাতায় মে মাসে গরম জামা গায়ে চাপাচ্ছি ভাবতে গেলেও আতঙ্ক হয়।'

বরাপানি লেকের পর, কিছুক্ষণের মধ্যেই অমূল্যধন তাঁর প্রার্থিত সেই পাইনময় শিলঙ শহটির মধ্যে প্রবেশ করে—প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে পড়লেন।

'কী সুন্দর এখানকার বাড়িঘর, আর রাস্তা, আর মেয়েরা—'

'শুনেছি, একসময় নাকি এখানকার বিদেশী সাহেবসুবোদের চোখে শিলঙটা "স্কটল্যাণ্ড অব দ্য ঈস্ট" বলে মনে হতো!'

বড়োবাজার পেরিয়ে আমাদের গাড়ি লাবান 'আনন্দভবন'-এ এসে থামলো। আমরা তখন এই 'আনন্দভবন'-এ থাকি। ভাড়াটে বাড়িতে অমূল্যধনের আতিথেয়তায় যথেষ্ট ত্রুটি ঘটবে এই আশঙ্কা আমার ছিলোই। কিন্তু বাড়ির

মালিক—শ্রীমতী মৃণালিনী পাল, আমাদের মাসীমা, সম্মানীয় অতিথির জন্য সমস্ত সুবন্দোবস্তই করে দিয়েছিলেন। তাঁর থাকার জন্য দোতলায় বাথরুম-সংলগ্ন প্রশস্ত ঘর, লেখাপড়ার টেবিল। আর মস্ত লম্বা কাচের জানালার ধারটিতে বসেই যাতে দূরের দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন—তার সব ব্যবস্থা। ঠিক সেই ঘরটিরই নিচের তলায় আমরা থাকি। আমি, আমার স্ত্রী ও আমাদের চারবছর বয়সের শিশুপুত্র। ঘরটি থেকে সরাসরি কাঠের সিঁড়ি নেমে এসেছে আমাদের ঘর-বরাবর। কথা ছিলো, খাওয়ার সময়টাতেই তাঁকে নিচে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু সে-নিয়মে তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে দিনের মধ্যে অসংখ্যবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতেন। আমাদের সিটিং-কাম্-ডাইনিং রুমের একান্তে একচিলতে রান্নার জায়গা। তারই মুখে কখনো চেয়ারটিতে, কখনো মোড়ায় বসে খুব গল্প করতেন আমার স্ত্রী অশোকার সঙ্গে। তার হাতের ইলিশমাছের মুড়ো-দিয়ে মিষ্টি কুমড়োর ঘণ্ট ব্যাপারটার খুবই সুখ্যাতি করতেন। বলতে শুনেছি : 'বাঙালদের এই রান্নাটার তুলনা হয় না'—ইত্যাদি। তাঁরই স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে—দোতলায় তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিলো বটে, কিন্তু বলতে গেলে একমাত্র ঘুমোবার সময় ছাড়া, সমস্তটা সময় তিনি আমাদের ঘরে বসেই গল্পগুজব করে কাটিয়ে দিতেন। সে কী অন্তরঙ্গ মধুর সঙ্গ, কী সুখকর স্মৃতি! সে-ঘরোয়া আড্ডায় যোগ দিতে আমার অধ্যাপক বন্ধুরা, সরকারী কর্মচারী, তরুণ লেখক, সাহিত্যমোদী পাঠক প্রতি সন্ধ্যায় এসেছেন। আর এসেছে ছাত্রছাত্রী। যাদের বি. এ. ক্লাসের স্পেশাল বেঙ্গলী কোর্সেও আছে 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র'-নামক সেই অবধারিত গ্রন্থটি! এবং যে-বইয়ের লেখক কিনা এই অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ই! মানুষটিকে না দেখে, ঐ নীরস তত্ত্বগর্ভ গ্রন্থ পড়ে ছাত্রছাত্রীরা হয়তো ভাবতো, কী গুরুগম্ভীর রাশভারি আর রসকষহীন শক্তপোক্ত কাঠের মতোই না-জানি হবেন তিনি! যিনি, জীবনে পান থেকে চুন-খসার স্খলন-টুকুকেও নিশ্চয় ছন্দপতনই বলেন! তা, ছাত্রছাত্রীদের ছন্দবিভীষিকা ততো দূর করতে না পারলেও, মানুষটি যে তিনি গম্ভীর প্রকৃতির বাঘ নন, বরং রীতি-মতো খোশগল্পের সহজ সরল মানুষই, যিনি নিজে হেসে অন্যদেরও কমবেশি হাসাতে পারেন গল্প-কথায়, সে-স্মৃতি ভুলতে পারি না।

মাত্র দিন-কয়েকই ছিলেন তিনি শিলঙে। ১২ মে বিকেল থেকে ২৪ মে'র সকাল পর্যন্ত। তাঁর আসা-যাওয়ার দিন-দুটি বাদ দিলে, প্রকৃত অর্থেই শুধু

এগারো দিন। কিন্তু এই অল্প কয়েকটি দিনও তিনি এখানে নিছক ঘরে বসে কাটিয়ে দেননি। সকাল থেকে দুপুর আর বিকেল থেকে সন্ধ্যে, আমরা শিলঙের যা-কিছু দ্রষ্টব্য, তার জন্য চষে বেড়িয়েছি। এবং প্রায়শই পায়ে হেঁটে। তখন তাঁর স্বাস্থ্য মোটামুটি ছিলো শক্তসমর্থ। তাঁর বুকে তখনো 'পেসমেকার' বসেনি। বয়সোচিত হজমের গোলমালে বোধকরি কিছুটা সতর্ক ছিলেন। তাই দুপুরের আর রাতের খাওয়ার পর তাঁকে নিয়মিত কিছু-পরিমাণ হজমি-গুলি খেতে হতো। চোখেরও কিছু একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। আর সেজন্য প্রতি রাতে শুতে যাওয়ার আগে কী-একটা আই-ড্রপ নিতেন। এইটুকু ছাড়া আর সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন পারফেক্ট। মানুষটিও ছিলেন খুব ডিসিপ্লিন্‌ড্‌ ও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের। বেশবাসও খুবই সাদাসিধে। এই ব্যবহারিক জীবনের আড়ম্বরহীন পারিপাট্যের সঙ্গে তাঁর লেখাপড়া কর্মজীবনের একটা অদ্ভুত মিল যে সঙ্গতি ও সুষমার পরিচয় দেয়, তাইতেই মনে হয়, আজীবন ছন্দশাস্ত্রচর্চায়ও তিনি ছিলেন এক উন্নতশ্রী জীবনসন্ধানী। পরিমিতি ও স্পষ্টতা তাঁর যে-কোনো ধরনের রচনারীতিরও কেন্দ্রীয় শক্তি। নৈয়ায়িকের মতো যুক্তিপ্রয়োগে ক্ষিপ্র ও ক্ষুরধার ছিলো তাঁর বচনশৈলী। বিষয়-সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ও অধিকার বহুমুখ, তুলনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী। আর দৃষ্টিভঙ্গির সজীবতায় নিরন্তর মৌলিক ও ক্লাসিক তাঁর মানসতা। হয়তো অধ্যাপনায় তিনি ততো আবেগদীপ্ত বাক্‌পটু ছিলেন না। এমনকি বিভিন্ন লেখাতেও যে-আবেগ ছিলো অপ্রকট আর প্রচ্ছন্ন, সেই বাক্‌সংযমই তাঁর লেখায় ও অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় খুবই অনায়াস বৈদগ্ধ্যের রূপ পেয়েছে। অমূল্যধনের এই ঘনিষ্ঠতর সঙ্গ, তাঁর শিলঙের সে-স্বল্পস্থায়ী 'বসন্তদিনে', ক্ষণেক্ষণেই অনুভব করেছি।

প্রথম দিন প্রাতঃরাশের টেবিলেই ঠিক হয়ে গেল—আমরা এ-ক'টাদিনের মধ্যে কোথায় কোথায় যাবো আর যাবো না। এবং শিলঙ ছাড়াও—সেই পৃথিবীর অধিক বৃষ্টিপাতের দেশ মৌসিনরাম না গিয়ে কেন চেরাপুঞ্জিতেই একবারটি অবশ্যই যেতে হবে তাঁকে। এই নিখুঁত প্রোগ্রামটিও রচনা করলেন অমূল্যধনই। এরই মধ্যে দুটি দিনের সন্ধ্যেবেলা রইলো একটু আলাদাভাবে অন্যতর প্রয়োজনে ধার্য হয়ে। একদিন শিলঙ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তিনি বক্তৃতা দেবেন এবং অন্য আর-একটি সন্ধ্যায় যেতে হবে তখনকার নেফার লিঙ্গুয়িস্ট বিভাবসু শাস্ত্রীর বাড়িতে একটি আমন্ত্রিত সাক্ষাৎকারে।

তাঁর শিলঙ-বাসের প্রথম সকালবেলায়, আমরা গেলাম রিলবঙের 'জিৎভূমি' বাড়িটিতে। এই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ এসে কিছুদিন ছিলেন। 'পূরবী'র "শিলঙের চিঠি" কবিতাটি এখানে বসেই লেখা। পুরো দক্ষিণ আর পশ্চিম খোলা একটি আসাম-টাইপ বাংলো-বাড়ি। তার চওড়া লম্বা বারান্দা। বাড়ির সামনে পাথরে-বাঁধানো প্রশস্ত চত্বর আর তারই গা-ঘেঁষে নানারকমের মরশুমী ফুলের বিছানা প্রায় সারা বাড়িটাকেই ঘিরে রেখেছে। বাড়িটি অপেক্ষাকৃত একটি উঁচু টিলার উপর। যেখানে ঘরে বসেও শিলঙ-সিলেট রোডের চকচকে পীচ চোখে পড়ে। আর তার ধারেই মিলিটারি ক্যাণ্টনমেণ্ট। বেশ অনুমান করতে পারি, এই 'জিৎভূমি'র দক্ষিণের প্রথম কোণের ঘরটিতে বসেই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন "শিলঙের চিঠি"।

এখানে খুব লাগলো ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়,
আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন-পাতার গন্ধ বয়;
বেশ আছি এই বনে বনে, যখন-তখন ফুল তুলি,
নাম-না-জানা পাখি নাচে, শিস্ দিয়ে যায় বুলবুলি।
ভালো লাগে দুপুরবেলায় মন্দমধুর ঠাণ্ডাটি,
ভোলায় রে মন দেবদারু-বন গিরিদেবের পাণ্ডাটি।
ভালো লাগে আলোছায়ায় নানারকম আঁক কাটা,
দিব্যি দেখায় শৈলবুকে শস্য-খেতের থাক কাটা।
ভালো লাগে রৌদ্র যখন পড়ে মেঘের ফন্দিতে,
রবির সাথে ইন্দ্র মেলেন নীল-সোনালির সন্ধিতে।
নয় ভালো এই গুর্খাদলের কুচকাওয়াজের কাণ্ডটা,
তা ছাড়া ঐ ব্যাগ্রপাইপ নামক বাদ্যভাণ্ডটা।
ঘন ঘন বাজায় শিঙা—আকাশ করে সরগরম,
গুলিগোলার ধড়ধড়ানি, বুকের মধ্যে থরথরম।
আর ভালো নয় মোটরগাড়ির ঘোর বেসুরো হাঁক দেওয়া,
নিরপরাধ পদাতিকের সর্বদেহে পাঁক দেওয়া।

রবীন্দ্রনাথের ১৯২৩ সালের জুন মাসের এই শিলঙ-বর্ণনায় যা ছিলো, যা আছে—তা এই রিলবঙের মতো এমন পুরোনো পাড়ায় এলে আজও যেন খানিকটা পাওয়া যায়। নয়তো, আধুনিক শিলঙ আমূল বদলে গেছে। এমনকি

১৯৬৮-র শিলঙও তার পঁয়তাল্লিশ বছর আগের শিলঙের মতোই ছিলো না আর। তবু পুরোনো দিনের শিলঙটিকে খানিক পেতে হলে, হয়তো লাবান গ্যারিসন গ্রাউণ্ড বাঁ-পাশে রেখে, ছোট্ট কাঠের পুল পেরিয়ে, ডানদিক-বেঁকে রিলবঙের পথটিই ধরবো আমরা। পথের এক বাঁক থেকে আর এক বাঁকের চৌরাস্তার ঠিক মুখটাতেই এই 'জিৎভূমি'। মনে হয়, এক ফার্লং পথটুকুই আজও পুরোনো শিলং। এমনি পুরোনোর আমেজ আসে, যদি যাই ওয়ার্ড লেক থেকে উঠে-আসা রাজভবনটির গা-ঘেঁষে অন্য এক উৎরাইয়ে। উঁচু-উঁচু পাইনগাছে ছাওয়া নির্জন সেই বিডার রোডে। যা ঘুরে-ঘুরে অকল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে এসে মিশেছে পোলোগ্রাউণ্ডে।

অমূল্যধন এই প্রথম এসেছেন শিলঙ। কিন্তু তিনিও খুঁজছেন সেই পুরোনো দিনের শিলঙকে। যা অন্তত ১৯১৯, '২৩ আর '২৭-এরই কাছাকাছি সময়ের হয়। এই তিনবারই রবীন্দ্রনাথ শিলঙ এসেছেন। 'জিৎভূমি'তে বসে লিখেছেন 'রক্তকরবী' নাটকের প্রথম খসড়া, 'যক্ষপুরী' নাম দিয়ে। ১৯১৯-এ প্রথমবার এসে কিছু চিঠিপত্র ছাড়া প্রায় কিছুই লেখেননি। আর ১৯২৩-এ এই 'জিৎভূমি'। শেষবারের মতো এসেছিলেন ১৯২৭-এ। লাইমুখরার আপল্যাণ্ড অঞ্চলের একটি বাড়িতে (এখন তা সিডলির রানীর বাড়ি)। এ বাড়িতেও 'যোগাযোগ' উপন্যাসের প্রথম খসড়াটি তৈরি করেন 'তিনপুরুষ' নামে। আর, কে বলবে, এই তিনবারের শিলঙ-বাসেরই কখনো, 'শেষের কবিতা'র কোনো বীজ ভাবনা-কল্পনার আকারেও তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিলো কিনা। যদিও সে-উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন ব্যাঙ্গালোরে বসে। কিন্তু কী সূক্ষ্ম আর ইঙ্গিতপূর্ণ এই যোগাযোগ, 'তিনপুরুষ'-ও 'যোগাযোগ' হয়ে উঠেছিলো যে ঐ ব্যাঙ্গালোরেই।

কী জানি, হয়তো এইসবই ভাবছিলেন অমূল্যধন। 'জিৎভূমি'র তরুণী বাঙালি গৃহবধূর আপ্যায়নে মুগ্ধ তিনি, রবীন্দ্রস্মৃতির কোনো প্রত্যক্ষ চিহ্ন বা উপকরণ প্রত্যাশা করেন! অনেক খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেন তাঁকে। তিনি সসঙ্কোচে জানান, অতি-সম্প্রতি তাঁরা এই বাড়িটি কিনে উঠে এসেছেন এখানে। এর আগে বাড়িটির মালিক ছিলেন এক অসমীয়া ভদ্রলোক। বাড়ির চত্বরে রবীন্দ্রনাথের এক আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। তাঁর জন্মশতবর্ষের উপলক্ষে। তারই ট্যাবলেটে খোদিত হয়েছে 'শিলঙের চিঠি' আর 'যক্ষপুরী' রচনার কথা।

এ তবু মন্দের ভালো। কিন্তু এই বাড়িরই মিনিট দুয়েকের দূরত্বে রিলবঙেই

—ছোটো সে-পাহাড়ি নদীর ধারে 'ব্রুকসাইড' বাড়িটি। যেখানে প্রায়-নিশ্চিহ্ন গেটের ভগ্নজীর্ণ একটি থামে—অস্পষ্ট অক্ষরে শুধু পড়া যায় যে তিনি ১৯১৯ সালে এখানে কিছুদিন ছিলেন। গেট থেকে ধনুকের মতো বেঁকে একটি রাস্তা ঐ বাড়ির গাড়িবারান্দায় এসে উঠেছে। ছোটো নদীর বেড়-দেওয়া এই বাড়ির পনেরো আনাই হয়তো বাগান ছিলো কোনোদিন। এখন তা পোড়ো বাড়ি। জানালা-দরজা ভাঙা। ঘুলঘুলির রঙিন কাঁচের চিহ্নমাত্রও বিরল। অবশ্য ১৯৬৮ সালেই, আমরা বাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখতে গিয়ে প্রথম আবিষ্কার করি—পোড়ো বাড়িও পুলিশবিভাগের কোনো-এক দপ্তরে পরিণত হয়েছে।

যতোদূর জানি, ১৯১৯ সালেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ প্রথম শিলং আসেন। আর প্রথম দর্শনেই তাঁরও মনে হয়েছিলো—"শিলং…দার্জিলিঙের চেয়ে অনেক ভালো—"। পুজোর ছুটিতে মাত্র তিন সপ্তাহের মতো তিনি ছিলেন এখানে। প্রচুর লোকজনের আসা-যাওয়ার ভিড়ে ঠিকমতো শান্ত হয়ে বসতেও পারেননি। কোনো-একটি চিঠিতে একথা তিনি লেখেন। কিছু চিঠিপত্র ছাড়া বড়ো কোনো উল্লেখযোগ্য লেখাও এ-বাড়িতে বসে লেখেননি। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরলোকগত প্রাক্তন ছাত্র হিতেন্দ্রনাথ নন্দীকে লেখা সেই চিঠিটি (দ্রঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৩, মাঘ—চৈত্র ১৩৭৯, পৃ. ১৯৫) হুবহু উদ্ধৃত করি।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

হিতেন, শিলঙ পাহাড়ে এসে খুব ভাল লাগচে। দার্জিলিঙের চেয়ে অনেক ভাল—তোমরা যদি থাকতে তবে খুসি হতুম। এখনও শান্ত হয়ে বসতে পারি নি—লোকের ভিড় চল্‌চে। কাল ব্রাহ্মসমাজে এখানকার ব্রাহ্মদের সঙ্গে আলোচনা করবার কথা আছে। আমাকে বেদীতে বসে উপাসনা করতে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু আমি তাতে রাজি নই। আসবার সময় গোহাটিতে বৃষ্টি পেয়েছিলুম কিন্তু এখানে এসে অবধি আর বৃষ্টি নেই—বেশ উজ্জ্বল রৌদ্র দেখা দিয়েচে। আমরা যে জায়গাটায় আছি এ খুব নিভৃত এবং এখানকার রাস্তাগুলি বেশ নির্জন—দেওদার গাছের অবগুণ্ঠনে ঢাকা এবং ছোটো নির্ঝরিণীর কলরবে মুখরিত। এখানে ছুটির শেষ পর্যন্ত থাকবার ইচ্ছে আছে। ইতি ১ কার্তিক ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'ব্রুকসাইড' বাড়িটির 'ব্রুক'টি যে প্রকৃত অর্থে ছোটো নদী নয়, 'ছোটো নির্ঝরিণী'ই তার প্রমাণ আজও শিলং গেলে চোখে পড়বে। এরপর আমরা রিলবঙ থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলাম লাইমুখরায়। লাইমুখরার আপল্যাণ্ড অঞ্চলের একটি বাড়িতে। ১৯২৭ সালের গ্রীষ্মাবকাশে হয়তো শেষ-বারের মতো রবীন্দ্রনাথ এইখানেই উঠেছিলেন। আর, যে বাড়িতে বসে তিনি লেখেন 'তিনপুরুষ'। 'যোগাযোগ' উপন্যাসটির প্রাথমিক খসড়া। এখন, সেই বাড়ির দোরগোড়াতে—লনে—স্থাপিত আছে এক স্মৃতিসৌধ। এইটুকুই।

রবীন্দ্রস্মৃতি-বিজড়িত শিলঙের এই তিনটি বাড়ি ছাড়াও আরও কিছু টুকরো-টুকরো অনুষঙ্গ আছে। যার উপলক্ষ ধরে, আমরা লাইমুখরার আপল্যাণ্ড থেকে ডনবস্কো চার্চ-টি দেখা শেষ-ক'রে, তারই স্কোয়ারের নিচের পায়ে-হাঁটা রাস্তা দিয়ে রাজভবন আর লেক-বরাবর বড়ো রাস্তায়—পুলিশবাজার ব্রাহ্মসমাজে চলে এলাম।

অমূল্যধনকে বলি, খুব সম্ভব ১৯১৯-এ প্রথম শিলঙে এসে রবীন্দ্রনাথ "এখানকার ব্রাহ্মদের সঙ্গে আলোচনা" এবং "উপাসনা"য় অংশগ্রহণ করে-ছিলেন। অবশ্য বেদীতে বসে নয়। আর এরই স্মৃতিতে, এই মন্দির-সংলগ্ন ঐ "রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রন্থাগার"। তাঁকে আঙুল তুলে রাস্তার উঁচু পাড় থেকেই বাড়িটি দেখাই।

পুলিশবাজার শিলঙের প্রধান কেন্দ্রস্থল। ছোটোবড়ো রাস্তার হিসেবে সাতমাথার মোড়। তারই একটি দিয়ে, আমরা অতঃপর একটি জরাজীর্ণ সিনেমাহলের সামনে এসে দাঁড়াই। অমূল্যধন অবাক হন। 'এখানে কী ?'

আমিও খানিকটা লজ্জিত বোধ করি। ভাবি, তাই তো, শুধু শুধু তাঁকে এরকম টানাহেঁচড়া করছি কেন। তবু সসঙ্কোচেই বলি, 'এটি এখন একটি সিনেমা-হল্। কিন্তু গোড়ায় এটিই ছিলো "কুইনটন হল্"। এখানে রবীন্দ্রনাথ তখনকার শিলঙের প্রাক্তন ছাত্রীসঙ্ঘ-আয়োজিত নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান দেখতে এসেছেন। হয়তো তাঁরই রচিত শ্যামা কি চিত্রাঙ্গদার। বক্তৃতাও দিয়েছেন। সুতরাং, জেল রোড আর কুইন্টন রোডের এই হল্‌টি রবীন্দ্রস্মৃতিধন্য।'

অমূল্যধন বলেন, 'ছাখো, রবীন্দ্রনাথ তো বার-তিনেকই এসেছেন এই শহরে আর তাঁর "শেষের কবিতা"ও জানে কতো লোক ! অবশ্য সেই কতোর সবটাও হয়তো আমরাই !' বাড়ি ফেরার পথে, চড়াই ভাঙতে-ভাঙতে, হাঁটা থামিয়ে,

হঠাৎই হাঁফধরা গলায় আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'কিন্তু এখানকার পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে, বিশেষ ক'রে—খাসিরাও কি জানে এর কিছু?' 'হয়তো জানে না। কিংবা একটু-আধটু জানেও হয়তো।' আমি বলি। 'এখানে অ-খ্রীষ্টান খাসি সম্প্রদায়ের একজন বিদুষী মহিলা আছেন। যাঁকে আমরা হেলিমন-দি ব'লে ডাকি। হেলিমন খঙপাই। তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা খাসি ভাষায় অনুবাদও করেছেন।'

'কোথায় থাকেন তিনি?' অমূল্যধন খুব ঔৎসুক্য বোধ করেন।

'মৌলাই-এ। তাঁর স্বামী অ্যাডভোকেট। ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীরা অবশ্য খ্রীষ্টান সমাজেরই চালচলনে মানুষ। বাংলা জানেও না। তবে হেলিমন-দি অন্য রকমের।' আমি বলি। 'সেই কবে বাংলা নিয়ে বি. এ. পাস করেছেন। আর এখানকার রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য সঙ্ঘের সভানেত্রী তিনি। বাংলায় বক্তৃতা দিতে পারেন।'

শুনে কিছুটা খুশিই হলেন যেন। তবু বাড়ি ফেরার সারাটা রাস্তাই কেমন চুপচাপ নিজের মধ্যে ডুবে রইলেন। হঠাৎই একবার ব'লে উঠলেন, 'আসলে কী জানো, রবীন্দ্রনাথকে যতো বেশি বাঙালি কবি ব'লে ভাবা হচ্ছে ততোই তিনি সমস্ত দেশের মানুষ থেকে দূরে প'ড়ে থাকছেন! কেন?' তাঁকে ঈষৎ উত্তেজিতই মনে হলো। 'ন্যাশনাল পোয়েট যিনি, তাঁর বাঙালিত্বই কি বড়ো ক'রে বলবার কথা?'

আমি প্রতিবাদ করতে চাই: 'আমরা তো তা বলি না।'

'তুমি বলো না, আমিও বলি না। কিন্তু অনেকে বলে। বলতে চায়।'

'তারা হয়তো—' আমি ইতস্তত ক'রে বলি, 'রবীন্দ্ররচনাবলী এখনো পড়াই শুরু করেনি।' বলি, 'ঠিকমতো তাঁকে পড়তে শুরু করলে ধারণাটা নিশ্চয়ই পালটাবে। তখন, রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতাও হবে তাঁদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।'

'না। তা আপাতত হবার নয়। এর জন্য রাষ্ট্রকাঠামোরও একটা গুরুতর পরিবর্তন জরুরি।'

আমি প্রায় চমকে উঠি। কী বলছেন অমূল্যধন!

'কারুর স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়ে আর তাতে এক-একটা শ্বেতপাথরের ট্যাবলেট বসিয়ে কয়েক ছত্র ত্রিপদী খোদাই ক'রে দেওয়ার শেষকৃত্য—কখনোই কোনো

দেশের জাতীয় কর্তব্য হতে পারে না!'

ঠিক কোন্ ক্ষতমুখ থেকে তাঁর এই ক্ষোভ ও উষ্মার প্রকাশ, তা যেন কতোকটা আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু কিছু বলি না আর।

বাড়ি এসে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রাম নিলেন। বিকেলের দিকে খুব হাওয়া উঠলো। মে মাসের সাঁই-সাঁই বসন্ত বাতাস। পাইনবনে পাতা-ঝরার ধূম গেছে এপ্রিল পর্যন্ত। মে-তে গজিয়েছে সবুজ চিকন কতো নতুন পাতা। ঐ হাওয়ার ভিতরেই বিকেলে আমরা লেকে বেড়াতে যাবো ব'লে বেরিয়ে পড়েছি। পায়ে হাঁটা পথে—লেডি হায়দার পার্ক হয়ে। পার্কের উইলো গাছটির তলায় দাঁড়িয়ে দম নিতে নিতে চারপাশটা দেখতে লাগলেন তিনি। প্রচুর ডালিয়া আর চন্দ্রমল্লিকা ফুটে আছে। পার্কের দুটি প্রধান গেটে লতানো গোলাপের ঝাড়। নানান জাতের ছেলেমেয়েদের ভিড়। দোলনা, স্লিপ-চড়া নিয়ে তাদের কাড়াকাড়ির ধুম। ঘাসের ওপর—টিলায়—এখানে-ওখানে এক এক দঙ্গল খাসি মেয়েরা তাদের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বেড়াতে এসেছে। বাচ্চাদের খেলতে দিয়ে কেউ কেউ ব'সে আছে স্থির হয়ে। বিহারী বাদাম-ওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে: 'বাদাম ভাজা—'

পার্কের দক্ষিণদিকে—টিলার ওপর মেয়েদের 'পাইন মাউণ্ট স্কুল'। নীল-সাদা স্কুল-ইউনিফর্ম-পরা ফুরফুরে হস্টেলের মেয়েদের বাস্কেট-বল খেলার মৃদু কলগুঞ্জন ভেসে আসছে।

পার্কের পুবদিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে আমরা কয়েক পা ডানদিকে গিয়ে ক্রিনোলাইন ফল্‌সটিও দেখে নিলাম। ওখানে একটি সুইমিং-পুলও আছে। ফল্‌স নামমাত্র। তাছাড়া বর্ষা নামবার আগে প্রায় মে মাস পর্যন্ত শিলঙে ঝরনার কঙ্কালসার চেহারাটাই দেখতে হয়। বৃষ্টি নেই। বারিক-পয়েণ্ট থেকে সোজা আমরা চলে এলাম লেকে।

ওয়ার্ড লেক। লেকের জলে ইতস্তত ছড়ানো বোট। অনেক লোকসমাগম হয়েছে। পাশেই—অনেকটা নিচে ছোট্টো বোটানিক্স। লেকের কাঠের পুলের ওপর দাঁড়িয়ে অমূল্যধন ছোলাভাজার এক-একটি দানা ফেলছেন জলে আর মাছ এসে টুপ ক'রে তা নিমেষেই খেয়ে যাচ্ছে। একমুঠো ছোলা ফেললে মাছেদের ভিড়ে আর হুটোপুটিতে জল তোলপাড় হয়ে উঠছে। বড়ো বড়ো মাছ। বেশ

মজা লাগে। খুব মজাই পাচ্ছিলেন তিনি। লেকটির পুবপাড়ে রাজভবন। পুলের ওপর দাঁড়িয়েই তার কিছুটা দেখা যায়। দক্ষিণের টিলায় শিলং ক্লাব। পশ্চিমে —এম. এল. এ. হোস্টেল। যার পিছনেই পুলিশবাজার। লেকের ধারে ডি.সি.'র বাংলো ঘেঁষে উত্তরমুখী রাস্তাটা এঁকেবেঁকে নেমে গিয়েছে অকল্যাণ্ডের দিকে। আর সেই বাংলোরই ডানদিকে চড়াই ভেঙে খানিক উঠে গেলে শিলঙের সেরা হোটেল 'পাইনউড'। সন্ধ্যে ঘনিয়ে ওঠার আগেই আমরা লেক থেকে চ'লে এলাম পুলিশবাজার। পুলিশবাজার থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে বড়ো-বাজার। শিলঙের প্রধান বাজার। মস্ত বড়ো। একটি টিলার ওপর। ছোটো আর মাঝারি প্রচুর বাঙালি ব্যবসায়ী চোখে পড়বে। মাছের আর সব্জীর দোকান অবশ্য একচেটিয়া খাসি মেয়েবিক্রেতাদেরই হাতে। তাদের সম্বোধন-করার বেশ একটা শিষ্ট রীতি আছে। হয় 'কং' (দিদি), নয়তো 'মামী' ব'লে। পুরুষদের ডাকতে হয় 'মামা'। খুবই সম্মানজনক সে-সম্বোধন। বাজারে জিনিসপত্রের যেমন আমদানি তেমনি বিক্রি। বহু দূর-দূর পুঞ্জি থেকে পাহাড়ি মানুষেরা আসে এই বাজারে। কী নেই সেখানে! পাইনকাঠের সস্তা ফার্নিচার থেকে শুকনো মাছ। টেলারিং-হাউস থেকে কাফিয়াৎ-এর (দিশি মদের) সরাইখানা—সবই। ইলেকট্রিক আলো সত্ত্বেও সমস্ত বাজারেই ইতস্তত মশালও জ্বলছে এখানে-ওখানে। বড়োবাজার থেকে বাসে চেপে আমরা চলে এলাম আমাদের পাড়ার বাজারে। অর্থাৎ লাবান বাজারে।

এটিও মশাল-জ্বলা রাতের বাজার। তবে খুব ছোটো। ইলেকট্রিক আলো আর মশালের আলোয় ছোট্টো বাজার জমজমাট। শিলঙের সব বাজারই রাতে বসে। পাহাড়ের নিয়ম। এখানেও বিক্রেতাদের অধিকাংশই খাসি রমণী। আমরা যে-স্টল থেকে নিয়মিত মাছ কিনি, তার মালিক এক শিক্ষিত আর সুদর্শন খাসি যুবক। নিজেই দোকানে বসেন। দক্ষহাতে মাছ ওজন ক'রে কেটেকুটে দেন। কোনো বিরক্তি নেই। তার সঙ্গে ইংরেজিতে মাছের দরদাম কথাবার্তা হচ্ছিলো শুনে অমূল্যধন একটু বিস্মিত হন। আমি জানাই, 'ছেলেটি এ. জি. আপিসে চাকরি করে। সন্ধ্যেবেলা মাছ নিয়ে বাজারে বসে। খাসিদের এই ডিগনিটি-অব-লেবার খুবই প্রশংসনীয়। এরই এক বোন আবার আমাদের কলেজের ছাত্রী!' হাসতে-হাসতেই বলেন অমূল্যধন, 'কলকাতায় আমাদের হাজরা পার্কের বাজারে যদি এমনটি দেখা যেতো!'

একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে একনজরেই বাজারটা দেখে নেন তিনি। 'শাক-সব্জীর আমদানি তো মন্দ নয় হে!'

'হ্যাঁ, বাজারটা ছোটো, তবে পাড়ার লোকদের পক্ষে যথেষ্টই।'

'আর কেমন ফ্রেশ্‌!'

'তা অবশ্য নয়।' আমি হেসে বলি। 'ওটা জলে-চোবানোর গুণ!'

'আরে!' অমূল্যধন একটা সব্জীর দোকান লক্ষ্য করে এগিয়ে যান। 'পদিনা পাতা না?'

দোকানের 'কং' (দিদি) হেসে স্পষ্ট বাংলায় বলে, 'হ্যাঁ বাবু, পদিনা। নিয়ে যান, চাটনি খাবেন।' স্টলটির মালিক একটি বাঙালি ছেলে। বিয়ে করেছে খাসি মেয়েকে। আমরা বলি মতি'র দোকান। বাঙালির সঙ্গে ঘরকন্না করছে ব'লেই যে মেয়েটি বাংলা বলতে পারে এমন নয়। তখনো পর্যন্ত অনেক খাসিই—বিশেষত যারা হাটবাজার ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে থাকে, তাদের অনেকেই কিছু-না-কিছু বাংলা জানে। যেমন অনেক ব্যবসায়ী বাঙালি-ই ভালো খাসি জানে।

দু'তিন আঁটি পদিনা পাতা হাতে তুলে নিয়ে অমূল্যধন আমাকে শুধোন, 'পদিনা নেবে না?' তারপর ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে তাকান, 'তোমরা খাও তো?' 'না না, সকলেই খায়। নেবো বৈকি।' আমি সলজ্জভাবে বলি। অতএব, আলু ফুলকপি স্কোয়াসের সঙ্গে বেশ কিছু পদিনা পাতাও কেনা হয়।

রাতে খেতে ব'সে—শিলঙেও আমরা পদ্মাপারের ইলিশ পাচ্ছি কী ক'রে—তা নিয়ে ঈষৎ হাসিঠাট্টা করেন অমূল্যধন। আমি জানাই তাঁকে, 'মাত্র ছিয়াশি মাইল দূরে সিলেট। ডাউকি-বর্ডারের দূরত্ব আরো কম। মাত্র তিরিশ-বত্রিশ মাইল। দরজা হাট ক'রেই খোলা আছে।'

পরদিন দুপুরেও খেতে খেতে ইলিশপ্রশস্তি চলে। বিশেষ ক'রে ইলিশের মুড়ো দিয়ে সেই মিষ্টি কুমড়োর ঘণ্ট! বলেন, 'বাঙালদের এই রান্নাটি অপূর্ব। বেশ রেঁধেছো অশোকা!' তাঁর তারিফ শুনে আমার স্ত্রী ওঁর পাতে আর একটু ঘণ্ট দেন। 'না, না, আর দিয়ো না', উনি মৃদু আপত্তি করেন। 'তোমাদের দেশ কোথায়, অশোকা?'

অশোকা সগর্বে বলে, 'ঢাকা। যদিও দেশ দেখিনি। জন্মকর্ম সবই আসামের ডিগবয়ে।'

'আর বীরেনদের ?'

আমি বলি, 'রাজশাহী।'

'হুঃ, কোথায় ঢাকা'র ইলিশের ঘণ্ট আর কোথায় রাজশাহীর চাপড়ঘণ্ট !' বেশ মজা ক'রেই একটু কৃত্রিম তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন তিনি।

সুযোগ পেয়ে অশোকাও যোগ দেয়, 'ওরা খেতেই জানে না !'

'তাই বলো—' অমূল্যধন লুফে নেন কথাটি, 'নইলে, বীরেন পদ্দিনাপাতার চাটনির মর্ম বোঝেনা !'

আমি হো হো ক'রে হেসে উঠি।

'আমার মামার বাড়ি অবশ্য ঘটি।' অশোকা জানায়। 'দাদু কলকাতার বাদুড়বাগানের বোস। পরে বালিগঞ্জে উঠে যান। মণীন্দ্রলাল বসু আমার এক দাদু।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো, চিংড়ির মালাইকারি-ঘরানারও তালিম নিশ্চয় কিছু আছে তোমার ?'

'তা আছে।' খুবই সলজ্জভাবে অশোকা জানায়।

আমাকে বলেন, 'এখন তো তোমাদের বাড়ি কল্যাণী। আর ঠিক তারই ওপার গঙ্গায় আমাদের বাঁশবেড়ে। জানো তো, আমাদের বাড়ি বাঁশবেড়িয়া ?'

'জানি।' তাঁকে বলি।

এরই মধ্যে একদিন সকালবেলায় চা-জলখাবার খেয়ে আমরা একটি ট্যাক্সি নিয়ে শিলং পিক, এলিফ্যাণ্ট ফল্‌স্, বিডন-বিশপ ফল্‌স্ আর গল্‌ফ-লিঙ্ক্ দেখে নিলাম। আপার শিলঙে—পিকে—ঝরনার চারপাশ জুড়ে রডোড্রেনডন ফুলে লালে লাল হয়ে আছে। দেখে মুগ্ধ হলেন অমূল্যধন।

গল্‌ফ-খেলার উঁচুনিচু বিশাল সে-মাঠটিও তাঁর খুব ভালো লাগল। চড়াই-উৎরাইয়ে ছড়ানো-ছিটোনো প্রান্তরে টিলায় বিশাল এই গল্‌ফ-লিঙ্ক্। শিলঙের বোধকরি শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান। যেন এক সুবিস্তীর্ণ ঘাসের গালিচা বিছিয়ে রেখেছে কেউ। এখানে এলে যে-কেউই ঘাসে একবার খালিপায়ে হেঁটে দেখতে চায়। অনেকক্ষণ বসে রইলাম আমরা ঐ ঘাসের ওপর। দূর পাহাড়ের সরু

আঁকাবাঁকা লালমাটির রাস্তার ঢাল বেয়ে নেমে আসছে পাহাড়ি দিনমজুরের দল। পিঠে কারুর থাপা-বোঝাই কাঠকয়লার বস্তা, কারুর শুকনো কাঠকুটোর বোঝা। এদের লক্ষ্য, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে এগুলো বিক্রি করা। নয়তো বড়ো-বাজারেই চলে যাবে হয়তো। দূরের টিলায় কিছু কিছু মানুষসমান পাথরের চাঁই পোঁতা আছে। কিছু কিছু শোয়ানো। খাসিদের সমাধিচিহ্ন। দাঁড়িয়ে-থাকা পাথরগুলি পুরুষের আর শোয়ানো পাথরগুলি মেয়েদের প্রতীক। পাথরের তলায় তারা ঘুমিয়ে আছে যেন। গল্ফ-ক্লাবের মুখোমুখি, শেষপ্রান্তে টিলার ওপর ঘন পাইনবন! আমরা হেঁটে হেঁটে ঐ বনের কাছে গিয়ে বসলাম। একটানা বুনো ঝিঁঝিঁ ডেকে চলেছে। কী গভীর নির্জন এই পাইনবন! পাইনগাছের গা চেঁছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এক-একটি পাত্র, তার্পিন তেল সংগ্রহের ব্যবস্থা।

সমস্ত সকালবেলাটা, যেন এই নির্জন মায়াবী বনে এসেই থমকে গেছে। পাইনের সাঁইসাঁই হাওয়ায়, ঝলমলে রোদ্দুরে আর আলোছায়ায়, ঝিঁঝিঁদের অর্কেস্ট্রায় আর বন ভেদ ক'রে ঐ রাঙামাটির উধাও রাস্তায়—একাকার একটি চিরস্থির রূপ ধরেছে।

সেদিন সন্ধ্যায়, শাস্ত্রীমশাইয়ের আমন্ত্রণে আমরা লাইমুখরা ভাগাকুলের একটি বাড়িতে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম। বিভাবসু শাস্ত্রী। একসময় জলপাইগুড়ি আনন্দমোহন কলেজে সংস্কৃত পড়াতেন। পরে নেফা'র লিঙ্গুয়িস্ট্ হন। তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে খুশি হলেন অমূল্যধন।

তাঁর ছন্দের মূল সূত্রগুলির কোনো-কোনোটির প্রসঙ্গে কিছু তর্ক হলো। সিলেবল বা অক্ষরের প্রকৃত স্বরূপ কী। শুধুই ধ্বনি? যদি তাই হয়, তবে ধ্বনিকেও তো উচ্চারণের লঘুগুরুভেদেই বিচার্য। বাংলাভাষার উচ্চারণ আদর্শে এই লঘুগুরু হ্রস্বদীর্ঘ তো নিয়মিতও নয়। তাহলে? সেক্ষেত্রে স্বরান্ত-হলন্ত-যৌগিক অক্ষরের বিভাজনই কি যথেষ্ট? এবং কোনো ধ্বনির একমাত্রা আর কোনো ধ্বনির দুইমাত্রা ধার্য-করা ব্যাপারটা কি লজিকাল না হাইপোথেটিকাল? —এইসব তর্ক।

অমূল্যধন এসব প্রসঙ্গ নিয়ে বিশদ আলোচনা করলেন।

শাস্ত্রীমশাই মৃদুমন্দ হেসে, যেন পুরোনো বিদ্যেটা ঝালিয়ে নিচ্ছেন—এমনি-এক আত্মতৃপ্তিতে বললেন, 'আগে কহো আর!' অর্থাৎ আরো শুনতে চান।

ছান্দসিক তখন আমাদের ভাষার ধ্বনি উদ্ভাবনার ক্ষেত্র ধরেই—বিশেষত তার উচ্চারণ আদর্শ ও ধ্বনিতত্ত্ব-বিষয়েই অনেক কথা বলেন।

কথাবার্তায় বেশ রাত হয়ে গেলো। অমূল্যধন শাস্ত্রীমশাইয়ের সংগ্রহে কিছু নেফার উপজাতিদের গানের টেক্স্ট্ দেখতে চেয়েছিলেন। একদিন রেডিয়ো স্টেশনে সে-গান শোনার সুযোগও ক'রে দিয়েছিলেন শাস্ত্রীমশাই। তার মুদ্রিত টেক্স্ট্ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। পার্বত্য উপজাতিদের নাচগানের শৈলীতে চারমাত্রার তালবিভাগের সুনিশ্চিত লক্ষণ অমূল্যধনকে এসম্পর্কে আরো গবেষণা ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলো। যদিও পরে—তিনি এ-বিষয়ে কিছু আর লিখেছিলেন কিনা জানিনা।

বাড়ি এসে শুনি, আগামী কাল দুপুরে অমূল্যধন ও আমার এক মধ্যাহ্ন-ভোজনের নেমন্তন্ন হয়েছে। কোথায়? না অমূল্যধনেরই এক ছাত্রীর বাড়িতে। তাঁর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির ছাত্রী। শিলঙের ডাক্তার আই. বি. রায়ের কন্যা। মনে আছে, শিলঙে পৌঁছেই কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁর এই ছাত্রীটির কথা আমাদের বলেছিলেন। ছাত্রীর নামটি আমার ঠিক মনে পড়ছে না। ইন্দ্রাণী নয় তো?

পরদিন দুপুরে, মেয়েটি এসে গাড়ি ক'রে আমাদের তাদের লাইমুখরার বাড়িতে নিয়ে গেলো। প্রচণ্ড ভূরিভোজনের আয়োজন। এবং সেখানেও অবধারিত সেই ইলিশ। একে মাস্টারমশাই, তায় এমন সম্মানীয় অতিথি, কতো যে আদরযত্ন ক'রে মিসেস রায় খাওয়ালেন তাঁকে। ইলিশমাছের টুকরো একের পর এক এসে পড়ছে তাঁর পাতে। সঙ্গে আমিও রীতিমতো বিপন্ন। প্রমাদ গনলাম। অস্ফুট ইশারায় তাঁকে বলি, 'খুবই তৈলাক্ত মাছ, আর খাওয়া ঠিক হবে না।'

'বলছো?' লজ্জিত হয়ে বল্লেন তিনি।

মিসেস রায় শুনে ফেলেন। বলেন, 'কিছু হবেনা মাস্টারমশাই, আর-এক পিস্—'

অমূল্যধন আমাকে আশ্বাস দেন তাঁর জহরকোটের পকেটটি দেখিয়ে: 'সঙ্গে হজমের ওষুধ আছে। চিন্তা ক'রো না।'

হেসে, ডাক্তার রায়ও ভরসা দেন, 'আর আমি তো আছি-ই প্রোফেসর

মুখার্জি! কোনো ভয় নেই।'

মাস্টারমশাইকে তাঁদের বাড়িতে পেয়ে ও তাঁকে আপ্যায়িত করতে পেরে, ছাত্রী ও তার বাবা-মা সকলেই খুব খুশি। খাওয়াদাওয়ার পর তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। আজ আবার সন্ধ্যেয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অমূল্যধনের বক্তৃতারও ব্যবস্থা হয়েছে।

ডাক্তার রায়ের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে-আসার আগে ঠিক হয়, কাল আমরা চেরাপুঞ্জি যাবো। ডাক্তার রায়েরই গাড়িতে।

ডাক্তার বলেন, 'আপনার ছাত্রীর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। নয়তো সে নিশ্চয়ই সঙ্গে যেতো।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ভরসা পান: 'প্রোফেসর রক্ষিত আছেন, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। ঘুরে আসুন। কাল সকালে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।'

পুলিনবিহারী দেব রোডের ওপর শিলং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব বাড়ি। তারই অডিটোরিয়ামে অন্তত দুশো-আড়াইশো লোক অনায়াসেই বসতে পারে। বক্তৃতা-উপলক্ষে অবশ্য নির্বাচিত কিছু শ্রোতাই এসেছে। হল্ প্রায় ফাঁকা। পরিষদের সম্পাদক বিজয় ভট্টাচার্য ছান্দসিককে স্বাগত জানালেন। সভাপতি ও সহ-সভানেত্রী, যথাক্রমে অধ্যাপক সত্যেন্দ্র মজুমদার ও অধ্যাপিকা শোভনা গুপ্তা—সকলেই সমবেতভাবে অমূল্যধনকে সংবর্ধনা জানালেন। ঘরোয়া অন্তরঙ্গ পরিবেশে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো পরিষদের প্রবীণ সদস্য সুনির্মল দত্ত ও বিভুভূষণ চৌধুরীর। তরুণ সদস্যদের মধ্যে রাখাল ভট্টাচার্য, বেণু গোস্বামী, মুকুল ভট্টাচার্য ও আরো অনেকের সঙ্গেই। তাঁর বক্তৃতার আগে, স্যার-সম্পর্কে আমি কিছু বললাম। এরপর অমূল্যধন বলতে উঠলেন। টানা একঘণ্টা বললেন। নির্বাচিত শ্রোতাদের সকলেরই ভালো লাগলো তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ ও ছন্দবিষয়ক তর্কবিতর্কের প্রসঙ্গ। অবশ্য তাঁর বক্তৃতায়—তিনি যে-কথাটির ওপর জোর দিলেন, তা হলো, আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছন্দ-সম্পর্কে উদাসীনতা। ছন্দশাস্ত্রের চর্চা ও পঠনপাঠনে—যদিও বা বি. এ. ক্লাসে নামমাত্র ছন্দ ছাত্ররা পড়ে, তবু এম. এ.-তে তা পড়ানো হয় না। অন্তত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় না। অমূল্যধন বলেন, কেউ বলতে পারেন, সাহিত্যের রসসম্ভোগে রসতত্ত্বের কচকচিই কেন জরুরি হবে। জরুরি নয় হয়তো।

কিন্তু বিদ্যাচর্চায় তত্ত্বজিজ্ঞাসুর উদয় না হ'লে, জ্ঞানের ক্ষেত্র যেমন সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি ভাবের ক্ষেত্রও। আর সেক্ষেত্রে, সাহিত্যরসবোধেও আমাদের দেউলে হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকেই। সাহিত্য যে ভাষাকাঠামোর আশ্রয়ে বাঁচে আর বিকশিত হয়, ছন্দ তো প্রকৃত অর্থে তারই শ্বাসপ্রশ্বাস। প্রাণলক্ষণ। জাতির সাহিত্যসাধনায় সেজন্য ভাষাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দশাস্ত্রানুশীলনেরও প্রয়োজন। আর তাই, নামমাত্র বাংলাছন্দের ব্যাকরণটুকুই নয়, তার ইতিহাসেরও পঠনপাঠন প্রচলিত হওয়া উচিত। ছন্দশাস্ত্রের প্রকৃত অনুশীলন ছাড়া আমাদের উচ্চারণ নিখুঁত হবে না। আর উচ্চারণ নিখুঁত না হ'লে, জাতির তাবৎ সাহিত্যসংস্কৃতি-সাধনার সকল সম্বোধনই ব্যর্থ হবে।

সভা ভাঙার পর পরিষদের লাইব্রেরিতে ব'সে চা খেতে-খেতে অমূল্যধন অধ্যাপিকা শোভনা গুপ্তাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রে বসলেন, 'আপনিই কি রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা সেই "শোভনা দেবী"—যার উল্লেখ আছে "পূরবী"র "শিলঙের চিঠি'তে ?"

খুবই লজ্জিত আর বিব্রত বোধ করলেন শোভনাদি। প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি কী একটা বললেন। ঠিক শুনতে পেলুম না। বুঝেছি, 'শিলঙের চিঠি'র 'শোভনা দেবী'র সঙ্গে এই শোভনা'র তিনি একটা আনুমানিক সাদৃশ্য হয়তো ভেবে নিয়েছেন। কিন্তু সে-ধারণা ঠিক নয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছোট্টো লাইব্রেরিটি তিনি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। অসমীয়া ও খাসি ভাষার স্বতন্ত্র কিছু সাহিত্যসংগ্রহ তিনি এই লাইব্রেরিতে প্রত্যাশা করেছিলেন।

পরিষদ তাঁর খুব ভালো লেগেছিলো। তাই আরো একদিন সন্ধ্যেয় বেড়াতে বেড়াতে আমরা এখানে চ'লে আসি। তখন হঠাৎই দেখা হয়ে যায় তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্র বিখ্যাত নাট্যশিল্পী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের সঙ্গে। রুদ্র তাঁর নান্দীকার-এর দলবলসহ শিলং এসেছিলেন তখন। রুদ্র আমার সতীর্থ। পরিষদে স্যারকে দেখে খুবই অবাক হয়ে গেলেন। স্যারকে প্রণাম করলেন রুদ্র। স্যারও খুব খুশি এবং গর্বিত।

•

পরদিন সকালবেলা সাতটার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়েছি চেরাপুঞ্জির

উদ্দেশে। ডাক্তার রায় তাঁর ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে এসেছে তাঁরই এক ছেলে।

যথাসময়ে লাইলস্কটের গেট পেরিয়ে আমাদের গাড়ি চেরাপুঞ্জির পথে ছুটলো। গেট থেকে বাঁ-দিকের রাস্তাটি চলে গেছে ডাউকি-সিলেটের দিকে। চেরাপুঞ্জির পথ তুলনায় খুবই সঙ্কীর্ণ আর আকাবাঁকা উঁচুনিচু বন্ধুর। ওয়ান-ওয়ে। পথের দৃশ্য অতি মনোরম। শিলং-গৌহাটির রাস্তার চেয়ে এ-পথে প্রায়ই গভীর খাদ চোখে পড়েছিলো। দূরের খাড়া পাহাড়ের গায়ে মাঝে-মাঝেই এক-একটা ঝরনাধারার আভাস চোখে পড়ে। খুব স্নিগ্ধ আর উজ্জ্বল সকাল। আকাশ এমন ঘননীল যে আমরা বৃষ্টির দেশে বেড়াতে যাচ্ছি জেনেও তার একটুও মুখভার হয়নি। মাত্র তিরিশ-বত্রিশ মাইলের রাস্তা। দেখতে-দেখতে চ'লে এলাম।

সোজা মুশ্‌মাই ফল্‌সের সামনে এসে গাড়ি থামলো। একেবারে শুকিয়ে আছে ঝরনা। তির-তির ক'রে সরু সুতোর মতো ধারায়—রোদ প'ড়ে যেন একটা মস্ত মাকড়শার জাল চিকচিক করছে! মুশ্‌মাইয়ের গলার হার! বৃষ্টির দেশে বৃষ্টি নেই কতোদিন! লোকেরা বলাবলি করছিলো। প্রচণ্ড খরা চলেছে। অথচ বর্ষা নামলেই কতোদূর থেকে এই নির্ঝরিণীর কল্লোল শোনা যাবে। মুশ্‌মাইয়ের ধারে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে, নিচে সুদূর দক্ষিণে—মেঘের মতো বিলীয়মান এক দেশ যেন দেখা যায়। সমতল বাংলাদেশের মাঠপ্রান্তরের আবছা আভাস। তাই বুঝি এখানের রোদে আমরা একটু তেজ অনুভব করি! রাস্তার ধারের টি-স্টলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই চা খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিলাম আমরা। ড্রাইভারকে বললাম, চেরাপুঞ্জিটা একটা চক্কর লাগাতে। সে হাসলো। বললো, 'চলুন বাজারের দিকে যাই।'

পাহাড়ি এলাকায় দিনের বেলার বাজার প্রায় ঘুমিয়েই থাকে। বেচাকেনা সবই জমে সূর্যাস্তের পর। তখন মশাল জ্বলে। তবু চায়ের দোকান, কিছু মুদিখানা আর সেলুন, ফলমূলের দোকান, এমনকি দু-চারটা শাকসব্জীর দোকানও—খোলাই আছে। রেডিয়োর দোকানে হিন্দী গান বাজছে গাঁক-গাঁক শব্দে। লোকজনও নিতান্ত কম নয়। বাজার এলাকার সরগরম ভাব স্পষ্টই বোঝা যায়।

ড্রাইভার আমাদের বাজার থেকে নিয়ে এলো অপেক্ষাকৃত একটি নির্জন

জায়গায়। বললো, এইখানে একসময় রোপ্-ওয়ে চালু ছিলো। বাংলাদেশের ভোলাগঞ্জ আর এই চেরাপুঞ্জির মধ্যে কয়লা, চুনাপাথর, সুপুরি, চা, এইসব মালপত্তরের লেনদেন চলতো। ড্রাইভারেরই কথামতো চেরাপুঞ্জির সিমেণ্ট ফ্যাক্টরিটাও দেখতে হলো। ভালো লাগছিলো না। অমূল্যধনও যেন বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। হয়তো তিনি প্রত্যাশা করছিলেন চেরাপুঞ্জির সেই বিখ্যাত বৃষ্টিপাত। 'চেরাপুঞ্জি থেকে—/ একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি সাহারার বুকে!' তা, কবি-কথিত ধারদেনার সম্পর্কেও কিন্তু আকাশ এমনি নির্মেঘে নীল হয়ে আছে যে সে-বর্ষণের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ফের মুশমাই ফল্‌সের কাছেই ফিরে এলাম। একটু ছায়া খুঁজে, হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে আমরা দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। খাবার সঙ্গেই এনেছিলাম। এরপর ড্রাইভার আমাদের একটি গুহার সম্মুখে নিয়ে এলো। কিন্তু সকলেই আমরা ক্লান্ত। অমূল্যধনও গুহার ভিতরে ঢুকতে চাইলেন না। শুধু গুহামুখটিই একঝলক দেখে ফিরে আসা হলো। শেষে, যাওয়া হলো রামকৃষ্ণ মিশনে। মিশন থেকে তিনি কমলা-মধু কিনলেন। সবাই বলে, চেরাপুঞ্জির কমলার বন তো পর্যাপ্ত, আর সে-কমলা মিষ্টিও। সেই কমলাফুলে এসে বসে মৌমাছিরা। তাই কমলা-মধু। মিশন কম্প্যাউণ্ডটি একটি টিলার ওপর। স্কুল, বোর্ডিং-হাউস আর খেলার মাঠ-পরিবৃত আশ্রমটি বেশ সুন্দর।

স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করলেন অমূল্যধন। সৌজন্যমূলক সামান্য কথাবার্তার পর আমরা স্বামিজীকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম।

শিলং-ফেরার পথে, ভরা বিকেলের আকাশে—কী আশ্চর্য, চেরাপুঞ্জির যূথবদ্ধ মেঘদল যেন আমাদেরই সঙ্গে ধেয়ে আসতে লাগলো শিলঙের দিক লক্ষ্য ক'রে। শিলংগেটে এসে দেখি, মেঘে মেঘে কালো হয়ে উঠেছে আকাশ। ফগে ঢেকে গেছে দশহাত দূরেরও রাস্তা আর পাইনবন। লাবানে 'আনন্দভবন'-এ এসে পৌঁছতে-পৌঁছতে তোড়ে বৃষ্টি নেমে এলো।

'যাক, শেষমেষ চেরাপুঞ্জি-থেকে তোমার জন্য কিছু বৃষ্টি নিয়ে আসতে পেরেছি অশোকা!' অমূল্যধন খুবই কৌতুকভরে কথাটা বললেন আমাদের বসবার ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে।

অমূল্যধন শিলঙে আসবার পর এই প্রথম বৃষ্টি। মনসুন এসে গেলো বোধ

হয়। ঝোড়োহাওয়া আর বিদ্যুচ্চমকে অবিশ্রান্ত সে-বর্ষণের সন্ধ্যায় কাচের জানলা থেকে পর্দা সরিয়ে, চুপচাপ ব'সে আছি আমরা। বড়োরাস্তার ড্রেন বেয়ে তোড়ে ঘোলা জলের ধারা অবিরল নিচে নেমে যাচ্ছে। রাস্তা একদম ফাঁকা। আজ আর কেউ আসবেনা আমাদের এই সান্ধ্য আড্ডায়। আমি ও আমার স্ত্রী ব'সে আছি তাঁর কাছে। আমাদের চারবছরের শিশুপুত্র টুটুল তার খেলনার ঝুড়ি নিয়ে আপনমনে বসে-বসে বানাচ্ছে রেলগাড়ি। ঝুড়ির-ই নানারকমের খেলনাপাতি সারবন্দী সাজিয়ে। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে, লম্বা শোবার ঘরের কাঠের মেঝের ওপর দৌড়ঝাঁপ লাগিয়ে আমাদের এই চুপচাপ বসে-থাকার অবকাশটিকেও একটু-আধটু টলিয়ে দিচ্ছে সে।

হঠাৎই এক প্রকাণ্ড ছাতা মাথায় আমাদের নিত্যদিনের সান্ধ্য-অতিথি, প্রতিবেশী বন্ধু মুকুল ভট্টাচার্য এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখের ভিতর দু'গালে দু'খিলি জদাপান! অমূল্যধন তাঁকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'আমিও তাই ভাবছিলুম, মুকুলবাবুর কী হলো? এসো এসো!'

অশোকা উঠে গিয়ে আর-এক দফা চা আর বাদলাদিনের উপযুক্ত কিছু গরমগরম 'টা'-নিয়ে এসে বসলো। একটা গরম আলুর চপে কামড় দিয়ে অমূল্যধন গায়ের চাদরটা বেশ মুড়িসুড়ি দিয়ে বসলেন।

'বুঝলে অশোকা, আজ দুপুরের সেই শুকনো চেরাপুঞ্জি আর এই সন্ধ্যের সিক্ত শিলং—' মৃদুমন্দ হাসছিলেন তিনি, 'আর এখন তোমার হাতের এই গরম-গরম চপ, খুব মনে থাকবে।'

'আমরাও কি কখনো ভুলবো'—অশোকা বিনম্র কৃতজ্ঞতায় অভিভূত কণ্ঠে ব'লে উঠলো, 'আপনার এই সঙ্গ। এতো বড়ো মানুষ আপনি—' তাকে থামিয়ে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন তিনি: 'বড়ো মানুষ! বেশ বলেছো!...' একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন যেন। নড়েচড়ে বসলেন তাঁর ইজিচেয়ারে। 'তা, বড়ো-মানুষ হওয়া আর হলো না। তাতে দুঃখ কী। অনেক বড়ো মানুষের সংসর্গ-সান্নিধ্য পেয়েছি তো জীবনে!'

মুকুলবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ—'

'হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ তো বটেই। তা ছাড়া, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়...আরও কতো। আর আমার বন্ধুরা—' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাঁদের অনেকের কথাই তোমরা জানো: 'উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ মুখোপাধ্যায়…তোমাদের বাংলার অধ্যাপক তারাপদ নয় কিন্তু, এইরকম আরো কতো নাম—'

আমি বলি, 'সুবোধচন্দ্র আমার এম. এ. ক্লাসের (১৯৫৮—৬০) মাস্টারমশাই। তাঁর কাছে কাব্যতত্ত্ব আর সমালোচনাশাস্ত্রের পাঠ নিয়েছি। কী ভয়ই পেতাম ওঁকে!'

'তা এঁরা হলেন প্রকৃতই সেই বড়ো মাপের মানুষ। আর আমি লিলিপুট অমূল্যধন! তোমাদের বিবেচনায়, বড়োজোর "বাংলা ছন্দের মূলসূত্র"-এর পুস্তক-প্রণেতা!'

আমি ঘোর আপত্তি জানিয়ে বলি, 'বাঃ, তা কেন। আপনার "কবিগুরু", "আধুনিক সাহিত্যজিজ্ঞাসা"—এইসব বই তো আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের মৌলিক অবদান। গিরিশচন্দ্রের নাটক, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান নিয়ে প্রবন্ধ বা সাম্প্রতিক সংস্কৃত ছন্দের তুলনামূলক পদ্ধতির গবেষণা, বিশেষ ক'রে সংস্কৃত ছন্দ নিয়ে যে-ধরনের কাজে হাত দিয়েছেন তা কি এদেশে pioneering contribution নয়?'

'সে তুমি বললে কি হবে!'

'না না, অনেকেই বলবেন। দেখবেন সুনীতিবাবুও বলছেন।' আমি সবিনয়ে বলি।

'হ্যাঁ, সুনীতিবাবু আমার বড়ো ছেলে অরুণকে দেখা হলেই বলেন, সংস্কৃত ছন্দ নিয়ে যে-কাজটা করছি—তা যেন তাড়াতাড়ি শেষ করি। ওঁর এমন আগ্রহে সত্যিই প্রেরণা পাই।' অমূল্যধন চুপ ক'রে গেলেন! বুঝলাম কিছু-একটা গভীরভাবে ভাবছেন। তারপর হঠাৎই জেগে উঠলেন যেন। বললেন, 'আজকাল প্রায়ই তাঁর কাছে যাই। কতো যে জানেন! খুব enlightened-হয়ে ফিরে আসি।'

খুব ভয়ে-ভয়ে একটি কথা তাঁকে বলবার জন্য উসখুস করি। শেষে ব'লেও ফেলি, 'আচ্ছা স্যার,—'

তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসু চোখে তাকান।

সবিনয়ে বলি, 'ছন্দ-নিয়ে প্রবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে আপনার যে মতভেদ তা তো জানি, কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'আমাদের বাংলা ছন্দের কি একটা সর্ববাদীসম্মত পরিভাষা তৈরি-হতে পারে না?' প্রায় একনিশ্বাসে কথাটা ব'লে ফেলি।

শুনে চুপ ক'রে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'তা আর আমাদের জীবদ্দশায় হবে কি?' খুবই বিষণ্ণ আর অস্ফুট শোনালো সেই কণ্ঠ। 'আমাদের পর তোমরা চেষ্টা ক'রে দেখো।'

ভাবি, আমি তো তাঁর এক অযোগ্য ছাত্র। আজ তিনিও নেই, প্রবোধচন্দ্রও নেই। তাঁদের জ্ঞানী-গুণী উত্তরসাধকেরাই বা কী করছেন তা-ও এতোদূরে ব'সে সবসময় টের পাই না। তবু, প্রিয়জনের স্মৃতির ঐশ্বর্য মনেই থাকে। তা নিয়ে, কখনো-সখনো নাড়াচাড়া ক'রে অদ্ভুত এক আনন্দ হয়। মনে আছে অমূল্যধন এখান থেকে যাওয়ার আগের দিন, পুলিশবাজারের কোনো-এক এম্পোরিয়াম থেকে সুন্দর-সুন্দর কিছু নাগা-চাদর কিনলেন। বাড়িতে এসে অশোকাকে দেখতে দিলেন সে-সব। অশোকা বললো, 'খুব ভালো হয়েছে। শীতের গায়ের চাদর হিসেবেও এগুলো বেশ ভালো।'

এবং অশোকাকে চমকে দিয়ে, অতর্কিতে, ওরই ভিতর থেকে একটি চাদর তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে অমূল্যধন হাসতে লাগলেন : 'ত্যাখো তো কেমন হয়েছে!'

তাঁর সেই স্নেহোপহারটি অনেকদিন যত্ন ক'রে অশোকা রেখেছিলো।

শিলঙের স্টুডিয়োতে-গিয়ে-তোলা এক গ্রুপ-ফোটোগ্রাফ, তা দেখে আজও মনে হয়, এইতো সেদিন এসেছিলেন তিনি! আর ফিরে গিয়ে, আমাদের লিখেছিলেন, 'শিলং হইতে এখানে আসিয়া অত্যন্ত গরম বোধ হইতেছে এবং অস্বস্তিও অনুভব করিতেছি। দশ দিনেই কি খানিকটা "পাহাড়িয়া" হইয়া গিয়াছি?'

তাঁর এইটুকু আনন্দের কিছুক্ষণ সঙ্গী হতে পেরেছিলাম একদিন, তা ভেবে গর্ববোধ হয়। ১৯৬৬ সালে, একদিন অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের চিঠি-হাতে ভয়ে-ভয়ে তাঁর কাছে যাই ছন্দ নিয়ে কাজ করবো ব'লে। তা, তিনি সেদিন সস্নেহে আমাকে গ্রহণ না করলে, সে-কাজ কখনো কি ক'রে উঠতে পারতাম! যতীন্দ্রমোহনের সস্নেহ তাগাদা আর অমূল্যধনের নিত্যপ্রেরণা ছাড়া?

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে একটি কথা। ১৯৬৯ সালে আমার অসমীয়া ছন্দ-বিষয়ক একটা লেখাসূত্রে প্রবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। তিনি

জানতেন, আমি অমূল্যধনের অধীনে কাজ করছি। তবু প্রবোধচন্দ্র আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। একবার উনি আমাকে শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠালেন। স্ত্রীপুত্র নিয়ে গেস্টহাউসে গিয়ে উঠলাম। মনে আছে, খুব ভোরবেলা প্রবোধচন্দ্র স্বয়ং গেস্টহাউসে এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে মালপত্রসহ প্রায় জোর ক'রে আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। যে দু'দিন তাঁর ওখানে ছিলাম, প্রায় সবসময়ই ছন্দ-প্রসঙ্গে কতো কথাই যে আমাকে বললেন! অমূল্যধন-সম্পর্কেও তাঁর সশ্রদ্ধ উক্তি আমাকে বিস্মিত করেছে। পরেও কতোবার গেছি তাঁর কাছে। কিন্তু কখনোই বাংলা ভাষাসাহিত্যের এই দুই প্রধান ছান্দসিকের মতবিরোধের তিক্তবিরক্ত কোনো মানস-প্রতিক্রিয়া—না-প্রবোধচন্দ্র, না-অমূল্যধন—কারো মধ্যেই তেমন উগ্ররূপে দেখিনি।

একবার মাসিমাকে (প্রবোধচন্দ্রের স্ত্রী) একান্তে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'অমূল্যধনের সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের তো অনেকবারই দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, শান্তিনিকেতনেও আপনাদের বাড়িতে এসেছেন তিনি। তা, ওঁদের দেখা হলে, ওঁরা ছন্দ নিয়ে তর্কবিতর্কে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠতেন নিশ্চয় ?'

মাসিমা হাসলেন। বললেন, 'ওঁদের পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার ধরন দেখে তো আমার মনে হয়েছে—ওঁরা কতোকালের চেনা দুই বন্ধু। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা ব'লে যাচ্ছেন। কেউ কম যান না। কিন্তু—'

'কিন্তু ?' আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠি।

মুচকি হেসে মাসিমা বলেন, 'কিন্তু ছন্দ-সম্পর্কে একটি কথাও না।'

শিক্ষাগুরু অমূল্যধন

শোভনলাল মুখোপাধ্যায়

কখনও কোন অলস মুহূর্তে মনের জানালা নিজে থেকেই খুলে যায়। সেই খোলা জানালায় তখন স্মৃতির পর স্মৃতির নানারঙা খোলামেলা মিছিল সারিবদ্ধভাবে চলতে থাকে। ভাদ্র-আশ্বিনের মেঘ ও রোদের লুকোচুরি দেখতে দেখতে সপ্তরং রামধনুর মত তখন আন্‌মনা হয়ে যাই যেন। মানুষের মগজকে বলা হয় বিধাতার তৈরী সর্বশ্রেষ্ঠ কম্পিউটার। কিন্তু এহেন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রও বুঝি-বা ব্যর্থ হয় স্মৃতির পিঠে স্মৃতির, মিছিলের পর মিছিলের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার ধারা-বিবরণীর আদি-অন্ত সাম্‌লাতে।

ইতালীয় সমাজতন্ত্রী রাজনীতিবিদ্ আন্তনিও গ্রাম্‌স্‌চি দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে স্বৈরতন্ত্রী মুসোলিনির ইস্পাতদৃঢ় নির্দেশে যখন রাজবন্দী ছিলেন, তখন তাঁর লিখিত দিনপঞ্জীর এক পাতায় মন্তব্য করেন—পরিস্থিতিই ঘটনাকে বিপ্লবমুখী করে তোলে। অন্য কোথাও গ্রাম্‌স্‌চির এই বক্তব্য পরীক্ষিত হয়েছিল কিনা—জানি না। এটুকু শুধু বলতে পারি যে অন্ততঃ আমাদের কারো কারো ছাত্রজীবনে এক-একটা ঘটনা এমন-এমন পরিস্থিতি তৈরী করে দিচ্ছিল যখন তারা পৃথক পৃথক হয়ে এবং সামগ্রিকভাবে একের পর এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ আলোড়নগুলিকে যে-কোন অর্থেই বিপ্লবমুখী বলে ধরে নেওয়া যায়। কেননা এ আলোড়নগুলির প্রতিফল কোন কোন বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ার চেয়ে কম তীব্র বা কম ব্যাপক ছিল না। দক্ষিণ কলিকাতার আশুতোষ কলেজে ১৯৪৬ সালে "অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের" বি. এ. অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ঐ মহাবিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের মত অদ্বিতীয় শিক্ষাগুরুর সান্নিধ্যলাভ আমার ও আমার যুগের অনেক ছাত্রের জীবনে এমনই একটি বৈপ্লবিক ঘটনা।

ঐ সময়টা ছিল অবিভক্ত বাংলার, তথা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে বিশেষভাবে ঘটনাবহুল। সংশয়, শঙ্কা ও সংঘাতের মধ্যে নানা উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে কৈশোরের দ্বারপ্রান্ত থেকে যৌবনের আঙ্গিনায় আমরা কখন যে উপনীত হয়েছি, সে সম্বন্ধে ততটা চেতন হইনি তখনও। সে আমলের

ব্যক্তিগত আবেগ ও সংবেদনার বাইরে থেকে বর্তমানে সে সময়ের অবস্থার বিশ্লেষণ মহাকালের অনিবার্য ব্যবধানের জন্য বেশ খানিকটা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠেই।

১৯৪৬ সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররূপে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐ কলেজেই "অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের" বি. এ. অনার্স ক্লাসে সবে ভর্তি হয়েছি। জুন মাস নাগাদ ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও ব্রিটিশ শ্রমিক দলের নেতা অ্যাট্‌লি তাঁর মন্ত্রিসভার তিনজন প্রবীণ সদস্যকে ভারতের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটির সুমীমাংসার উদ্দেশ্যে ভারতে পাঠান। এঁরা হলেন—স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্, লর্ড পেথিক লরেন্স ও এ. ভি. আলেকজাণ্ডার। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের রোমাঞ্চকর ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা জানেন কেন মন্ত্রি-মিশনের প্রস্তাবগুলি ভারতের বিভিন্ন গণ্যমান্য রাজনৈতিক নেতাগণ তখন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। কেউ-বা প্রস্তাবগুলিতে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত পাকিস্তানের দাবির সমর্থন পাননি, কেউ-বা প্রস্তাবগুলির মাঝে কৌশলে ও প্রচ্ছন্নভাবে পাকিস্তান গঠনের স্বীকৃতি খুঁজে পেলেন, অথবা কেউ প্রস্তাবগুলির মধ্যে তাঁদের অখণ্ড ভারতের জন্য মহামূল্য কোন রক্ষাকবচ প্রদানের প্রতিশ্রুতির অভাব বোধ করলেন। মোট কথা, একটা নিঃসীম শূন্যতা ও নিশ্ছিদ্র হতাশা সবাইকে পেয়ে বসেছিল। গান্ধীজী পরের বছর পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে তাঁর অহিংস পদযাত্রার আগে আমাদের কাছে বেলেঘাটা আশ্রমে খোলামেলাভাবে স্বীকার করেছিলেন যে, এই সময়ের হতাশা যেন তাঁর বিয়াল্লিশের "ভারত ছাড়ো" ডাক দেবার পূর্বমুহূর্তের নৈরাশ্যকেও ছাপিয়ে উঠেছিল।

ছেচল্লিশের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হলুম। ক্লাস শুরু হতে হতে আগস্টের মাঝামাঝি। কলিকাতায় তখন চাপা উত্তেজনা—কি হয় কি হয়। ১৬ই আগস্ট মুস্‌লিম্ লীগের সর্বপ্রধান নেতা জিন্না সাহেব কলিকাতায় ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় হুঙ্কার দিলেন: "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"। তিনি ভারতীয় মুসলমানদের "প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ দিবস" (Direct Action Day) পালনের জন্য আহ্বান জানালেন। ফলে সেদিন বিকেল থেকেই কলিকাতায় দেখা দিল কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। তাণ্ডব-লীলা ৫।৬ দিন পর্যন্ত চলেছিল। কারো কারো অভিযোগ—বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও মুস্‌লিম্ লীগ নেতা সুরাবর্দী সাহেব যদি তখন শক্তহাতে প্রশা-

সনকে ব্যবহার করতেন, তাহলে এই মর্মান্তিক লোকক্ষয়, অর্থহানি ও চরম অশান্তি দেখা দিত না।

সমস্ত স্কুল কলেজ ছুটি হয়ে গেল। কবে আবার প্রেসিডেন্সী কলেজে ক্লাস করতে যেতে পারব ভাবতে ভাবতে পুজোর ছুটি এসে গেল। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজে আর যাওয়া হল না। ছুটির মধ্যেই লক্ষ্মীপুজোর রাতে নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রবল আকারে দেখা দিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে আমাদের সহপাঠীদের অনেকেই ঐ কলেজের পার্শ্ববর্তী উত্তেজনাপ্রবণ এলাকাকে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয় এলাকার মতই ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কেউ কেউ বদলী ভর্তির আবেদন নিয়ে চলে এলো সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে। আমার মত কেউ কেউ পুজোর ছুটির পর দু'চারদিন প্রেসিডেন্সীতে 'ক্লাস ক্লাস' খেলার পালা শেষ করে প্রেসিডেন্সী ছেড়ে বাড়ির কাছাকাছি চলে এলুম—আশুতোষ কলেজে।

তখন আশুতোষ কলেজে বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকগণ প্রত্যেকেই স্বীয় মহিমায় বিভূষিত ও অশেষ বৈদগ্ধ্যবৈভবের কাণ্ডারী ছিলেন। যাঁরা স্বনামধন্য আচার্য, তাঁরা হলেন—ইংরাজী বিভাগে সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়; বাংলা বিভাগে অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়; অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ সেন, অম্লান দত্ত এবং মণি সান্যাল। অবশ্যই অন্যান্য অধ্যাপকগণেরও গুণাবলী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এ কথা বলছি। দেখা যেত আশুতোষ কলেজের তখনকার বরেণ্য অধ্যাপকদের মধ্যে "মুখোপাধ্যায়"দেরই যেন একাধিপত্য ছিল। অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতার অধিকারী অমিয়রতনের অকালমৃত্যু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার ক্ষেত্রে বিরাট একটা ক্ষতি বলে মনে করি। সত্যেনবাবু পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেন। সোমেশ্বরবাবু ছিলেন উপাধ্যক্ষ, উপরন্তু কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলার। তাই ব্যস্ততার দরুন ক্লাস কম নিলেও তিনি আমাদের আবিষ্ট করে রাখতেন। শেক্সপীয়রের নাটকগুলি আদ্যন্ত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। উদারপন্থী অম্লান দত্ত শুধু অর্থনীতিবিদ্ ও প্রাক্তন উপাচার্যরূপে আজ স্বীকৃত নন—তীক্ষ্ণ, যুক্তিনিষ্ঠ বক্তা হিসাবেও তিনি সম্মানিত। মানবধর্মী সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর স্বভাষ প্রবন্ধগুলির আবেদন চিরন্তন। অনর্গল সুশ্রাব্য ইংরাজী বক্তৃতা মোহিনীবাবুকে নীরস প্রবন্ধের ও গুরুগম্ভীর বাইবেল ক্লাসেও বিশিষ্ট করে রাখত। ফণিবাবু

মিল্টন্ ও ড্রাইডেন্ পড়াতেন। ধ্রুপদী কাব্যসাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল সুবিদিত।

কিন্তু এহেন মাস্টারমশাইদের কথা এভাবে স্মৃতিপটে তুলে ধরতে গিয়ে একটা কথা কিন্তু বার বার মনে পড়ে—এঁদের মধ্যে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের ছবিটি যেন চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। এর অনেকগুলি কারণ আছে। একটি প্রধান কারণ হল—তিনি একাধারে ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেই মৌলিক ধ্যানধারণার জন্য যশস্বী ছিলেন। তাঁকে ও অধ্যাপক প্রবোধ-চন্দ্র সেনকে বাংলা ছন্দের গবেষণাক্ষেত্রে পথিকৃৎ বলা হয়। তাঁর সুবিখ্যাত "বাংলা ছন্দের মূলসূত্র" বইটির জন্য তিনি "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেল পুরস্কার" প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ গবেষণাবৃত্তি লাভ করেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় আমাদের রোমান্টিক যুগের ইংরাজী কাব্য পড়াতেন—কোল্‌রিজ্, ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ্, শেলী, কীট্‌স্, বায়রন, ব্রাউনিং ও টেনিসনের কাব্য। প্রত্যেকটি ইংরাজী কবিতার ছন্দ ও অলঙ্কার ব্যাখ্যা করে তিনি পাশাপাশি বাংলা, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্যের ছন্দ ও অলঙ্কারের মধ্যে সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্যের দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আমাদের মোহিত করে রাখতেন। মনে হয়—বর্তমান যুগে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপকগণ অনেকেই কাব্যসাহিত্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবির মেজাজ, ঝোঁক, "ইজম্" প্রভৃতি বিশ্লেষণ করতে ব্যতিব্যস্ত। অমূল্যধনের কাব্যসাহিত্যিক বিশ্লেষণে এ গুণগুলি ত ছিলই, উপরন্তু ছিল ইংরাজী কবিতার বা গানের আঙ্গিক বা উপাঙ্গিক ব্যাখ্যা, কাব্যের অবয়বের পরিচিতি উদ্‌ঘাটন।

আজকাল পশ্চিমবঙ্গে শেলী, কীট্‌স্, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ্ প্রমুখ কবিদের লেখা না পড়েই, এমনকি তাঁদের নাম না শুনেই যে কেউ বি. এ. পাস করতে পারেন। "কম্পাল্‌সারি অ্যাডিশানাল্" (আবশ্যিক ঐচ্ছিক) নামক সোনার পাথরবাটিতে কাঁঠালের আমসত্ত্বরূপে তাঁদের কাছে ইংরাজী বা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরিবেশন করা হয়। ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্য শিক্ষাক্ষেত্রে এ নীতি পরিবর্তনের জন্য কবে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শুভবুদ্ধি হবে, অথবা আদৌ হবে কিনা, জানি না। কেননা সরকার জোর দিচ্ছেন ছাত্রছাত্রীদের কাজ-চালানো ইংরাজী ভাষা শিক্ষার (Functional English) ওপর। এই শোচনীয় পরিস্থিতির ফলে ছাত্রছাত্রীরা এখন সাহিত্যের স্বর্ণদ্বারের সন্ধান পায় না, ভাষার খিড়কি দরজায় কেবল

ধাক্কা মারে।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ মৈত্র, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, তারকনাথ সেন প্রভৃতির মত অমূল্যধনবাবুও প্রেসিডেন্সীর ইংরাজী বিভাগেরও প্রচণ্ড খ্যাতিমান, কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন। তাই ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষা পঠনপাঠনের ভিত্তিরূপে অভিজাত, রোমান্টিক, উদারপন্থী, মানবধর্মী ঐতিহ্যধারা একই মঙ্গলসূত্রে তাঁদের গ্রথিত করে রেখেছিল। তার সন্ধান করতে ও তার স্পর্শ পেতে ইংরাজী পাস্ ক্লাসের ছাত্র হলেও আমাদের কোনও অসুবিধাই হত না। অমূল্যধন আমাদের শুধু ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যই শেখাননি, তিনি আমাদের প্রত্যেকের সমগ্র মানসিকতা, সমগ্র চরিত্রকে গড়ে পিটে সুদক্ষ কারিগরের মতই এক-একটি ছাঁচে ঢেলে দিয়েছিলেন। আমরা অমূল্যধনকে এভাবেই পেয়েছিলুম, শুধু শিক্ষকরূপে নয়, শিক্ষাগুরুরূপেও। যাঁরা ভারতীয় সনাতন গুরুবাদী পঠনপাঠনপদ্ধতিকে ঐতিহ্যক্লিষ্ট, রক্ষণশীল, ওপর-থেকে-চাপিয়ে-দেওয়া একটা বোঝা বলে সমালোচনা করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আমার যুক্তি একটাই। তা হল এই যে, চিরাচরিত, চিরায়ত এই পদ্ধতিই স্মৃতির আধারে আশ্রিত গুরুমুখী বিদ্যারূপে এদেশে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে এক-একটা ধারা সৃষ্টি করেছে, মহামূল্যবান্ ঐতিহ্যের স্রোত রেখে গেছে। বঙ্গদেশে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য পঠনপাঠনের ক্ষেত্রেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষকদের পথ অনুসরণ করেই প্রফুল্লচন্দ্র-শ্রীকুমার-সুনীতিকুমার-সোমনাথ-সুবোধচন্দ্র-অমূল্যধন-তারকনাথ এই ঐতিহ্য গড়ে দিয়ে গেছেন। আমি ইংরাজীর অধ্যাপক নই। কিন্তু অমূল্যধন অনার্স ও পাসের মিলিত ক্লাসটিতে আমাদের সেই পারমিত ঐতিহ্যের পরমাত্মীয় করে তুলতে পেরেছিলেন, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অমৃতস্বাদের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে দিয়ে আমাদের মনকে একটা উদার, উন্মুক্ত মানবিক মূল্যবোধে ইশিত করে দিতে চেয়েছিলেন। সেই শিক্ষাগুরুর প্রতি সতত প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবো সকৃতজ্ঞচিত্তে।

অমূল্যধনবাবুর সবচেয়ে বড় সুবিধা হয়েছিল দু'দিক থেকে। প্রথমতঃ, তিনি আমাদের পড়াতে এলেন রোমান্টিক্ যুগের ইংরাজী কাব্য। দ্বিতীয়তঃ, তিনি অনার্স ও পাসের সংযুক্ত তাঁর ক্লাসটিতে পেয়েছিলেন আমাদের মতন কিছু কৌতূহলী ছাত্র, যারা ইংরাজী অনার্সের ছাত্র না হলেও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের পাঠনকৌশলে, দরদে ও আন্তরিকতায় ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি গভীর ভাল-

বাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কল্পনাপ্রবণ, সংবেদনশীল যুবকদের রোমান্টিক কবিতার রসাস্বাদনে আকৃষ্ট করার তাঁর নিজস্ব কৌশল অমূল্যধন কিভাবে কাজে লাগাতেন, তাঁর প্রথম কয়েকটা ক্লাস করার পরই তা বোঝা গেল। আসলে স্যার ক্লাসে একটা দারুণ পরিবেশ, একটা romantic atmosphere তৈরী করতেন, ঠিক প্রেসিডেন্সীতে সোমনাথ মৈত্র যা করতেন। অনেক দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। কিছু কিছু বলছি।

কোল্‌রিজের "ক্রিস্টাবেল" পড়াবার পর কবি কেন এই কবিতাটি অসমাপ্ত রাখলেন, তা নিয়ে অমূল্যধন তাঁর বক্তব্য জানালেন। কিন্তু এখানেই তিনি থামেননি। কবিতাটি কিভাবে কোল্‌রিজীয় ঢঙে শেষ করা যেত, তার একটা আভাস তিনি দিলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রসিদ্ধ "টিন্‌টার্ন অ্যাবি" কবিতাটির প্রথম পঙ্‌ক্তিতে "Five years have passed" আবৃত্তি করেই স্যার মিনিটখানেক নিস্তব্ধ রইলেন। কারণ, কবির স্বগতোক্তি অনুযায়ী ঐ পাঁচটি মনোরম গ্রীষ্মকাল পাঁচ-পাঁচটি সুদীর্ঘ শীতকালের মতো কবিকে কি এক প্রচণ্ড অস্বস্তি ও অস্থিরতার মধ্যে ফেলেছিল—এই অভিব্যক্তিই স্যার তাঁর মিনিটখানেকের স্তব্ধতার মধ্যে প্রতীকিত করে দিলেন। ব্রাউনিং-এর "The Last Ride Together" কবিতায় প্রেমিক-প্রেমিকা সম্পর্কের মধ্যে যে নিদারুণ আর্তি ও সংবেদনা ফুটে উঠেছে, "কে জানে, হয়ত কালই জগৎ বিলীয়মান হতে চলেছে", —এজাতীয় উক্তির মধ্যে যে দরদিয়া, মরমিয়া মনের আকুতি প্রকাশিত, তা বুঝে নিতে কোন অসুবিধা হয়নি। "Rabbi Ben Ezra" কবিতায় ব্রাউনিং-এর যে প্রত্যয়ী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত, অমূল্যধন তা আমাদের ভালভাবেই বোঝালেন।

"Ode to Nightingale" এবং "Grecian Urn" এই দুটি "Ode" বা গীতিকবিতায় ধ্রুপদী ও ইন্দ্রিয়বাদী মননশীলতার প্রতি কীট্‌সের পক্ষপাতিত্ব কতটা স্পষ্ট, অমূল্যধন তা আমাদের কাছে ক্লাসিকাল, হেলেনীয় যুগের টুকরো টুকরো ছবি দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন। নাইটিঙ্গেল পাখীর গান শুনতে শুনতে কল্পনাবিলাসী, অতীতাশ্রয়ী কবির ভাবজগতে প্রবেশ এবং কবিতার শেষে রূঢ়, বজ্রকঠিন বাস্তবজগতে কাতর, ব্যথিত কবির প্রত্যাবর্তনের মধ্যে যে পটপরিবর্তন ঘটল, সুরসিক অমূল্যধনের সহানুভূতিপ্রবণ বিশ্লেষণ আমাদের কাছে তাকে একই কবির পরস্পরবিরোধী, অথচ পরস্পরবিধৃত দুটি সচেতনারই স্বাভাবিক

সামগ্রিক রূপায়ণ হিসাবে প্রতিবিম্বিত করল।

শিক্ষাব্রতী অমূল্যধন টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলিতেও বিদ্যার্থীদের কাছে সহজেই একান্ত আপনজন হয়ে উঠতেন। প্রেসিডেন্সীতে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুবোধ সেনগুপ্ত বা তারক সেন বা কবি-অধ্যাপক বিষ্ণু দে ভাবার্থলিখন, প্রবন্ধরচনা বা ভাব-সংক্ষেপের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের ভুলভ্রান্তিগুলি দাগ দিয়ে দিতেন, বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে ছাত্রদের খাতাগুলি ফেরত দিতেন। রাশভারি মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে যেন ছাত্রদের একটু দূরত্ব থেকে যেত। অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় কিন্তু বেশ হাসিখুশী থাকতেন। আমাদের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে এমনভাবে মজা করতেন যে আমরাও নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কথা ভেবে তাঁর সঙ্গে হাসিঠাট্টায় যোগ দিতুম। অমূল্যধনবাবু এই টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলিতে শুধু আমাদের খাতায় দাগ মেরে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, তিনি আমাদের লেখা শব্দ বা বাক্যাংশগুলির ব্যাকরণগত বা বানানগত ভুল কেটে দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ লিখনভঙ্গী বা লিখনশৈলী ও লেখার মান অনুযায়ী ভুলগুলি সংশোধন করে দিতেন। অধ্যাপক সাধনকুমার ঘোষের ধোপদুরস্ত sophisticated ইংরাজী বাক্যবিন্যাসের তুলনা ছিল না। কিন্তু তা ছিল গুটিকয় বিশিষ্ট লেখক-অধ্যাপক, ছাত্রবোদ্ধাদের জন্যই। আমাদের সময়ে প্রচারিত অধ্যাপক রায় ও মুখার্জীর ইংরাজী পাঠ্য নোটবইগুলি চমৎকার হলেও এইরকমভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু অমূল্যধনের দ্বারা সংশোধিত নিজেরই খাতায় যখন নিজের ভুল সংশোধিত আকারে পড়তে হত, তখন মনে হত আমার বক্তব্য আমারই মানের উপযোগী শুদ্ধ আকারে কি অপূর্বভাবে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে! এ যেন আমারই নতুন একটা আত্মপ্রকাশ। এভাবেই স্যার আমাদের নিজ নিজ রচনাশৈলী, শব্দচয়ন ও বাগ্‌বিন্যাসের ওপর যথেষ্টভাবে আস্থাবান্ করে তুলতেন, আমরা যেন আমাদের আত্মপরিচয় নতুন করে দিতে শিখতুম, নিজের কাছে নিজেকে নতুনভাবে চিনতে শিখতুম। "ভাল করে লিখবে", "ভাল করে শিখবে"—আদর্শ শিক্ষক অমূল্যধনের এই মৃদু অনুজ্ঞা, এই স্নিগ্ধ উপদেশ মহান্ শিক্ষাগুরুর মহীয়ান্ ইষ্টমন্ত্রের মতই ছাত্রদের মনোবল বাড়িয়ে দিত।

সবশেষে বলি অনুবাদক অমূল্যধনের কথা। ছাত্রজীবনে আমি ইংরাজীতে বহু কবিতা লিখেছি। কবিতাগুলি আশুতোষ কলেজ পত্রিকা, প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকা, "একতা" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মুখপত্র)

প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সেগুলি বহু রসিক, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছিল। হয়ত সেই কারণেই অমূল্যধন তাঁর এই ছাত্রটিকে অবসর সময়ে ইংরাজী থেকে অনূদিত তাঁর কিছু কিছু কাব্যানুবাদ শুনিয়ে আনন্দ পেতেন। সৌভাগ্যক্রমে অমূল্যধনবাবুর পুত্র, আমার কৃতী প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন সহকর্মী, অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কৃতী অধ্যাপক ডক্টর অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের সহৃদয় সহযোগিতায় সেই কবিতাগুলির মধ্য থেকে তিনটি বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজী কবিতার বাংলা কাব্যানুবাদ এযুগের পাঠকপাঠিকাদের উপহার দিতে পেরে গুরুকৃত্য সম্পাদনের পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করছি। এ তিনটি কবিতা হল—মিণ্টনের "On His Blindness" এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "Lines Composed Upon Westminster Bridge" ও "To the Daisy"। প্রথম দুটি কবিতা সনেট্ (Sonnet) বা চতুর্দশপদী কবিতা।

অনূদিত প্রথম কবিতাদুটিতে মিণ্টনীয় বা পেত্রার্কীয় পঞ্চমাত্রিক ছন্দ (iambic pentametre) সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আট ও ছয় পংক্তির স্তবকে (octave ane sestet) abbacddc efefef অথবা abbaabba cdcdcd এই অন্ত্যমিলের সাহায্যে দুটি কবিতা দুটি স্তবকে সুন্দরভাবে বিভক্ত। "To the Daisy" কবিতার অনুবাদে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহজ, সরল, অকৃত্রিম নিসর্গপ্রীতি বাণীরূপ লাভ করেছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের এমন সুন্দর লিরিকীয়, অর্থাৎ গীতিধর্মী ব্যঞ্জনা সার্থকভাবে অনুবাদেও সুপ্রকাশিত। তুষারধবল ডেইজী ফুলটি বিলিতী বস্তু হলেও তার প্রতি আমাদেরও ভালবাসা চিরদিনের মত জেগে থাকে বৈকি ! আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন যদি বলি এজন্য এক্ষেত্রে কবি ও অনুবাদক উভয়েরই কৃতিত্ব সমান সমান।

John Milton : "On His Blindness"

বিশাল আঁধার বিশ্বে নিভিল আলোক
জীবনের অর্দ্ধপথে, ভাবি যবে মনে,
ব্যর্থ হল নিধি মোর, যারে সঙ্গোপনে
রক্ষিলে মানব শুধু লভে মৃত্যুলোক ;
যদিও পরাণ মম নিয়ত আকুল

সেই নিধি দিয়া সেবা বিভুরে করিতে,
হিসাব নিকাশ মম তাঁরে নিবেদিতে,
পাছে লভি তাঁর কাছে গঞ্জনা বিপুল।
'বঞ্চিয়া আলোক বিভু নিত্য সেবা চান ?'
মূঢ় প্রশ্ন শুনি ধৈর্য্য বুঝাল কহিয়া,
"কর্মে তাঁর সেবা, নাহি চান প্রতিদান—
রাজ্যেশ্বর তিনি, তাঁর আদেশ বহিয়া
জলে স্থলে লক্ষ জনে করিছে প্রয়াণ,
তাঁর সেবা করে কেহ চির প্রতীক্ষিয়া।"

William Wordsworth :
"Lines Composed Upon Westminster Bridge"

ধরণীতে নাহি কিছু সুন্দর এমন :
জড়-প্রাণ সেই জন যেবা চলি যায়
এ হেন মহান্ দৃশ্য উপেক্ষি হেলায় :
এ নগরী অঙ্গে আজ করেছে ধারণ
সুষমা উষার ; নাহি কোন আবরণ
নিঃস্তব্ধ মন্দির পোত প্রাসাদ চূড়ায়,
ঝলকিছে বায়ু মাঝে নির্ধূম প্রভায়,
আকাশ প্রান্তর সাথে নাহি ব্যবধান।
করেনিক কভু রবি প্রথম আভায়
অভিষেক এইভাবে গিরি উপবন ;
হেন শান্তি অনুভব করি নি আত্মায়।
বহিছে তটিনী ধীরে যথা তার মন :
প্রতি গৃহ অচেতন গভীর নিদ্রায় ;
ও বিরাট্ হৃদি আজ সুষুপ্তি-মগন।

William Wordsworth : "To the Daisy"

১

বয়স যখন অল্প ছিল লাগ্‌ত ভাল যেতে
পাহাড় থেকে পাহাড় 'পরে খুশীর ভরে মেতে,
তৃপ্তি তখন ছিল না কো কিন্তু অধীর চিতে,
চঞ্চলতায় পেতাম চরম সুখ ;
আনন্দ মোর সৃষ্টি করি আমিই এখন, ভাই,
সব নদীতে তৃষ্ণা আমার এমনি মেটে তাই,
হৃদয় মাঝে নিসর্গেরই প্রেমের পরশ পাই
যেমনি হেরি মধুর তব মুখ।

২

তোমায় মালা ক'রে শিশির আপন শিরে ধরে
কয়েক গাছা শুভ্র-বরণ বিরল কেশের 'পরে,
বসন্তেরই মৃদুল হাওয়ায় মেঘ চলে যায় সরে
রৌদ্রে তোমার লাগ্‌বে ভাল বলে ;
নিদাঘ ঋতুর প্রান্তরেতে তোমার দখল জানি,
হেমন্ত—যার অন্তরেতে বাজে দুখের বাণী
হয় সে খুসী দেখে তোমার রাঙা আনন খানি
সিনান যখন কর বৃষ্টি জলে।

৩

সবাই মিলে নেচে নেচে কীর্ত্তনিয়ার মত
মাঠের মাঝে পথিকেরে জানাও সুস্বাগত
তোমায় দেখে আনন্দেতে ভরে তাহার চিত ;
কিন্তু মনে পাও না মোটে ভয়,
অবহেলায় ফোটে না কো মনে দুখের রেখা ;
দূর বিদেশের একটি কোণে যখন চলি একা
সুখস্মৃতির মত তুমি দাও যে মোদের দেখা
তারই অভাব যখন বড় হয়।

৪

ফুটুক উঠে চাঁপার কলি গোপন তাহার নীড়ে
পাগল হয়ে মলয় হাওয়া বহুক তারে ঘিরে
গরবিনী গোলাপ পরুক মুক্তামালা শিরে
বৃষ্টি ধোওয়া শিশির ভেজা চুলে ;
নাইক তোমার মনে মোটেই কোনও অভিমান,
সবার কাছে তবু তুমি পাও ত বহু মান
কবির কাছে তোমার আদর নাই কো পরিমাণ
অনেক কারণ আছে, তাহার মূলে।

৫

বৃষ্টিধারার ভয়ে যদি গিরিগুহায় ধাই
বৈশাখেরি উজল দিনে আকাশ তলে, ভাই
রৌদ্রতাপে বন্দী হয়ে বিরাম যদি চাই
অশ্বত্থেরি সবুজপত্র তলে,
ক্লান্ত হয়ে দিনের শেষে অবসাদের ভরে
চতুর্দ্দিকে তাকাই যখন, বন্ধু, চোখে পড়ে
মুখটি তোমার বুকের কাছে। যায় যে দূরে সরে
মনের বিষাদ তোমার পরশ ফলে।

বাঙলা ছন্দের আলোচনায় অমূল্যধন

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলা ছন্দের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার সূত্রপাত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই। এ আলোচনার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হতে হলে প্রথমেই বিজ্ঞাননিষ্ঠ আলোচনার প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। তার মূল বৈশিষ্ট্য হল সংজ্ঞানিরূপণ এবং একক বিচার। সংজ্ঞানিরূপণের তাৎপর্য : সর্বদা একই অর্থে বিশিষ্ট কোন শব্দকে প্রয়োগ করা, আর একক নিরূপণের দ্বারা একটিমাত্র মানদণ্ড ব্যবহার করা। বাঙলা ছন্দের আলোচনায় বিভিন্ন তাত্ত্বিক যেমন এক-একটি শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন, তেমনি ছন্দের পরিমাপ নির্ণয়ে মাত্রা, অক্ষর, স্বর, কলা, ব্যষ্টি, প্রভৃতি বিভিন্ন একক ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন ছান্দসিকের আলোচনায় 'যতি' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং চরণ ও পদ শব্দ-দুটি অনেক-ক্ষেত্রে সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছন্দের বিভিন্ন রীতি অনুযায়ী জাতিনির্ণয়েও বিচিত্র নামকরণ জিজ্ঞাসুর কাছে বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। অমূল্যধন শব্দ-পরিচয়ে অর্থের নির্দিষ্টতা এবং এককবিচারে যুক্তিগ্রাহ্য অভিমত প্রকাশ করে বাঙলা ছন্দের আলোচনায় যাবতীয় বিভ্রান্তি দূর করেছেন।

কিন্তু ছন্দবোধ এবং ছন্দ-জিজ্ঞাসা যে দুই পৃথক বিষয় সে বিষয়ে অমূল্যধন সচেতন ছিলেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন : "কেহ কি প্রথমে কোনও কবিতার জাতি নির্ণয় করিয়া, পরে তাহার ছন্দোবিভাগ করেন, না, প্রথমে ছন্দোবিভাগ করিয়া পরে জাতি নির্ণয় করেন?···কার্যতঃ সকলেই আগে ছন্দোবিভাগ করিয়া পরে জাতি নির্ণয় করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ছন্দোবিভাগের সূত্র কি, তাহাই নির্ণীত হওয়া দরকার।" (বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, পৃ. ৯০)

ছন্দবোধ থেকেই ছন্দ-বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যায়। "ছন্দের পরিচয় কানে ; নিরক্ষর লোকেও ছন্দপতন ধরিতে পারে"—অমূল্যধনের এ উক্তি থেকে বুঝতে পারি, সংজ্ঞা নিরূপণ বা একক-বিচার তত্ত্ব-আলোচনার জন্যেই প্রয়োজন, ছন্দবোধের জন্য প্রয়োজন শ্রুতির সংস্কার। ছন্দবোধ আগে, তারপর ছন্দ-বিশ্লেষণ। ছন্দতত্ত্ব আলোচনায় এ কথাটি সর্বাগ্রে মনে রাখা উচিত। অমূল্যধন তাই ছন্দবোধ থেকে ছন্দ-বিজ্ঞানে পৌঁছেছেন। শ্রুতি থেকে পৌঁছেছেন শব্দ

উচ্চারণের নিয়মে এবং অনিয়মে।

স্পষ্টভাবেই হোক আর অন্তর্লীন হয়েই থাক, যে-কোন শিল্পের সৃষ্টিই তার নিজস্ব নিয়ম মেনে চলে। কবিতার ছন্দও তাই নিয়মানুগ, কবি তাঁর রচনার মধ্যে এই নিয়ম মেনে চলেন বলেই পাঠক বা শ্রোতার ছন্দবোধ তৃপ্ত হয়। ছন্দবোধ আর কিছুই নয়—কবি-অনুসৃত নিয়মকে সচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে অনুভব করা। অমূল্যধন তাই ছন্দ-বিশ্লেষণে ছন্দবোধের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বলেছেন, অক্ষরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদের ওপর বাঙলা ভাষায় ছন্দবোধ নির্ভর করে না, বাগ্‌যন্ত্রের সামর্থ্য অনুসারে এক ঝোঁকে উচ্চারিত শব্দগুচ্ছের ধ্বনিঝঙ্কার থেকেই ছন্দবোধ জাগে। "এই ঝোঁকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের ঐক্যের লক্ষণ এবং পরিমিত কালান্তরে বাগ্‌যন্ত্রে নূতন করিয়া শক্তির সঞ্চারই বাংলার ছন্দোবিভাগের সূত্র।"—বলেছেন অমূল্যধন।

তাই উচ্চারণের ঝোঁক থেকে যে বিভাগগুলি তৈরী হয়, "পরিমিতমাত্রার (সেই) ছন্দোবিভাগগুলিকে উপকরণরূপে ব্যবহার করার উপরই 'ছন্দবোধ' নির্ভর করে। ছন্দের এক-একটি বিভাগের শব্দ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তদনুসারেই ছন্দোরচনা হয়।" অমূল্যধনের এই উক্তি থেকেই আমরা তাঁর অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য অনুধাবন করতে পারি। তিনি বলেন, বাঙলাভাষায় ছন্দবোধে উচ্চারণের ঝোঁকই প্রধান বলে এক ঝোঁকে উচ্চারিত শব্দসমষ্টিকেই ছন্দবিশ্লেষণে প্রাধান্য দিতে হবে, অক্ষরসমষ্টিকে নয়। একটি ছন্দোবিভাগকে তিনি বলেছেন পর্ব; এবং পর্বসম্মিতির হিসাবে যে কাল পরিমাণে স্থির হয় তার একককে তিনি বলেছেন মাত্রা। একই অক্ষর উচ্চারণভেদে একমাত্রিক অথবা দ্বিমাত্রিক হতে পারে বলে অক্ষরের হিসাব থেকে তিনি পর্ব-সম্মিতির হিসাব কষেননি। উচ্চারণের সম্পূর্ণ ঝোঁক কখনও শব্দের মাঝখানে শেষ হয় না, তাই পর্বে গোটা বা অভঙ্গ শব্দ (বা শব্দাবলী) পাওয়া যায়। ছন্দস্পন্দন পর্বস্থিত শব্দগুলির বিশেষ বিন্যাস থেকে আসে, অক্ষরের বৈশিষ্ট্য থেকে আসে না। "বাঙলা ছন্দের বিশিষ্ট নিয়মানুসারে পর্বাঙ্গগুলি না সাজাইলে ছন্দঃপতন অবশ্যম্ভাবী।"

পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গ-বিন্যাসের আদর্শ কি, তা অমূল্যধন তাঁর গবেষণাগ্রন্থে 'গদ্যের ছন্দ' অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। বলেছেন, "পদ্যে পর্বের অন্তর্ভুক্ত পর্বাঙ্গগুলি হয় পরস্পর সমান হইবে, না-হয় তাহাদের মাত্রার ক্রম অনুসারে

তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে।"

এইভাবে আমরা দেখি, উচ্চারণের ঝোঁক থেকে এবং পর্বাঙ্গ-বিন্যাসের আদর্শ থেকেই বাঙলা কাব্যে আমাদের ছন্দবোধ চরিতার্থ হয়। অমূল্যধন তাই ছন্দ-বিশ্লেষণে পর্বগঠন এবং পর্বাঙ্গ-বিন্যাসের গুরুত্ব সর্বাধিক বলে মনে করেছেন এবং তাঁর উপলব্ধ তত্ত্বের নাম দিয়েছেন 'পর্ব-পর্বাঙ্গবাদ'। পরবর্তীকালে বহু মনীষী বাঙলা ছন্দের বৈচিত্র্য নিয়ে নানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং তাতে বাঙলা ছন্দের প্রকৃতিরহস্য আরও উন্মোচিত হয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু ছন্দবোধ সম্বন্ধে যে কাঠামোটি অমূল্যধন রচনা করে গেছেন তা আজও বাঙলা-ছন্দ-বিশ্লেষণে অভ্রান্ত পথ-নির্দেশ।

২

ছন্দবোধ এবং ছন্দস্পন্দনের পর যে প্রসঙ্গ বিশেষভাবে অমূল্যধনের আলোচনায় গুরুত্বলাভ করেছে, তা হল বাঙলা ভাষায় বাক্যগঠনে দ্বিবিধ বিরতির কথা। ছন্দোবিভাগ প্রসঙ্গে তিনি 'পর্ব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং তার একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন। বলেছেন: "এক এক বারের ঝোঁকে ক্লান্তিবোধ বা বিরামের আবশ্যকতার বোধ না হওয়া পর্যন্ত যতটা উচ্চারণ করা যায়, তাহার নাম পর্ব।"

পর্বান্তিক যে বিরতি, তাকেই তিনি বলেছেন 'যতি'। 'যতি' শব্দটি অনেকে সাধারণভাবে বিরতি অর্থে কখনো কখনো ব্যবহার করায় বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। 'যতি' কথাটি পারিভাষিক বা একটিমাত্র অর্থে ব্যবহার করাই বিজ্ঞানসম্মত। সে ক্ষেত্রে 'যতি' অর্থে কেবল পর্বান্তিক উচ্চারণ-বিরতিকেই বোঝায়। অমূল্যধন 'যতি' শব্দটি এই নির্দিষ্ট অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু চরণান্তিক উচ্চারণ-বিরতি বাক্যমধ্যস্থ উচ্চারণ-বিরতি অপেক্ষা কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী বলে তাকে 'পূর্ণযতি' আখ্যা দিয়ে সাধারণ 'যতি'কে 'অর্ধযতি' বলেছেন। উল্লেখ না থাকলে যতি-অর্থে অর্ধযতিই বুঝতে হবে যা দিয়ে পর্ব-দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট হয়।

বাক্যগঠনে অর্থবোধজনিত যে বিরতি তাকেই বলা হয় 'ছেদ'। অর্থের পূর্ণতা যে বিরতিতে তা হল পূর্ণচ্ছেদ এবং এই পূর্ণচ্ছেদ দ্বারা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যই হল চরণ। চরণ তাই কবিতার বৃহত্তর ছন্দোবিভাগ এবং তা একাধিক পর্বে গঠিত। শ্বাসগ্রহণের প্রয়োজনেই এ বিরতি দেখা দেয় এবং নূতন করে শ্বাস-

গ্রহণের মধ্যে শ্বাসত্যাগ করার অবকাশে বাগ্‌যন্ত্রের ব্যবহারে আমরা অর্থের পূর্ণতা দিতে চাই। তাই শব্দাবলী উচ্চারণে শ্বাস-বিভাগ ও অর্থ-বিভাগ একই বিষয়। শ্বাসবিরতিতে অর্থবিরতিও ঘটে। এই অর্থবিরতির সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদের স্থলে জিহ্বারও উচ্চারণ -বিরতি ঘটে ; তাই পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি সাধারণতঃ সহ-অবস্থান করে। কবিতায় যেখানে অর্ধচ্ছেদ ও অর্ধযতি (অর্থাৎ 'যতি') একত্রে থাকে সেক্ষেত্রে অর্থবিভাগ এবং ছন্দোবিভাগ সমান হয়ে যায়। অর্ধচ্ছেদ দ্বারা খণ্ডিত বাক্যাংশকে 'পদ' বলা যায়। পদ আর পর্ব তাই এক নয়। একটি হল অর্থবিভাগ, অপরটি ছন্দোবিভাগ। কিন্তু ত্রিপদীজাতীয় ছন্দে পদ ও পর্ব একত্রে মিশে থাকায় পদের দ্বারাই ছন্দোবিভাগ বুঝা যায়। উপচ্ছেদের অবস্থান থেকে এই যে ছন্দবোধ, অমূল্যধন বলেন, তা অত্যন্ত একঘেয়ে এবং স্পন্দনহীন। বলেন, "যে-কোন রকম ছন্দের দ্যোতনা-শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে ঐক্যের সহিত বৈচিত্র্যের সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। অমিত্রাক্ষর ছন্দে যতির দ্বারা ঐক্য এবং ছেদের দ্বারা বৈচিত্র্য সূচিত হয়। মধুসূদনের ছন্দ যতি অনুসারে ও ছেদ অনুসারে দুই প্রকার বিভিন্ন উপায়ে বিভক্ত হয়। এই দুইপ্রকার বিভাগের সূত্র ধূপছায়া রঙের বস্ত্রখণ্ডের টানা ও পোড়েনের মত পরস্পরের সহিত বিজড়িত অথচ প্রতি-গামী হইয়া রসানুভূতির বিচিত্র বিলাস উৎপাদন করে।"

কবিতায় ছন্দোবিভাগ এবং অর্থবিভাগকে স্পষ্ট করে তোলার মধ্যেই মধুসূদনের কাব্য-সৌন্দর্য অতি সহজেই ছান্দসিকের চোখে ধরা পড়েছে।

৩

ছন্দ-আলোচনায় ছন্দ-বোধ এবং উচ্চারণ-বিরতি বা যতিপাত সম্বন্ধে অবহিত হবার পর যতি-নির্ধারিত ছন্দোবিভাগের দৈর্ঘ্য পরিমাপের কথা বলা যায় এবং তখনই একক-নির্ধারণের প্রশ্ন আসে। এই একক-বিচারই বাঙলা ছন্দের আলোচনায় বিশেষ বিতর্কিত প্রসঙ্গ। এ থেকেই বাঙলা ছন্দে ত্রি-জাতিভেদের কথা আসে, অমূল্যধন যাকে রীতি-ভেদ বলে স্বীকার করেছেন, জাতিগত ভেদ বলে মানতে চাননি। তার কারণ হল, তিনি ছন্দ-পরিমাপে একটিমাত্র একক-ই স্বীকার করেছেন এবং তা হল 'মাত্রা'। তাঁর মতে, স্বর বা অক্ষর—এদের পৃথক পরিচয় আছে, কিন্তু এরা 'মাত্রা'কেই ধারণ অথবা প্রকাশ করে, তাই 'একক'রূপে এদের পৃথক গুরুত্ব নেই। অক্ষর এবং স্বর

উভয়ের মধ্যে দিয়ে 'মাত্রা'রই হিসাব নেওয়া হয়; পর্ব-দৈর্ঘ্যের পরিমাপ মাত্রার পরিচয়েই দেওয়া হয়। বলা হয় এটা পাঁচ-মাত্রার পর্ব বা আট-মাত্রার পর্ব; বলি না, ছয় অক্ষরের পর্ব বা তিন স্বরের পর্ব। মাত্রার সংখ্যা দিয়েই পর্বের পরিমাপ, তাই বোঝা যায় যে মাত্রাই ছন্দোবিজ্ঞানের একক। কিন্তু অনেকসময় আমরা পয়ার-জাতীয় ছন্দে হরফ বা বর্ণ গণনা করে সংখ্যাসাম্যের হিসেব পাই এবং 'হরফ' শব্দটিকে 'অক্ষর' অর্থে প্রয়োগ করে বলে থাকি চৌদ্দ অক্ষরের ছন্দ বা দশ অক্ষরের ছন্দ। সেইরকম 'স্বর' বা ধ্বনির সংখ্যা গুনে আমরা ছড়া-জাতীয় ছন্দে পর্ব-সম্মিতির পরিচয় পাই বলে সেক্ষেত্রে 'স্বর'কেই একক বলে গণ্য করি। কিন্তু এ-সত্ত্বেও সর্বক্ষেত্রেই যে মাত্রার নির্দিষ্ট হিসাবও বজায় থাকে তা অস্বীকার করা যায় না। অমূল্যধন তাই কেবলমাত্র 'মাত্রা'কেই 'একক' বলে নির্দিষ্ট করেছেন এবং অক্ষর ও স্বর-ভেদে মাত্রার হিসাবের পার্থক্য দেখিয়ে ছন্দের রীতিভেদ ব্যাখ্যা করেছেন। একই 'মাত্রা'র হিসাব সকল রীতিতে পাওয়া যায় বলে তিনি একে জাতি-ভেদ বলে মানতে চাননি।

কথাটি বিশদ করতে হলে শব্দ তিনটির নির্দিষ্ট অর্থ স্পষ্ট করা প্রয়োজন। ছন্দশাস্ত্রে 'হরফ' বা 'বর্ণ' এবং 'অক্ষর' শব্দ দুটি এক নয়। অথচ অনেকেই অক্ষর কথাটি হরফ অর্থে গ্রহণ করেন এবং সেজন্যে অক্ষর ও স্বর দুই পৃথক বস্তু বলে মনে করেন। তখন স্বর অর্থে ধ্বনি, এবং অক্ষর অর্থে শুধুই ধ্বনির চিহ্ন বা বর্ণ বোঝায়। সেক্ষেত্রে অক্ষর হল 'হরফ' যা স্বরবর্জিত। সেখানে হসন্তবর্ণ আর অক্ষর একই বস্তু। সেক্ষেত্রে স্বরধ্বনি-বিবর্জিত বর্ণই অক্ষর। সেইজন্যে কবি রবীন্দ্রনাথ এবং দিলীপকুমার প্রমুখ ছান্দসিকেরা ছন্দ-পরিমাপের একক হিসেবে অক্ষরের দাবী স্বীকার করেন না। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—"আক্ষরিক ছন্দ বলে কোন পদার্থ বাঙলায় বা অন্য ভাষাতে নেই, অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র"—তখন তিনি অক্ষরকে হরফ অর্থেই গ্রহণ করেন এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দিলীপকুমার তাঁর 'ছান্দসিকী'তে বলেন—অক্ষর বা হরফ কোন ছন্দের ভিত হতে পারে না। প্রবোধচন্দ্র সেন অক্ষরকে স্বরধ্বনির প্রকাশক জেনেও পয়ার-জাতীয় ছন্দে হরফকে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নিঃস্বর অক্ষর'কে এককের মর্যাদা দিয়েছেন।

অমূল্যধন স্বরধ্বনি-যুক্ত 'বর্ণ' বা 'হরফ'কেই অক্ষর বলেছেন; এবং তাঁর মতে 'ইহাতে একটি মাত্র স্বরের (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) ধ্বনি থাকে'। প্রত্যেক অক্ষরই

তাই একস্বরিক এবং সে-হিসাবে 'অক্ষর' ইংরাজী Syllable-এর প্রতিশব্দ। স্বরহীন অক্ষর তাই সম্ভব নয়, হসন্ত বর্ণ তাই কোনমতেই অক্ষর নয়। এ-কথা স্মরণে রাখলেই আমরা শব্দের লিপিরূপ ও ধ্বনিরূপের প্রভেদ বুঝতে পারব। এ-প্রসঙ্গে অমূল্যধন বলেন: "ছন্দ ধ্বনিগত; ছন্দের বিচার চোখে নয়, কানে। সুতরাং শব্দের বানান বা লিখিত প্রতিলিপির নহে, উচ্চারিত ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সমস্ত বিচার করিতে হইবে।"

অর্থাৎ 'রাখাল' বা 'শরৎ' শব্দ ত্রি-আক্ষরিক নয়, দ্বি-আক্ষরিক। এখানে বর্ণ তিনটি হওয়ার জন্যে মাত্রা তিনটি নয়, দুটি শব্দেই শেষের অক্ষরটি যুগ্মধ্বনি বা হলন্ত অক্ষর এবং পদান্তে তা সাধারণতঃ দ্বিমাত্রিক। তাই দুটি অক্ষরে এখানে তিনটি মাত্রা। স্বরের হিসাবেও এখানে দুটি স্বর। 'মাত্রা' ছাড়া অন্য কোনও 'এককে'ই এরা তিনের ওজন পেতে পারে না। শেষের হসন্তবর্ণটি কোনমতেই, কি স্বরের দিক দিয়ে, কি মাত্রার দিক দিয়ে, একক হিসেবে গ্রাহ্য হতে পারে না। 'রাখাল' বা 'শরৎ'-এ তিনটে অক্ষরের হিসেব কষা ছন্দোবিজ্ঞানসম্মত নয়।

অক্ষর সবসময় একস্বরিক; তাই অক্ষর থেকে স্বরের হিসেব সহজেই পাওয়া যায় কিন্তু স্বরের কালপরিমাণের হিসেব তা থেকে মেলে না। অর্থাৎ অক্ষরের সংখ্যা থেকে ধ্বনির সংখ্যা পাই, কিন্তু ধ্বনির কালপরিমাণ বা মাত্রা-সংখ্যার হিসাব তা থেকে পাওয়া যায় না। হলন্ত অক্ষরের স্থানবিশেষে যুগ্মধ্বনি বা Closed Syllable বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত হয়ে দ্বিমাত্রিক হতে পারে। সেক্ষেত্রে অক্ষরের সংখ্যা অথবা স্বরের সংখ্যা থেকে মাত্রার হিসেব পাওয়া যায় না। 'মাত্রা'কে একক হিসেবে ধরলে যাবতীয় ছন্দে মাত্রা-নিরূপণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পর্বে মাত্রা-সমকত্বের হিসেব পাওয়া যায়। স্বরকে যখন ধ্বনি-সংখ্যা হিসেবে ধরা যায় তখন সর্বদাই স্বর একাক্ষরিক এবং একমাত্রিক। কিন্তু স্বর-ধ্বনিকে যখন কালগত পরিমাণের দিক থেকে মাপা যায়, তখন স্বরধ্বনি একাক্ষরিক হলেও ক্ষেত্রবিশেষে দ্বিমাত্রিক হতে পারে। মাত্রা-ই তাই একক, স্বর বা অক্ষর নয়। অমূল্যধন সেই এককের কী সংজ্ঞা দিয়েছেন তা বিচার করে আমরা সেই ক্ষেত্রবিশেষের পরিচয় নেব।

অমূল্যধন বাঙলা ছন্দের আলোচনায় অক্ষর বা স্বরকে এককরূপে গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন: "অক্ষর-সংখ্যা বাঙলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয়, অর্থাৎ স্বরের সংখ্যা বা স্বরের কোন নির্দিষ্ট গুণের উপর বাঙলা ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর

করে না।"

অর্থাৎ, অক্ষর বা স্বরের উচ্চারণগত ধ্বনির সংখ্যা থেকে নয়, কালপরিমাণ থেকেই তিনি একক স্থির করেছেন এবং সেই 'একক'কে বলেছেন মাত্রা। তাই অক্ষর যখন দ্বিমাত্রিক তখনও তাতে স্বর একটিই। ধ্বনির দ্বিমাত্রিকতা কখনও অক্ষর বা স্বরের দ্বিত্ব বোঝায় না। এ প্রসঙ্গে অবশ্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর গবেষণা-গ্রন্থে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। সে কথা আমরা পরে আলোচনা করে দেখব।

আমরা আগেই দেখেছি, উচ্চারণের ঝোঁক বা পর্ববিভাগই ছন্দবোধের মূল। পর্বদৈর্ঘ্যের একটা বিশেষ আদর্শ রক্ষা করার মধ্যেই ছন্দের বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়ে। পর্বদৈর্ঘ্যের পরিমাপ কালবিভাগই সূচিত করে, কারণ "পরিমিত কালান্তরে কোন আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই।" এই কালপরিমাণকে যে একক দিয়ে ভাগ করা হয় তারই নাম মাত্রা। "বাংলা ছন্দের সমস্ত হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে। মাত্রার মূল তাৎপর্য duration বা কালপরিমাণ। এক একটি অক্ষরের উচ্চারণে কি পরিমাণ সময় লাগে তদনুসারে মাত্রা স্থির করা হয়।"

'অক্ষরের উচ্চারণ' অর্থে অমূল্যধন বলেছেন: "বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাহাই অক্ষর।" তাই অক্ষরমাত্রেই একটি এবং কেবলমাত্র একটি স্বরেরই প্রকাশ। অক্ষর-সংখ্যা এবং স্বর-সংখ্যা বা ধ্বনির সংখ্যা যে-কোন শব্দে সর্বদাই সমান। বাঙলায় 'যা' এবং 'যাস্' দুটি শব্দই একাক্ষরিক এবং সে-হিসেবে একস্বরিক। কিন্তু মাত্রা-বিচারে, অর্থাৎ কালগত পরিমাণ বিচারে এই অক্ষর বা স্বর ক্ষেত্রবিশেষে একমাত্রিক অথবা দ্বিমাত্রিক হতে পারে। [এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই এক, দুই-এর হিসাব ঠিক গাণিতিক যথাযথতায় করা যায় না, কারণ, "ছন্দের মাত্রা নির্ণীত হয় চিত্তের অনুভূতিতে, বৈজ্ঞানিকের কালমানযন্ত্রে নহে।"]

পরিমিত কালান্তরে উচ্চারণের ঝোঁকই ছন্দবোধের মূল এবং সেই কালপরিমাণের এককই 'মাত্রা'। অক্ষর এবং স্বরের একক রূপে ব্যবহার ছন্দোবিজ্ঞানসম্মত হয় না বলেই অমূল্যধনের ধারণা। বাঙলা ছন্দ আলোচনায় কালবিভাগের গুরুত্ব স্বীকার করে এই যে নির্দিষ্ট একক স্থির করেছেন, অমূল্যধনের এ এক স্থায়ী অবদান।

বাঙলা ছন্দের একক বিচারে এই প্রসঙ্গে আমরা ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য

মহাশয়ের মতটি আলোচনা করে দেখব। তারাপদবাবুও স্বীকার করেন যে, স্বরধ্বনি ছাড়া অক্ষর হতে পারে না। তাঁর মতে অক্ষর শুধু একাক্ষরিক-ই নয়, তা সর্বত্রই একমাত্রিক। কোন একটি অক্ষরই দ্বি-মাত্রিক হতে পারে না। কারণ, অক্ষর হল স্বরধ্বনির আধার এবং আকার ; তা সব সময় নির্দিষ্ট। 'মাত্রা' এই নির্দিষ্ট পরিমাপের আধারে নির্দিষ্ট কালসূচক একক, একই আধারে তার বৃদ্ধি হতে পারে না। মাত্রাবৃদ্ধি হলে সেখানে পৃথক আর একটি আধার বা অক্ষরের আগম হয়। লিপিগতভাবে তা প্রদর্শিত না হলেও শ্রুতির দিক থেকে তাকে স্বীকার করা প্রয়োজন। অর্থাৎ 'যাস্' যখন একমাত্রিক তখন অক্ষর সেখানে একটি ; কিন্তু 'যাস্' যখন দ্বিমাত্রিক অক্ষর সেখানে বস্তুত দুটি, যার লিপিরূপ হল 'যা-আস্'। অর্থাৎ কোন অক্ষর দ্বিমাত্রিক হলেই সেখানে একটি স্বরের বৃদ্ধি হয় এবং অক্ষর ছাড়া স্বরের অবস্থান নেই, সেজন্যে সেখানে একটি অক্ষরেরও আগম হয়। লিপিরূপে তা ধরা হয় না, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ছন্দোলিপি রচনায় তার নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। তিনি সংগীতের মাত্রানির্দেশে লিপিরূপের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং রোমান হরফে বাঙলা কবিতার ছন্দোলিপি রচনা করে অক্ষরের একমাত্রিকতা প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন 'মা' যখন একমাত্রিক তখন তার লিপিরূপ হল মা (Mä) ; আর 'মা' যখন দ্বিমাত্রিক তখন তার লিপিরূপ হল মা-আ (Mää)। 'সমান' শব্দ সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে যখন দ্বিমাত্রিক তখন তাতে দুটি অক্ষর—স-মান্ ; কিন্তু বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে যখন তা ত্রি-মাত্রিক তখন তাতে তিনটি অক্ষর—স-মা-আন্। অর্থাৎ, তাঁর মতে স্বরের মাত্রাবৃদ্ধি মানেই অক্ষরের আগম। কোন অক্ষর দ্বিমাত্রিক হলে তা বস্তুত দ্বি-আক্ষরিক হয়ে যায়। অক্ষর-বৃদ্ধি ছাড়া স্বরবৃদ্ধি এবং সেহেতু মাত্রাবৃদ্ধি হতে পারে না। যেমন কেটলিতে একটা পেয়ালা দিয়ে একেবারে দু'কাপ পরিমিত জল ভরা যায় না, কাপ খালি করে আর-একবার কাপ ভরতে হয়, তেমনি দুটি অক্ষর দিয়ে ত্রিমাত্রিক শব্দ তৈরি করা যায় না, তৃতীয় মাত্রা আর একটি অক্ষরের ওপর ভর করেই আসে যার লিপিরূপ দেখানো হয় না।

তাহলে তারাপদবাবুর মত এই যে, বাঙলা ভাষায় যাবতীয় অক্ষর সব-সময়েই একমাত্রিক এবং যুগ্মধ্বনি বা হলন্ত-অক্ষর-বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে যখন দ্বি-মাত্রিক হয়, তা প্রকৃতপক্ষে তখন দ্বি-আক্ষরিক হয়ে ওঠে।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথও ছন্দের আলোচনায় এই মতের কিছুটা আভাস দিয়ে-

ছিলেন। 'টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে'—এই চরণাংশের 'টুমুস্'-শব্দে তিন মাত্রার হিসেব দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— " 'টু' 'মু' দুই সিলেবল্ [রবীন্দ্রনাথ অক্ষরকে 'হরফ' অর্থে গ্রহণ করায় এখানে 'সিলেবল্' বা 'স্বর' শব্দ ব্যবহার করেছেন]; পরবর্তী হসন্ত 'স'-ও সিলেব্‌লের মাত্রা নিয়েছে পূর্ববর্তী 'উ' স্বরকে দীর্ঘ করে।"

কিন্তু হসন্ত-'স্'-এর মাত্রা নেবার ক্ষমতা কোথায়, যদি না পূর্ববর্তী দীর্ঘীকৃত স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পৃথক একটা হলন্ত অক্ষর সৃষ্টি না করে? অর্থাৎ, 'টু-মু-স্' যদি 'টু-মু-উস্' না হয়ে ওঠে?

তাহলে আমরা দেখি, বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে হলন্ত অক্ষরের হসন্ত বর্ণ (স্বর-বৃদ্ধিতে) একটি স্বতন্ত্র হলন্ত অক্ষরে পরিণত হয়। অর্থাৎ 'টু-মুস্' এই দ্বি-আক্ষরিক শব্দটি 'টু-মু-উস্' এই ত্রি-আক্ষরিক শব্দে পরিণত হয়।

মাত্রাবৃদ্ধিতে এই অক্ষরবৃদ্ধি মেনে নিয়ে অক্ষরকে একমাত্র একক বলে তারাপদবাবু স্বীকার করেছেন, কিন্তু সে-হিসাবে ছন্দের পরিচয়ে পাঁচ অক্ষরের ছন্দ অথবা দশ অক্ষরের ছন্দ চালু করা যাবে কি? আবার সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে বিশেষ কোন অক্ষরেই যখন কালপরিমাণগত ভেদ নির্দেশ করে, তাকে একমাত্রিক অথবা দ্বিমাত্রিক বলায় প্রয়োগগত স্পষ্টতা দেখা যায় এবং ক্ষেত্র-বিশেষে মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরে মাত্রাবৃদ্ধিতে অক্ষরটিকে দ্বিমাত্রিক বলাই আমাদের প্রথাগত অভ্যাস, তখন 'অশরীরী' অক্ষরকে গৌণ করে মাত্রার হিসাব রাখাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হতে পারে। তাই কালপরিমাণের স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় বলে 'একক' হিসাবে 'মাত্রা'র ব্যবহারই উপযুক্ত।

বাঙলা ছন্দের আলোচনায় পরবর্তীকালে বহু ছান্দসিক মৌলিক গবেষণার কাজ করেছেন। শ্রদ্ধেয় প্রবোধ সেন মহাশয়ের 'দলবৃত্ত' ছন্দের বিশ্লেষণ এবং কলাবৃত্ত ছন্দের (মাত্রাবৃত্ত) প্রাচীন ও আধুনিক রূপের বিশদ পরিচয় ব্যাখ্যা বাঙলা ছন্দের আলোচনায় বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু সেইসঙ্গে একথা স্বীকার্য যে, অমূল্যধনের পর্ব-পর্বাঙ্গবাদ সূত্র বাঙলা ছন্দের আপাতবিরোধী আলোচনার মধ্যে একটা বিজ্ঞানসম্মত ঐক্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'বাঙলা ছন্দের মূলসূত্র' আজও মূলসূত্রের নির্দেশক।

ছান্দসিক অমূল্যধন

অলোক রায়

সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃত ভাষায় লেখা কবিতার ছন্দ নিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু হাজার-বছর-বয়সী বাংলা ভাষা, কবিতা নিয়ে গৌরব বোধ করলেও বাংলা ছন্দের আলোচনা নিতান্ত সম্প্রতিকালের ঘটনা। বাংলা ব্যাকরণ যেমন প্রথমদিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ফেলে লেখা হতো, ছন্দের আলোচনাও অনেকদিন পর্যন্ত তথাকথিত বাংলা ব্যাকরণের পরিশিষ্টে স্থান পেত। বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই প্রথম চিন্তা করেন (শ্রাবণ ১২৯০), কিন্তু প্রবোধচন্দ্র সেন সঙ্গত কারণেই বলেন: 'রবীন্দ্রনাথের এই ছন্দপ্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে, এগুলি সবই ছন্দরচনার দৃষ্টি দিয়ে লেখা, ছন্দব্যাকরণের দৃষ্টি দিয়ে নয়। এ দৃষ্টি স্রষ্টার, বিশ্লেষকের নয়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহাশিল্পীর দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া কম লাভ নয়। কিন্তু শিল্পরচনার ও ব্যাকরণ-বিশ্লেষণের দৃষ্টি দুই ভিন্ন জাতের জিনিস।' (নিবেদন ১৯৬৫, নূতন ছন্দ-পরিক্রমা, ১৯৮৬)। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দ-বিশ্লেষণের মন ছিল, কিন্তু ছন্দব্যাকরণ লেখার ইচ্ছা ছিল না। অথচ যে-কোনো ভাষায় কাব্যচর্চার জন্য ছন্দব্যাকরণের একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন অনুভব করেই শশাঙ্কমোহন সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ কেউ কেউ বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে প্রবন্ধ-লেখা শুরু করেন। তাঁদের রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ছন্দব্যাকরণ লেখা হয়ে ওঠেনি। এদিক থেকে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের (১৯০২—১৯৮৪) 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' (১৯৩২) গ্রন্থ সম্বন্ধে লেখকের দাবি যথার্থ: "বিজ্ঞানসম্মত, প্রণালীবদ্ধভাবে বাংলা ছন্দের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার বোধহয় এই প্রথম প্রয়াস।" তবে প্রথম প্রয়াস বলেই প্রথম সংস্করণে কিছুটা অসম্পূর্ণতা ছিল, গ্রন্থটি আকারেও ছিল ছোট। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো কবির মনে হয়েছিল: 'অন্তত আমার মনে আর কোনও সন্দেহ নেই যে অমূল্যধন বাংলা ছন্দের প্রকৃতি-সম্বন্ধে যা বলেননি, তা বক্তব্যই নয়। এই প্রশংসা আত্যন্তিক শোনালেও বিবেচনাসম্ভূত; এবং সত্য বলতে কি, অমূল্যধনের লেখা যখন প্রথমে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে পড়ি

তখন মনে কেবল প্রতিবাদ জেগেছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিপাদ্য পুস্তকাকারে হাতে আসার পরে আমার মুখ্য আপত্তিগুলির বোধহয় আর একটাও অবশিষ্ট নেই। অবশ্য এখনও ছোট-খাট অনেক কৌতূহল অতৃপ্ত রয়েছে; তবে সে-জন্যে হয়তো আমার স্থূল বুদ্ধিই দায়ী। কারণ আমার বিশ্বাস যে অমূল্যধন যদি তাঁর সূত্রগুলিকে উদাহরণ-সমেত সবিস্তারে লেখেন, তাহলে আর কোনও অভিযোগ থাকবে না; এবং বাংলা ছন্দের মৌল সত্তা যাঁর অগোচর নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ অঙ্গসংস্থানে তাঁর ভুল-ভ্রান্তি নিশ্চয়ই সাময়িক।' তারপর পঞ্চাশ বছর ধরে 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থটি বারবার সংশোধন ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে বর্তমান আকৃতি (সপ্তম সংস্করণ ১৯৮৩) লাভ করেছে। একদা যা ছিল নিতান্ত সূত্রাকারে লেখা সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা, তা পরবর্তীকালে লেখকের গবেষণা ও চিন্তার ফলে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ছন্দব্যাকরণে পরিণত হয়েছে।

অবশ্য বাংলা ছন্দ নিয়ে বিতর্কের অবসান আজও হয়নি, যদিও অধিকাংশ বিতর্ক, একদা সুধীন্দ্রনাথের যেমন মনে হয়েছিল 'সাম্প্রতিক মাসিক পত্রের ভদ্রতাবিরুদ্ধ ছন্দোযুদ্ধ', আজও তেমনই নিরর্থক মনে হয়। অমূল্যধন যখন বাংলা ছন্দ নিয়ে প্রথম আলোচনা শুরু করেন, তখন বাংলা ছন্দ-পরিভাষা বলে কিছু গড়ে ওঠেনি। যেমন সত্যেন্দ্রনাথ 'অক্ষর' শব্দটি কখনো 'বর্ণ' (letter) আবার কখনো ধ্বনি-মাত্রা (syllable) অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া 'অক্ষর-পাপড়ি' (syllable), 'গাঙ্গিনীতরণ পদ্ধতি', 'গঙ্গাযমুনা পদ্ধতি', 'ঝর্ণাঝামর পদ্ধতি' প্রভৃতি নামকরণ শুনতে ভালো লাগলেও তাদের ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই। রবীন্দ্রনাথও অক্ষর, পদ, পর্ব, এমনকি ছন্দের নামও এক এক সময়ে এক এক অর্থে ব্যবহার করেছেন। ফলে অমূল্যধনকে ছন্দব্যাকরণ-রচনাকালে প্রথমে ছন্দের পরিভাষা রচনা করতে হয়েছে, যেমন অক্ষর, ছেদ, হ্রস্ব ও লঘু, দীর্ঘ ও গুরু, তানপ্রধান ছন্দ, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ, শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ প্রভৃতি। তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন: 'এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুসারে গ্রহণ করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে এই শব্দগুলি সর্বসাধারণেও গ্রহণ করিবেন।' কিন্তু সমকালে ও পরবর্তীকালে অন্যান্য ছান্দসিকেরা প্রত্যেকেই নিজের রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী নতুন নতুন পরিভাষা তৈরি করেছেন। ফলে ইংরেজীর মতো বাংলায় সর্বজন-

স্বীকৃত ছন্দ-পরিভাষা আজও গড়ে ওঠেনি। ছন্দের আলোচনায় নানা বাদ-বিসংবাদের অন্যতম কারণ, একই জিনিসকে নানা নামে অভিহিত করা। কিন্তু অমূল্যধন-প্রবর্তিত পরিভাষাগুলির মধ্যে সবগুলি না হলেও, অনেক-গুলি আজ সকলেই ব্যবহার করে থাকেন। সেখানে তাঁর গ্রন্থের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৯৩৯) রচনা-কালে 'বাঙ্গালা ছন্দোবিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের প্রযুক্ত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ গ্রহণ' করেছেন, যেমন অক্ষর, মাত্রা, ছেদ, যতি, অর্ধযতি, পূর্ণযতি, পর্ব, পর্বাঙ্গ, চরণ, তানপ্রধান ছন্দ, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ, বলপ্রধান ছন্দ। শুধু তাই নয়, ছন্দের সংজ্ঞা-স্বরূপ দানকালেও তিনি অমূল্যধনকে অনুসরণ করেছেন, যেমন, 'বাঙ্গালা কবিতা পাঠ করিবার সময়ে, একটা টান বা সুরও আসে। ইংরেজীতে এই টান বা সুরকে Vocal Drawl বলে, সংস্কৃতে ও তদনুসারে বাঙ্গালায় ইহাকে তান বলা যায়।···এই প্রকারের ছন্দের পাঠ-কালে যে টান বা সুর আসে, তাহাতেই বিভিন্ন অক্ষরের হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভাবের একটা সামঞ্জস্য হইয়া যায়।' কিংবা 'বলপ্রধান বা স্বরাঘাত প্রধান ছন্দ। এই জাতীয় ছন্দের প্রতি পর্বে প্রথমে একটি প্রবল স্বরাঘাত পড়ে। স্বরাঘাতের প্রভাবে ব্যঞ্জনান্ত syllable বা অক্ষর সঙ্কুচিত বা হ্রস্ব হইয়া উচ্চারিত হয়।' সুকুমার সেনও অমূল্যধনের মতোই মনে করেন : 'উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই অক্ষর (syllable)। শুদ্ধ স্বরধ্বনি, অর্ধব্যঞ্জনধ্বনি, অগ্রে অথবা পশ্চাৎ অথবা অগ্র-পশ্চাৎ ব্যঞ্জনযুক্ত স্বরধ্বনি, কিংবা অগ্রে ব্যঞ্জনযুক্ত স্বরধ্বনি (অথবা অর্ধব্যঞ্জন-ধ্বনি) লইয়া অক্ষর।' 'মাত্রা'র সংজ্ঞাদানকালেও তিনি অমূল্যধনের প্রতিধ্বনি করে লেখেন : 'অক্ষরের উচ্চারণমানের একককে বলে মাত্রা (Mora)। বিবৃত অক্ষরে হ্রস্ব স্বরধ্বনি থাকিলে তাহা একমাত্রা, আর বিবৃত অক্ষর এবং সংবৃত অক্ষরে দীর্ঘ স্বরধ্বনি থাকিলে দুই মাত্রা।' (ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃ. ৩৫)। 'তানপ্রধান ছন্দ' নামটিও সুকুমার সেন গ্রহণ করেছেন।

এ-থেকে বোঝা যায়, ভাষাবিজ্ঞানীরা অমূল্যধন-প্রদত্ত পরিভাষা ব্যবহারে আপত্তি বোধ করেননি। ভাষাবিজ্ঞানে পরিভাষাকে যেমন সংক্ষিপ্ত, অব্যর্থ ও অব্যর্থ হতে হয়, ছন্দোবিজ্ঞানেও পরিভাষার তেমনই হওয়া উচিত। অমূল্যধন ছন্দের পরিভাষা রচনাকালে ভাষাবিজ্ঞান, সঙ্গীতশাস্ত্র এবং দেশী-বিদেশী অন্য

কয়েকটি ভাষার কাব্য ও ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর আলোচনা সাধারণভাবে বিস্তারধর্মী নয়, অর্থাৎ অল্প কয়েকটি ছন্দবিষয়ক প্রবন্ধ বাদ দিলে, 'মূলসূত্র' গ্রন্থটি বিজ্ঞানের তত্ত্বপ্রতিপাদনের মতোই সূত্রাকারে লেখা। সূত্রগুলি পরপর অনুসরণ করলে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। বোঝা যায়, অমূল্যধনের নিজের কাছে তাঁর বক্তব্যগুলি এমনই প্রত্যক্ষবৎ সরল ও সত্য যে, ছন্দের মূলসূত্র রচনাকালে তিনি কোনো বিতর্কের আশ্রয় নেন না।

ছন্দের আলোচনায় তাঁকে কয়েকবার বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হয় সত্য। কিন্তু সেখানেও তিনি সাময়িক উত্তেজনা পরিহার করে নির্বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানী। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসে অমূল্যধন 'ছন্দের দ্বন্দ্ব (?)' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, যাতে তিনি দেখান, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যাকে 'ছন্দের দ্বন্দ্ব' বলছেন ('বিচিত্রা', বৈশাখ ১৩৩৯) প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বের আভাস নেই, কারণ 'বাংলা ছন্দ যে সিলেবল্-সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, মাত্রাসংখ্যার উপর নির্ভর করে, ইহা বাংলা ছন্দশাস্ত্রের গোড়ার কথা। বাংলা ছন্দ মাত্রই মাত্রা-ছন্দ। বাংলায় চার সিলেবলের বা পাঁচ সিলেবলের ছন্দ নাই, আছে চার বা পাঁচ মাত্রার ছন্দ।' বলা বাহুল্য, এই মন্তব্য নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু প্রবন্ধের শেষাংশে অমূল্যধন একটি প্রশ্ন তুলেছেন : 'বাংলায় পাঁচ মাত্রা ও চার মাত্রা মিলাইয়া অর্থাৎ নয় মাত্রা লইয়া পর্ব রচনা করা যায় কি? সে বিষয়ে কেহ পরীক্ষা করিতে পারেন। নয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার বাংলায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে অনেক সময় যাহাকে নয় মাত্রার পর্ব বলিয়া মনে হয় তাহা বাস্তবিক অন্য জিনিষ। ছয় মাত্রার পর্বের সহিত একটি অপূর্ণ ছয় মাত্রার অর্থাৎ তিন মাত্রার একটি পর্ব যোগ করিয়া একটি চরণ রচিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে নয় মাত্রার পর্ব বলা যাইবে না। সেইরূপ চৌপদীতে পর্যায়ক্রমে চার ও পাঁচ মাত্রার পর্বের সমাবেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও নয় মাত্রার পর্বের উদাহরণ বলিয়া ধরা চলিবে না।' রবীন্দ্রনাথ এই সময় ছন্দ নিয়ে ভাবছেন ও লিখছেন ; 'পরিচয়' পত্রিকায় 'নবছন্দ' (কার্তিক ১৩৩৯) প্রবন্ধে তিনি অমূল্যধনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লিখলেন : 'বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরি করতে অসাধারণ নৈপুণ্যের দরকার করে না।' নয়মাত্রার ছন্দ

অসম্ভব বা অভিনব কোনো ব্যাপার নয়। অমূল্যধন রবীন্দ্রনাথের দেওয়া দৃষ্টান্ত 'আঁধার রজনী পোহাল' গানটিকে নয়মাত্রার ছন্দে লেখা বলতে রাজি হলেন না ('নয় মাত্রার ছন্দ', পরিচয়, কার্তিক ১৩৪০)। রবীন্দ্রনাথ আবার প্রতিবাদ করলেন, এবার কিছুটা উত্তেজিত হয়ে,"অমূল্যবাবু বললেন এটা তো নয়মাত্রার ছন্দ নয়ই, বাংলাভাষায় আজো নয়মাত্রার উদ্ভব হয় নি, হয়তো নিরবধিকালে কোনো এক সময়ে হতেও পারে। তিনি বলেন বাংলা ছন্দ দশমাত্রাকে মেনেছে, নয়মাত্রাকে মানে নি। এ কথায় আরো আমার ধাঁধা লাগল।…এর থেকে বোঝা যাচ্ছে আমার অঙ্কবিদ্যায় আমি যে-সংখ্যাকে 'নয়' বলি অমূল্যবাবুর অঙ্কশাস্ত্রেও তাকেই 'নয়' বলে বটে, কিন্তু ছন্দের মাত্রানির্ণয় সম্বন্ধে তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে আমার পদ্ধতির মূলেই প্রভেদ আছে।…ছান্দসিক যাই বলুন এখানে ছন্দরচয়িতা হিসাবে আমার আবেদন আছে। ছন্দের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যা বলি সেটা আমার অশিক্ষিত বলা, সুতরাং তাতে দোষ স্পর্শ করতে পারে; কিন্তু ছন্দের রস সম্বন্ধে আমি যদি কিছু আলোচনা করি, সংকোচ করব না, কেননা ছন্দসৃষ্টিতে অশিক্ষিতপটুত্বের মূল্য উপেক্ষা করবার নয়। 'আঁধার রজনী পোহাল' রচনাকালে আমার কান যে আনন্দ পেয়েছিল সেটা অন্যছন্দোজনিত আনন্দ থেকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র।" ('ছন্দের মাত্রা', উদয়ন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১)। বলা বাহুল্য, এর-পর আর তর্ক চলে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনায় শুধু ছন্দের পরিভাষা নিয়ে বিভ্রম সৃষ্টি করেননি, ছন্দের বিচারবিশ্লেষণ থেকে বহুদূরে সরে গেছেন। প্রবোধচন্দ্র সেন, যিনি ছন্দের আলোচনায় প্রায় কোনোসময়ই অমূল্যধনের সঙ্গে একমত নন, তিনিও স্বীকার করেছেন : 'নয়মাত্রা পর্বের নানারকম দৃষ্টান্ত রচনা করে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সেগুলির বিশ্লেষণ করেছেন তা সব ক্ষেত্রেই ছান্দসিকদের সমর্থন লাভ করবে কিনা সন্দেহ। কেননা, ও-সব দৃষ্টান্তের অন্যরকম বিশ্লেষণ সম্ভব হয়তো সমীচীনও।…'নবছন্দ' প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে রবীন্দ্রনাথ নয়মাত্রা চালের ছন্দ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন, অমূল্যধন স্বভাবতঃই তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। কেননা, অমূল্যধনের প্রশ্ন ছিল নয়মাত্রার 'পর্ব' বাংলায় হতে পারে কি না। রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ, 'পাঠপরিচয়', ১৯৬২, পৃ. ৪০৫-০৬)। অমূল্যধন 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থে 'নয় মাত্রার ছন্দ' প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণকালে পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন :

রবীন্দ্রনাথ পরে এই প্রবন্ধের এক উত্তর দিয়াছিলেন। কবিগুরুর সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা ছিল না বলিয়া আমি কোন প্রত্যুত্তর করি নাই। দ্বিতীয় প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ আমার যুক্তির উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, পর্ব ও চরণ লইয়া গোলমাল করিয়াছেন, তর্ক যে নয়মাত্রার চরণ নহে, নয়মাত্রার পর্ব লইয়া তাহা অনেক সময় বিস্মৃত হইয়াছেন। অনেক সময় আমি যাহা বলি নাই তাহা আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন, আবার কখন কখন 'পঞ্চমাত্রা ঘটিত এই বারোমাত্রা' প্রভৃতি বলিয়া আমার যুক্তিই অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়াছেন।···

পরিশেষে বলা আবশ্যক যে ছান্দসিক হিসাবে কবিগুরুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা কাহারও চেয়ে কম নহে। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধাদি পড়িয়াই ছন্দের আলোচনায় আমার প্রবৃত্তি হয়। ১৩৩৮ সালের বৈশাখে তাঁহার সহিত আমার দেখা হয়, এবং ছন্দ লইয়া আলোচনা হয়। তিনি মুখে ও পত্রে এ বিষয়ে আমার প্রয়াস সম্পর্কে তাঁহার যে অভিমত জ্ঞাপন করেন তাহাতে আমি ধন্য বোধ করি। পরে ছন্দ সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার মতেরই পোষকতা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সহিত আমার কদাচ যে মতভেদ হইয়াছে তাহা একটা পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার বা নগণ্য বিষয় লইয়া। ছন্দ সম্পর্কে তাঁহার অনুভূতির প্রামাণিকতা আমি নতমস্তকেই স্বীকার করি।

'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' বিষয়ে অমূল্যধন কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা না করলেও, এই বিষয় নিয়ে তিনি একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন—

'Studies in Rabindranath's Prosody', *Journal of the Department of Letters*, Cal. Univ. vol. 31.

'Studies in the Rhythm of Bengali Prose and Prose Verse', *Journal of the Department of Letters*, C. U., vol. 32.

'রবীন্দ্র ছন্দের বৈশিষ্ট্য', আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা, ১৯৬১

'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান', বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, ১৯৪৯

'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সৃষ্টি', কবিগুরু, ১৯৫৪

'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থে দশটি সূত্রের সাহায্যে ছন্দে রবীন্দ্রনাথের 'উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' দেওয়া হয়। 'আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'রবীন্দ্র-ছন্দের বৈশিষ্ট্য' একটি নিটোল প্রবন্ধ, যেখানে সূত্রগুলি শুধু ব্যাখ্যা করা হয়নি, তার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রকবিপ্রতিভার স্বরূপ-ধর্মটি পরিস্ফুট করা হয়েছে। অমূল্যধন দেখিয়েছেন, একদিকে 'রবীন্দ্রনাথ ছন্দে, কাব্যে ও জীবনে সর্বদাই বৈচিত্র্যপন্থী', অন্যদিকে 'সমস্ত বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ একটা অলক্ষ্য সূত্রের সন্ধান সারা জীবনই করিয়াছেন'। ফলে,

'রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বাভাবিক প্রকাশ ছন্দের তরঙ্গে, কারণ ঐক্য ও বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্যেই ছন্দের সৃষ্টি'।

'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সৃষ্টি' প্রবন্ধে অমূল্যধন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলির ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন, অর্থাৎ সূত্র এবং তত্ত্বকে এখানে তথ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আলোচনাটি তথ্যনির্ভর সন্দেহ নেই, কিন্তু লেখক জানেন, 'ছন্দ রবীন্দ্রকাব্যের বাহন মাত্র নয়, কাব্যের আত্মার মূর্ত প্রকাশ, কবির উপলব্ধির প্রকাশ।' তাই বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় ভাববস্তু বা ভাবপ্রেরণার সঙ্গে ছন্দের যোগসূত্রটি ধরে দেওয়া হয়েছে, যেমন "যে চঞ্চল রোম্যাণ্টিকতা, যে নৈরাশ্যমুখর ব্যাকুলতা, যে প্রকাশবেদনার দৈন্য 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র লক্ষণ, তাহা এই সময়কার ছন্দেও দেখিতে পাওয়া যায়।" কিংবা "রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনা ও ছন্দ-সাধনার একটি নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হয় 'ক্ষণিকা' রচনার সময়ে। 'ক্ষণিকা'য় যে একটা অভিনব ক্ষণবাদ বা সহজিয়াবাদ জীবনধর্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহারই প্রকাশ দেখা যায় এই কাব্যের অভিনব ছন্দ-পদ্ধতিতে।"

বাংলায় 'Free Verse'-কে অনেকসময় মুক্তক বা মুক্তবন্ধ ছন্দ বলা হয়। নামকরণ নিয়ে ততটা তর্ক নেই, যতটা তর্ক দেখা দিয়েছে মুক্তক বা মুক্তবন্ধ ছন্দের স্বরূপ নিয়ে। প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে, "যে প্রবাহমান পয়ার বা মহাপয়ার বন্ধে চোদ্দ বা আঠার মাত্রাকে পঙ্‌ক্তিদৈর্ঘ্যের শেষ সীমা বলে মেনে নিয়ে ভাব-প্রকাশের প্রয়োজন অনুসারে ছন্দপঙ্‌ক্তিকে ছোট-বড় নানা রূপে বিন্যস্ত করা হয় তাকে বলা যায় 'মুক্তক পয়ার' বা 'মুক্তক মহাপয়ার'।·· পয়ার ও মহা-পয়ারের এই মুক্তক রূপকে মুক্তবন্ধ বা স্বৈরবন্ধও বলা যায়। 'মুক্তবন্ধ' শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দসরস্বতী' প্রবন্ধে (১৯১৮)। 'মূল-সূত্র' গ্রন্থেও এই নাম স্বীকৃত হয়েছে।" (নূতন ছন্দ-পরিক্রমা, পৃ. ২৬৮)। কিন্তু 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থে অমূল্যধন খুব স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন: "পংক্তির দৈর্ঘ্য মানিয়া তো ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় না।···পংক্তিকে আশ্রয় করিয়া ছন্দের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে যাওয়া চলে না। অনেক স্থলে অবশ্য পংক্তি চরণের (prosodic line or verse) সহিত এক। কিন্তু সে সব স্থলেও পংক্তির বা চরণের দৈর্ঘ্য মাপিয়া ছন্দের প্রকৃতি বুঝা যায় না;······বস্তুতঃ যেখানে বরাবর এক প্রকারের উপকরণ লইয়া ছন্দ রচিত হইয়াছে তাহাকে কেহই free verse

বলিবেন না।" 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সিদ্ধি' প্রবন্ধে 'বলাকার ছন্দ' সম্বন্ধে আলোচনা আরও মূল্যবান। সেখানেও তিনি 'বলাকা'র ছন্দকে 'মুক্তছন্দ' (free verse) বলেন নি, কিন্তু বাংলা ছন্দের বিবর্তনে 'বলাকার ছন্দে'র ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথার্থভাবে নির্দেশ করেছেন : "মধুসূদনের অমিতাক্ষরে [অমিত্রাক্ষর ছন্দে] যে contrapuntal গৌরব আছে [বলাকার ছন্দে] তাহা রহিল না বটে, কিন্তু 'পরিপাটি'র বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করাতে পদ্যছন্দে 'তাণ্ডব ও তরল তালের' আভাস ফুটিয়া উঠিল। মিত্রাক্ষরের ব্যবহার ও 'পরিপাটি'র আভাস থাকার জন্য এ ছন্দকে ঠিক মুক্তছন্দ বলা যায় না ; এ ছন্দে 'পরিপাটি' ও মুক্তছন্দ উভয়েরই লক্ষণাদি থাকায় এখানে ছন্দের এক অভূতপূর্ব অর্ধনারীশ্বর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'বলাকা'য় কবির উপলব্ধির যে বিরাট্ সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহারই মূর্তিরূপ দেখা যায় 'বলাকা'র ছন্দে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দপ্রতিভার ইহাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ কীর্তি।"

স্পষ্টই বোঝা যায়, মুক্তছন্দ (free verse) সম্বন্ধে অমূল্যধনের বিশিষ্ট চিন্তাভাবনা নিয়ে ছান্দসিকেরা এপর্যন্ত তেমন কোনো আলোচনা করেননি, অথচ বাংলা ছন্দের আলোচনায় মুক্তছন্দের বিশেষ ভূমিকা আছে। 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থেই অমূল্যধন এই ছন্দের স্বরূপ নির্ধারণ করেছিলেন। 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সৃষ্টি' প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কয়েকটি রচনা সম্বন্ধে লিখলেন : "জীবনের ও বাক্যসাধনার শেষ পর্বে যখন যোগীর দিব্যদৃষ্টি দিয়া চরম রহস্য কবি প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন আবার নূতন এক প্রকার ছন্দোবন্ধ তিনি প্রবর্তন করিলেন। ইহাতে গদ্যকবিতার অবাধ গতির সহিত মিলিত হইয়াছে পদ্যছন্দের স্পন্দন। ইহার উপকরণ পদ্যের পর্ব, কিন্তু এই পর্বের সমাবেশের মধ্যে পদ্যের কোন রীতিই নাই। মিত্রাক্ষরও নাই, কোন স্তবক বা 'পরিপাটি'র আভাসও নাই। গদ্যকবিতায় যে ভাবে অর্থসূচক শব্দসমষ্টির সমাবেশে এক একটি পঙ্‌ক্তি গঠিত হয়, সেই ভাবেই এখানে পদ্যের পর্বের সমাবেশে এক একটি চরণ রচিত হইয়াছে। ইহাই যথার্থ free verse বা মুক্তছন্দ ; 'বলাকা'র ছন্দে যাহার সূচনা, ইহাতেই তাহার পরিশেষ। 'শেষ লেখা'র 'তোমার সৃষ্টির পথ' প্রভৃতি কবিতা ইহার উদাহরণ। মুক্তি-সন্ধানী কবির শেষ লেখা যে মুক্তছন্দে রচিত হইবে, ইহাই বোধ হয় সমুচিত।"

'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র'-র রচয়িতা অমূল্যধনের ঐক্যসন্ধানী ছন্দ-বিচার এক-

সময় কবি সুধীন্দ্রনাথের অভিনন্দন লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে পর্যবসিত হওয়ায়, আধুনিক কবিরা সেভাবে বইটি পড়ে দেখেননি। তা না হলে, 'ছন্দে নূতন ধারা' প্রবন্ধে তিনি আধুনিক কবিদের উদ্দেশে যে আহ্বান জানিয়েছেন, তা সাড়া না জাগিয়ে পারতো না :

ছন্দঃসুরধুনীতে এখন নূতন করিয়া জোয়ার আসিবার এবং নব নব ধারায় সেই সুরধুনিতে-স্রোত 'অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়' প্রবাহিত হইবার সময় আসিয়াছে।

বাংলা ছন্দ সম্পর্কে সম্প্রতি অনেক আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে ছন্দে নূতন ধারা প্রবর্তিত হয় নাই। ছন্দে নূতন ভঙ্গী বা রীতি আনিতে পারেন প্রতিভাশালী কবি আপন কাব্য-সৃষ্টির দ্বারা, ছন্দের আলোচনাতেই তাহা সম্ভব হয় না। তবে কোন্ কোন্ দিক দিয়া প্রগতি সম্ভব তাহার ইঙ্গিত করা যাইতে পারে, হয়ত কোন প্রতিভাসম্পন্ন কবির শক্তির স্ফুরণের পক্ষে এই ইঙ্গিত কিছু সহায়তা করিতে পারে।

ছন্দ-বিজ্ঞানী অমূল্যধন

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

শ্রদ্ধেয় অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতিমান অধ্যাপক। ইদানীং কালে তাঁর মতো অধীতী শিক্ষক অতিশয় বিরল। আমার অধ্যাপক-জীবনে তাঁর কাছে আমি যখন যে প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি—তিনি তৎক্ষণাৎ অতি সহজেই তার সদুত্তর দিয়েছেন।

তবু শ্রী মুখোপাধ্যায়ের সর্বপ্রথম ও প্রধান খ্যাতি ইংরাজী সাহিত্যের অতি-সফল অধ্যাপক হিসেবে নয়, সেটি তার দ্বিতায় খ্যাতির স্থান। তিনি বাংলা-ভাষার ছান্দসিক হিসাবে অমর কীর্তির অধিকারী। আজ থেকে প্রায় চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন বছর আগে তিনি বাংলা ছন্দ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণাঙ্গ আলোচনার একটি গ্রন্থ রচনা করেন—'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র'। এই গ্রন্থের আগে বাংলা ছন্দ সম্পর্কে প্রণালীবদ্ধ কোনো বিস্তৃত আলোচনা ছিল না; বাংলা ছন্দের কয়েকটি প্রচলিত নাম, যেমন—পয়ার, ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতির উল্লেখ ও উদাহরণ প্রাচীন ব্যাকরণ-গ্রন্থের শেষাংশে দেখা যেত। বলা বাহুল্য, ছন্দ সম্পর্কে সে-আলোচনা এতটুকুও উপযুক্ত ছিল না।

ছন্দ সম্পর্কে আমাদের—সাধারণ মানুষের বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রায় ছিলই না। এমনকি স্কুল-কলেজেও ছন্দ-বিষয়ে যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাতেও বড়-জোর ছন্দ সম্পর্কে একটা স্থূল পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া হতো। ইতস্ততঃভাবে কয়েকজন বিদ্বজ্জন দু'-চারটে নামকরা পত্রপত্রিকায় ছন্দসম্পর্কিত প্রবন্ধ লিখতেন; তাতে বোঝা যেত বাংলা ছন্দ সম্পর্কে একটা জিজ্ঞাসা শুরু হয়েছে। তাতে এ-কথাও স্পষ্ট হয়েছিল যে ছন্দের বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত কিছু সিদ্ধান্তের দ্বারা ছন্দের রূপ, সংজ্ঞা এবং উপজীব্য বিষয়গুলির প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' নামে যে বিরাট আকৃতির বইটি আছে—তার কিছু প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের নানা দিক নিয়ে, ছন্দের সমস্যা, প্রকরণ, রূপরীতি, মাত্রারহস্য প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় প্রবোধ-চন্দ্র সেন মশাইও ছন্দবিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছিলেন—এবং তিনি রবীন্দ্র-নাথের কাব্যোল্লেখ করে ছন্দের নির্মাণে এবং ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক

দান বিষয়ে একটি মূল্যবান্ গ্রন্থও রচনা করেন।

কিন্তু ছন্দের পড়ুয়া যারা—যারা বাংলা ছন্দকে রপ্ত করতে নয়, জানতে চায়—তাদের কাছে প্রথাসিদ্ধভাবে এবং প্রণালীগত উপায়ে ছন্দোবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা চাই। ছন্দের বৈজ্ঞানিক দিকটা—বিশেষ করে গঠনের ব্যাপারটা জানা দরকার। ছন্দের রীতি ও লয়, এবং পরে মাত্রা—এইসবের আবশ্যিক তথা প্রাথমিক জ্ঞান চাই।

এইসব দিক বিচার করে অমূল্যধন 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি এই গ্রন্থে বাংলা ছন্দের তিন রীতি, সেই রীতির কি লয়, এবং রীতি-বৈচিত্র্যের সঙ্গে মাত্রা-গণনার পদ্ধতির ভিন্নতা নিয়ে শুধু হাল্কা আলোচনার দ্বারা বাংলা ছন্দের বিষয়ে একটা পথ দেখিয়ে ক্ষান্ত হননি। বাংলা ছন্দের মূল প্রকৃতিটি কী, কোথা থেকে এর উদ্ভব—সে-সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে ছন্দ সম্পর্কে প্রথম বৈজ্ঞানিক রীতিতে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনার জন্যে সর্বস্তর থেকেই গ্রন্থকারের ওপর অভিনন্দন বর্ষিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও এই গ্রন্থটিকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট ছন্দোভাবনা ছিল, সেই ভাবনার বৈচিত্র্য নিয়ে তিনি নানা সময়ে নানা কথা লিখেছেন, মনের নানা সংশয় প্রকাশ করেছেন, নানা-রকম প্রশ্ন তুলেছেন। এমনকি ছান্দসিক অমূল্যধনের সঙ্গে ছন্দোগুরু রবীন্দ্র-নাথের বহু বিষয়ে বিতণ্ডাও হয়েছে। অমূল্যধন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিগুরুর ছন্দোবিষয়ক বিবিধ সংশয়ের নিরসন ঘটান।

উদাহরণ হিসাবে অনেক রচনারই উল্লেখ করা চলে। আমি শুধু এখানে নয় মাত্রার পর্ব-সম্পর্কিত আলোচনার কথাটিই পুনরাবৃত্তি করছি। ১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসের 'বিচিত্রা' কাগজে (স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পা-দিত) নয় মাত্রার পর্ব সম্পর্কে একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন অমূল্যধন। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে, বাংলা কবিতায় চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট ও দশ মাত্রার পর্ব দেখা গেছে, কিন্তু নয় মাত্রার পর্ব দেখা যায় না ; বাংলা কবিতায় নয় মাত্রার পর্ব রচনা করা যায় কি যায় না—এই নিয়ে অমূল্যধনের প্রশ্ন ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঐ বছরের কার্তিক মাসের 'বিচিত্রা'য় বাংলাভাষায় নয় মাত্রার পর্বের ছন্দ খুব চলে বলে রায় দেন, এবং নিজের লেখা কিছু কবিতা থেকে উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। কিন্তু অমূল্য-

ধনের প্রশ্ন ছিল ন'মাত্রার পর্ব দিয়ে ছন্দোবদ্ধতার ওপর; আর রবীন্দ্রনাথ ন'-মাত্রার পর্ব দিয়ে একটি পূর্ণচরণের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনার ধারাকে টেনে নিয়ে গেছেন। ফলে উভয়ের প্রসঙ্গ ভিন্ন হয়ে দাঁড়ালো। রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিলেন ন'মাত্রার পর্বযুক্ত চরণের; কিন্তু প্রশ্নটা হলো ন'মাত্রা দিয়ে কোনো পর্ব রচিত হয় কিনা। রবীন্দ্রনাথ যে উদাহরণ দিলেন—অমূল্যধন সে উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে তা ন'মাত্রার একটি পর্ব নয়, ন'মাত্রার একাধিক পর্বের একটি চরণ। রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ ছিল :

আঁধার রজনী পোহাল,
জগৎ পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত কিরণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।

এখানকার চারটে পঙ্‌ক্তিতেই কিন্তু ন'মাত্রা করে আছে। এই উদাহরণ দেখে অমূল্যধন প্রশ্ন তুলেছেন—এখানে এই ন'মাত্রায় কি একটি পর্ব হয়েছে? পঙ্‌ক্তির শেষে যে যতি আছে তা অর্ধযতি না পূর্ণযতি? জিভের ঝোঁক কি পঙ্‌ক্তির সমাপ্তিতে শেষ হয়েছে, না আগে কোনো জায়গায় শেষ হয়ে আবার নতুন ঝোঁকের আরম্ভ হয়েছে?

অমূল্যধন পঙ্‌ক্তিগুলির ছন্দোলিপি করলেন এইভাবে :

আঁধার রজনী | পোহাল,
জগৎ পূরিল | পুলকে,
বিমল প্রভাত | কিরণে
মিলিল দ্যুলোক | ভূলোকে।

অর্থাৎ মূল পর্ব হলো ছ'মাত্রার এবং প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির শেষে তিন মাত্রার একটি অপূর্ণপদী পর্ব আছে। এখানে মাত্রা-সংখ্যা গণনা এইরকম— (৬+৩)+৩ (অপূর্ণপদী পর্ব)। অন্য আর একটি উদাহরণ সম্পর্কেও অমূল্যধন ছন্দোবিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে সেখানেও ছ'মাত্রার পূর্ণপর্ব এবং তিনমাত্রার অপূর্ণপর্ব রয়েছে। উদাহরণটি এইরকম :

গোড়াতেই ঢাক | বাজনা
কাজ করা তার | কাজ না

রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অন্য উদাহরণও একাধিক পর্বে অমূল্যধন ভেঙেছেন,

যেমন—

১. আসন দিলে | অনাহূতে
ভাষণ দিলে | বীণাতানে,
বুঝি গো তুমি | মেঘদূতে
পাঠায়ে দিলে | মোর পানে।

এখানে মূল পর্ব পাঁচ মাত্রার, আর অপূর্ণ পর্ব চার মাত্রার।

২. বলেছিনু | বসিতে কাছে
দেবে কিছু | ছিল না আশা,
দেবো বলে | যে জন যাচে
বুঝিলে না | তাহারো ভাষা।

এখানেও অমূল্যধন প্রতি চরণের ছন্দোলিপি করেছেন চারমাত্রা এবং পাঁচ-মাত্রার দুটি পর্ব দেখিয়ে দিয়ে।

অবশ্য ঐ প্রবন্ধের শেষে অমূল্যধন স্বীকার করেছেন যে ন'মাত্রার পর্ব হওয়ার বাধা যে আছে—তা নয়, তবে বাংলা কবিতায় এখনো তা দেখানো যায়নি। এগারো কিম্বা তেরো কিম্বা তারও বেশী মাত্রার পর্ব নিয়ে বাংলা কবিতা লেখা হতে পারে বলে রবীন্দ্রনাথ যে উদাহরণ দিয়েছেন—তাদের ছন্দোলিপি করে অমূল্যধন দেখিয়েছেন যে পর্ব আট মাত্রার মধ্যেই থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ :

চামেলির ঘনছায়া | বিতানে
বনবীণা বেজে ওঠে | কী তানে।
স্বপনে মগন সেথা | মালিনী
কুসুম মালায় গাঁথা | শিথানে।

এখানে (৪+৪) পর্ব এবং তিন মাত্রার অপূর্ণপদী পর্ব রয়েছে—এইভাবে ছন্দোলিপি করে দেখিয়ে দিলেন অমূল্যধন যে এগারো মাত্রার পর্ব এটি নয়। তেরো মাত্রার পর্ব সম্বন্ধে ওই একই কথা খাটে :

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা,
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।

এখানকার পঙ্‌ক্তি বা চরণ তেরো মাত্রার, কিন্তু এই চরণে দুটি করে পর্ব রয়েছে, আট মাত্রার ও পাঁচ মাত্রার।

ছন্দ সম্পর্কে অমূল্যধন একটা বৈজ্ঞানিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। বাংলা ভাষার ছন্দের শ্রেণী বিভাগ করে যে তিনটি নাম আমাদের ছাত্রদের শেখানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে—তানপ্রধান (অক্ষরবৃত্ত), ধ্বনিপ্রধান (মাত্রা-বৃত্ত) এবং শ্বাসাঘাতপ্রধান (স্বরবৃত্ত), এই তিন রীতির ছন্দের লয়ও যথাক্রমে ধীর, মধ্যম বা বিলম্বিত এবং দ্রুত নামে পরিচিত হয়েছে। কেন তানপ্রধান ছন্দের লয় ধীর, মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দ কেন মধ্যম লয়ের আর ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসাঘাতপ্রধান দ্রুত লয়ের কেন—তা বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে অমূল্যধন দেখিয়ে দিয়েছেন; এবং এ বিষয়ে কোনো তর্ক, সংশয় বা দ্বিমত দেখা যায়নি। এই তিন রীতির ছন্দের নামগুলি বহুলপ্রচারিত এবং সর্বজনস্বীকৃত। বর্তমানে কোনো কোনো শ্রদ্ধেয় ছান্দসিক এইসব নামকরণের পরিবর্তে নতুন নাম প্রবর্তন করার সুপারিশ করেছেন। যে নাম চলে এসেছে, এবং সকলের পরিচয় ঘটেছে যেসব নামের সঙ্গে—সেগুলির পরিবর্তনে ছন্দের ব্যাপারে আবার দুরূহতা আসবে। একেই ছন্দঃশাস্ত্রটি সহজে রপ্ত করার বিষয় নয়, শব্দোচ্চারণের সূক্ষ্ম ধ্বনিবৈষম্য শ্রুতিতে লঘু বা গুরু— কেমন করে বাজে—তার ওপরই ছন্দোবোধ দাঁড়িয়ে থাকে (যেমন—'ঘুম পাড়ানী মাসীপিসী ঘুম দিয়ে যাও'—এই পঙ্‌ক্তির দু'টি ঘুমের 'ঘু' যে একই ধ্বনির স্রষ্টা নয়, প্রথম ঘুমের 'ঘু' লঘুত্বের সূচনা করছে, কিন্তু শেষের ঘুমের 'ঘু' প্রথম 'ঘু' অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গৌরবের অধিকারী—সেটা ধরার মতো শ্রুতি-তীক্ষ্ণতার ওপর ছন্দো-জ্ঞান নির্ভর করে), তদুপরি নাম (terminology) নিয়ে আরও বিশৃঙ্খলতা এলে সাধারণ মানুষের ছন্দ সম্পর্কে আগ্রহ জাগার বদলে ভীতির সঞ্চার হতে পারে। ছন্দঃশাস্ত্রে Syllable-কে 'অক্ষর' বলে, সম্প্রতি অক্ষরের বদলে 'দল' বলার সুপারিশ হচ্ছে কোনো কোনো মহলে, কেননা অক্ষরের অন্য একটা অর্থ আছে, অর্থাৎ অক্ষর হলো হরফ। দলেরও তো অন্যার্থ রয়েছে। পরিচিত এবং সুপ্রচলিত পরিভাষা বদলের ঝুঁকি ও সমস্যা তখনই গ্রহণযোগ্য হয়—যখন সেই পরিবর্তন অনিবার্য বলে ঠেকে। ছন্দঃশাস্ত্রের পরিভাষা বদলের তেমন কোনো প্রয়োজন কি উপলব্ধ হয়েছে ?

অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত—এই তিন শ্রেণীর ছন্দের নামোল্লেখ সত্যেন্দ্র-নাথ দত্তের 'ছন্দসরস্বতী' প্রবন্ধে রয়েছে, এবং এদের প্রতিশব্দ হিসাবে তান-প্রধান, ধ্বনিপ্রধান ও শ্বাসাঘাতপ্রধান—এই তিনরকম ছন্দের নামও চলে

আসছে। এবং এই তিনটি নামের পেছনে যুক্তিও বড় কম নয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পর্ব সবচেয়ে দীর্ঘ হয়, তাই এর গতিও ধীর। পর্বের দীর্ঘতার জন্যে অক্ষরগুলির উচ্চারণে মন্থরতা আসে, এর ফলে উচ্চারিত ধ্বনির মধ্যে একটা তান এসে যায়। পর্বদৈর্ঘ্যই এই তানের সৃষ্টি করে ; সেইজন্যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে তানপ্রধান বলার মধ্যে যুক্তি যথেষ্ট আছে, এবং কবিকুল ও ছন্দঃশিক্ষার্থী—সকলের কাছেই তান-প্রধান ছন্দের স্বীকৃতি এবং পরিচিতি ঘটেছে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অন্য নাম ধ্বনিপ্রধান ছন্দ—এটি সর্বজন-স্বীকৃত ; এবং এই স্বীকৃতির পেছনে জোরালো যুক্তিও আছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রত্যেকটি শব্দই স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়, প্রত্যেক চরণের পর্বগুলিতে প্রতিটি অক্ষরধ্বনিই প্রাধান্যলাভ করে—তাই একে ধ্বনিপ্রধান ছন্দ বলা হয়েছে ; এখানে শব্দধ্বনির অতিরিক্ত কোনো সুর বা তান থাকে না।

স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দের প্রতি পর্বের গোড়ার অক্ষরে একটা ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত পড়ে—তাই ছন্দ শ্বাসাঘাতপ্রধান নামেও চিহ্নিত হয়েছে।

অমূল্যধন তাঁর ছন্দের গ্রন্থে 'ছন্দে রীতি' নামক প্রবন্ধে এ-বিষয়ে বিস্তারিত ও সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি ছন্দের শ্রেণী-বিভাজন নিয়ে ঠিক নয়, এই তিন শ্রেণীর ছন্দের পুরানো নাম তুলে দিয়ে নতুন নামকরণের চেষ্টা শুরু হয়েছে,—এতে ছন্দের বিষয়ে ফের না বিশৃঙ্খলতা আসে। বাংলা ছন্দঃশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোচনা প্রায় সত্তর-আশী বছর হতে চললো—এখনো ছন্দোলিপি-নির্ণয়ে স্থৈর্য এবং সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি দু-একটি ক্ষেত্রে, সেখানে ছন্দের ব্যাপারে চেনা ও পরিচিত নামের বদলে অন্য নাম দিলে বিহ্বলতার সৃষ্টি হবে কিনা—তা আগে ভেবে দেখতে হবে।

অমূল্যধন নিশ্চয়ই ছন্দ সম্পর্কে শেষ কথা বলে যাননি, বলা তাঁর পক্ষে কেন, কারো পক্ষেই সম্ভব নয় ; তবু তিনি ছন্দের বিষয়ে যে একটা বৈজ্ঞানিক পথরেখা অঙ্কিত করেছেন এবং সেই পথে চলাচলও যে সহজসাধ্য হয়েছে সকলের পক্ষে, তাতে আরো নতুন সংযোজন নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে, কিন্তু প্রচলিত ও স্বীকৃত পথরেখা মুছে সেখানেই ভিন্ন নামের রচনার যুক্তির সারবত্তা কী—তা হয়তো চট করে বোঝা যাবে না।

অনাগতকাল পড়ে আছে, নতুন কবিও আসবেন, নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা নিয়ে, ছন্দের ধার ও ভার পাল্টাবে, ছন্দঃশাস্ত্রও সেই অনাগত ঋদ্ধিকে

গ্রহণ করার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে, থাকবে—কিন্তু যাঁর যা পাওনা, যাঁর যা দান—তা যেন আমরা মুক্তকণ্ঠে উদাত্তস্বরে ঘোষণা করতে পারি।

যাবৎ বাংলা ছন্দের আলোচনা, তাবৎ অমূল্যধনের চিরজীবিতা অনস্বীকার্য। এই কথা বলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানত প্রণাম জানিয়ে আমার এই লেখা শেষ করি।

বাংলা ছন্দে ঐক্যসূত্রসন্ধানী অমূল্যধন

প্রণব মিত্র

আমার জানা নেই, সৎ-খ্রীষ্টানের কাছে "WORD" শব্দটি যে পরম মূল্যের দ্যোতনা আনে, তার সঙ্গে বৈদিক "বাক্", কিংবা পৌরাণিক শব্দ-ব্রহ্মের কোন সুদূর তুলনাও সম্ভব কিনা, পরন্তু এ-সত্য স্বতঃই স্বপ্রকাশ বলে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না যে, মানবজাতির সাংস্কৃতিক জন্মলগ্ন শব্দ ও ধ্বনির অলৌকিক প্রতিভায় উদ্ভাসিত। এবং সাহিত্যে নিহিত সেই শব্দ ও ধ্বনি যে পৃথিবীর তাবৎ আদি-কাব্যে কোন-না-কোন ভাবে ছন্দের উপকরণ সে-কথাও সত্য। তাছাড়া চিন্তা ও অনুভবের স্বল্পমাত্র বিস্তারেও ছন্দ-সংলগ্ন তাত্ত্বিকতা তথা অনুভবকে একটি সুগভীর গুহাহিত দার্শনিকতায় প্রস্থত করে দেখাও সম্ভব বলে মনে হয়। বিশ্ব-ছন্দ এবং বিশ্ব-সুরের (Music of the Sphere) ধারণাটি একদা ইউরোপীয় দার্শনিক মহলে যথেষ্ট সমথিত ছিল এবং কাব্য ও ঐতিহ্য-বিচারে এই নীতি যে কতদূর প্রভাবশালী ছিল তা একদা দেখিয়েছিলেন টয়েনবি। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, মানুষ তথা ইতরেতর পশুবংশকে, প্রতি-পদক্ষেপে যে একটা অন্তর্লীন প্রাকৃত ছন্দচেতনার অনুসরণ করতে হয় জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, তাই উন্নত সৃজনশীল চিত্তে, যে-কোন শিল্প-মাধ্যমেই হোক না কেন, একটি নবোন্মেষের বার্তাবহ হয়, ধর্মীয় অনুশব্দ ব্যবহার করলে যাকে প্রায় একটি ঐশী উন্মোচনের সমগোত্র মনে হতে পারে ; বোধহয় কবি ও ঋষির শব্দার্থ-স্বারূপ্যের এ-ও এক কারণ। ঋষি যে কারণে দ্রষ্টা কবিও সেই কারণেই প্রণম্য কারণ ছন্দের বাক্ তাঁর তৃতীয় নেত্রের অগোচর নয়। আলঙ্কারিক দেখিয়েছেন রস ও কথা মহাকবির এক প্রযত্নেই সিদ্ধ, এবং সকলেই জানেন, কথার পঞ্চপ্রদীপের পঞ্চম প্রদীপটিই হলো ছন্দ। সুতরাং বোঝা কঠিন নয় যে, ছন্দোসিদ্ধির জন্য কবিকে বিশেষ কোন তন্ত্রসাধন করতে হয় না, এবং যদি কোন মানবিক দুর্বলতায় কোন কবি কেবল ছন্দতান্ত্রিক হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁর ভাগ্যে ইতরজনের উচ্চ করতালি সহজলভ্য হলেও রসিকের স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত অপ্রাপ্যই থেকে যায়। অথচ আশ্চর্য এই যে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী আগের অনেক খ্যাতনামা কবির কাব্যসিদ্ধিও কেবল ছন্দোসিদ্ধির পরিমাপেই নিয়ন্ত্রিত হতো। তাই একথা স্মরণ করে আমি

দুঃখিত না হয়ে পারিনা যে, সত্যেন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাধর কবির সামগ্রিক মূল্যায়নের পরিবর্তে কোন কোন মহলে তাঁর পরিচয় কেবল "ছন্দের যাদুকর" কিংবা "ছান্দসিক" উপনামেই উল্লিখিত। অপিচ রবীন্দ্রানুসারী কবিদের অনেকেরই সরল স্নিগ্ধ পরিশীলিত গ্রাম্যতার কল্পজগতে সত্যেন্দ্রোপম ছন্দসিদ্ধিই প্রায় আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গের তুল্য ছিল এবং আজকের পরিবর্তিত দৃশ্যপটে তাঁদের এই মানবক-চাপল্য শুধু গ্রাম্য স্ত্রীলোকের অলঙ্কার-বিলাসিতা কিংবা শিশুর খেলনা-প্রিয়তার সঙ্গেই তুল্যমান। বলা বাহুল্য, কাব্যছন্দের স্বতোৎসারিতার পরিবর্তে তাঁদের ছন্দ-মনস্কতা অনেকক্ষেত্রেই পরিণত হয়েছিল গতানুগতিক মুমুক্ষুর নিছক আচারনিষ্ঠার মতোই সচেতন ছন্দাচারণে।

এ অবস্থায় ছন্দতাত্ত্বিকতা শেষপর্যন্ত বর্তমান শতকের তৃতীয় দশক থেকেই শিক্ষায়তনিক কোন কোন বিদগ্ধজনের অভিনিবেশ ও সন্ধিৎসা আকর্ষণকারী হয়ে পড়ে, এবং তখন থেকেই সচেতন গবেষণায় ছন্দতত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত হতে চায়। এই ধারায় সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দসরস্বতী' এবং রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ-গুলির মূল্য সকলেই স্বীকার করবেন, কিন্তু এঁরা কেউই সিদ্ধ-অর্থে শিক্ষায়তনিক পণ্ডিত ছিলেন না বলেই বোধ হয় বিজ্ঞানীর যথার্থ বিবিক্তি আয়ত্ত করতে পারেননি, এবং সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্য রূপকের অপূর্বতায় আমাদের যতটা টানে বিচারে ততখানি বিভ্রান্ত করে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই ছন্দোরহস্যের অনেক জটিলতার ওপর সন্ধানী আলোর সম্পাত ঘটালেও তাঁর সব হিসাব সুস্থির ছন্দ-বিজ্ঞানীরা আজও মেনে নিতে পারেননি ; কিন্তু একথা ঠিক যে সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ঋণকে শ্রদ্ধায় শিরোধার্য না করেও ছান্দসিকদের উপায় ছিল না। সুতরাং বাংলা ছন্দের গবেষণায় শ্রদ্ধেয় কবিদ্বয়ের অনুভববেদ্য উন্মোচন, হাজার বছরের পরিকীর্ণ সাহিত্যিক উপকরণ এবং স্বকীয় বিচার-বিবেকের হাতিয়ার, এই ত্রিস্তর অনুসরণ শেষপর্যন্ত ছান্দসিকের সাধ্য-সাধন হয়। বাঙালীর ছন্দ-চর্চার এই ইতিহাস থেকে আরো যে-সত্য স্বতঃই বিচ্ছুরিত হয়ে আসে তা হলো এই যে, আদৌ যা ছিল কেবল কবিজনের স্বজ্ঞাতাড়িত উন্মোচন, তা ক্রমশই একটি সচেতন বুদ্ধিচর্চার বিষয় হয়ে পড়েছে বলেই বিশুদ্ধ নান্দনিক অভিজ্ঞতার বদলে তার্কিকতা, এবং সংশ্লেষের পরিবর্তে বিশ্লেষ ক্রমেই আসর অধিকার করে বসে। বস্তুতঃ স্বজ্ঞা থেকে বুদ্ধিতে উত্তরণ যে আধুনিকতার মাপকাঠি, এবং মানস-পরিণতির স্বধর্ম একথা কেউই অস্বীকার করবেন না, তাছাড়া তার্কিক বিরোধ

যে শেষপর্যন্ত সত্যের সঙ্গমেই পৌঁছে দেয়, সে-কথাও বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে সুস্পষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয় একজন নৈর্ব্যক্তিক ছাত্র হিসাবেই বলতে পারি, বাংলা ছন্দের সেই সঙ্গম-সিদ্ধি এখনও ঘটেনি এবং কখনও ঘটবে কিনা বলা শক্ত।

এপর্যন্ত যাঁরা ছন্দ-চর্চায় ব্রতী হয়েছেন তাঁদের সকলের নামের মালা জপে লাভ নেই এবং ছন্দ-বিতর্কের যে পরিবেশকে একদা সুধীন্দ্রনাথ দূর থেকে নমস্কার করেছিলেন, তার ইতিহাস খুঁড়েও পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই হবেনা। কিন্তু মনে হয় আচার্য অমূল্যধনের স্মরণে আজ কিছু স্পষ্টকথার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। আক্ষেপের সঙ্গে একথাও স্বীকার না করে উপায় থাকেনা যে তাঁর গুণমুগ্ধ শিষ্য ও ছাত্ররা এ-বিষয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন না করায় বাংলা ছন্দের গবেষণায় অমূল্যধনের পরম আবিষ্কারটি আজ প্রায় বিস্মৃত হতে চলেছে এবং এতে আচার্যের কোন ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের। অবশ্য এ-ব্যাপারে স্বর্গত আচার্যের প্রচারবিমুখতাও অন্যতম কারণ, যেহেতু গবেষণার ঊর্ধ্বতন রাজ্যে নিয়ত পরিক্রমণশীল সেই অসামান্য মনীষা, একদিকে যেমন জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কোন সুলভ খ্যাতির প্রত্যাশায় উন্মুখ হননি তেমনি গবেষণাকেও তিনি সাধারণ স্তরে নিয়ে আসতে চাননি। ইতিমধ্যে কেবল বাংলা ছন্দের ব্যাপারেও তিনি ঐকান্তিক না থেকে সংস্কৃত ছন্দ-চর্চায় যে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটান তাও কেবল উচ্চকোটিক গবেষণাপত্রেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়, ফলে তিনি হয়ে পড়েন ব্রাউনিং-বর্ণিত সেই বিরল বৈয়াকরণদের সগোত্র :

…still loftier than the world suspects
Living and dying

আসলে অমূল্যধন চেয়েছিলেন বাংলা ছন্দের একটি মূল-সূত্রের সন্ধান করতে, যাতে এই ভাষার প্রাচীন এবং আধুনিক সমস্ত ছন্দপ্রকরণ একটি একক-বিজ্ঞানসম্মত ঐক্যে বিধৃত হতে পারে, কারণ প্রথম থেকেই তাঁর ধারণা ছিল যে ছন্দের লয়দারি জাতি-নির্ণয়ে সাহায্য করলেও কোন মূল ঐক্যসূত্র আবিষ্কৃত না হলে ছন্দের বিজ্ঞান অনায়াত্তই থেকে যাবে। এ সম্পর্কে 'পরিচয়' পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয় :

"নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে অমূল্যধনের মতই বেশী যুক্তিবান; কারণ

একই ভাষায় মাত্রাগণনার পদ্ধতি ত্রিবিধ এমন পরিকল্পনা তো পীড়াদায়ক বটেই, এমন কি তা গায়ে সয়ে গেলেও প্রয়োগের বেলায় দেখি যে অধিকাংশ প্রাচীন কবিতাই এই ত্রিধা আদর্শের বহির্ভূত থেকে গেল।"

বস্তুতঃ এ-ধরনের একটি ঐক্য-সন্ধানের প্রবেগ যে 'ছন্দসরস্বতী'র লেখককেও প্রশ্নাতুর করেছিল তার প্রমাণ সত্যেন্দ্রনাথের সেই জিজ্ঞাসা—

'আচ্ছা এই অক্ষর গোনা ছন্দ এবং syllable বা শব্দ-পাপড়ী গোনা ছন্দ, মূলে কি এক জিনিষ নয় ?'

কিন্তু দুঃখের কথা, সত্যেন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত নিজেও এ-সন্ধানে নিরত হননি, পরন্তু যাবৎ ছন্দকে ছন্দসরস্বতীর 'চুটকি অঙ্গের ছন্দ মাত্র' জেনেও তিনি সমগ্র অঙ্গের ধ্যানে আসেননি, বরং ছন্দের নতুন নতুন ছাঁচ ও লয়দারি গড়তেই তাঁকে নিবিষ্ট দেখা যায়, তবু বিভিন্ন বিদেশী ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের তুলনায় তিনি যে-সব কথা বলেছেন তার মধ্যে পূর্বোক্ত একটি ঐক্যসূত্রের আভাসই ফুটে ওঠে। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দময়ী হেসে বলেছিলেন :

"লম্বকর্ণদের কান নেই, তারা ছন্দের ভিতরকার সুর ধরবে কি করে ?" অমূল্যধন এই ভিতরকার সুর-সন্ধানে বাংলা ছন্দের লয়দারি, পর্ববন্ধন, এবং মাত্রা ও অক্ষরের সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত ধারণায় আসতে চান এবং তখনই তাঁর দৃষ্টিতে সংস্কৃত ও ইংরেজি ছন্দের তুলনায় বাংলা ছন্দের একটি একক রহস্য ধরা পড়ে, যথা :

'পর্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ'।

ফুলের তোড়া নানা কায়দায় সাজানো যায় ; কিন্তু পর্বের সঙ্গে পর্ব সাজিয়ে যে-রূপই সৃষ্টি করা যাক না কেন, সেই সমগ্র রূপের মূল রহস্য নির্ভর করে পর্ব ও পর্বাঙ্গের প্রতিস্থাপনার ওপর। এই হলো তাঁর বিখ্যাত পর্ব-পর্বাঙ্গবাদ—

'আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, ভারতীয় সঙ্গীতের মত বাংলা প্রভৃতি ভাষার ছন্দের ভিত্তি Bar ও Beat, এইজন্য এই সূত্র-পরম্পরাকে সংক্ষেপে The Beat and Bar Theory বা পর্ব-পর্বাঙ্গবাদ বলা যাইতে পারে।'

আমরা এখানে তাঁর ছন্দতত্ত্ব-আলোচনায় আগ্রহী নই কারণ সে-তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর অনায়ত্ত নয়, পরন্তু আমরা এই ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারিনা যে আজ পর্যন্ত অমূল্যধনের এই থিসিস্-এর সযৌক্তিক খণ্ডন দুর্লক্ষ্য হলেও তাঁর মূলতত্ত্ব-

সম্পর্কিত যে-কোন বিচারকে সযত্নে ও কৌশলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা যথেষ্ট সুলভ। অথচ এর দরকার ছিল না। কারণ অমূল্যধন অতি অল্প কথায় যে সূত্রগুলির সন্ধান করেছেন পরবর্তী গবেষকের আয়াসে সেগুলির আরো বিস্তার এবং পরিমার্জনা সম্ভব হলে বাংলা ছন্দের গবেষণা একটি খাঁটি বিজ্ঞানে পরিণত হতে পারত। আচার্য অমূল্যধন জানতেনই যে, ছন্দশাস্ত্রীর সঞ্চার-পরিসর, ধ্বনিতত্ত্ব-ভাষাতত্ত্ব-শিল্পতত্ত্ব এমনকি সমাজতত্ত্বেও প্রসারিত; তাছাড়া সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্গে ছন্দশাস্ত্রের তুলনার আভাস তাঁর লেখায় পাওয়া যায়।

বাংলা ছন্দের গবেষণার ধারাকে প্রধানত দুটি ভাগে বিভাজ্য মনে করা চলে। একটি যদি হয় বর্ণনামূলক তথা ঐতিহাসিক, অন্যটি তবে সংশ্লেষণ-মূলক। ছন্দ-গবেষণায় আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন প্রথম ধারার অনুবর্তীরূপে যে তথ্য এবং বিশ্লেষণ রেখে গেছেন তার মূল্য অপরিসীম। প্রধানত রবীন্দ্রনাথের ছন্দকে বিশ্লেষণ করে তাঁর প্রাথমিক পদক্ষেপ সূচিত হলেও পরে প্রাচীন ও আধুনিক কবিদের ছন্দসৃষ্টিও তাঁর প্রযত্নে সুবিন্যস্ত, এবং এই ব্যাপারে তাঁর ইতিহাসমনস্কতাও অত্যন্ত কার্যকর।

সেই বিশ্লেষণ এবং শ্রেণীকরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের আর একটি অবদান পরিভাষা-চর্যায় বিন্যস্ত যা তাঁর দীর্ঘকালের অনুসরণে নিয়ত বিবর্তন-শীলও বটে। তিনি জানতেন এ কাজ সহজ নয় এবং ব্যাপারটির গুরুত্ব লক্ষ্য করেই তিনি একদা লেখেন: "সুষ্ঠু পরিভাষা একাধারে স্বচ্ছচিন্তার প্রতীক এবং সমগ্র ছন্দশাস্ত্রের সংহত রূপ"।

এই পরিভাষা সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি ১৩৫৫ সালের মাঘ মাসে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লেখেন তার অনুলিপি বহু বিদগ্ধজনের কাছে প্রেরিত হয় এবং কোন পক্ষ থেকেই কোন 'সুনির্দিষ্ট অভিমত' পাওয়া না গেলেও কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য উত্তর আসে, যার ভিত্তিতে বাংলা ছন্দের পরিভাষা ক্রমশই প্রবোধ-চন্দ্রের একক চেষ্টায় নতুনতর বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলে। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে মাত্রা, অক্ষর, পর্ব, স্বর ইত্যাদি মূল শব্দগুলি সংস্কৃত থেকে সংকলিত হলেও প্রবোধচন্দ্র তাঁর নিজের চিন্তায় পরিভাষায় পরিবর্তন এনেছেন এবং সে-পরিবর্তন একদিনে আসেনি। ফলতঃ তিনি প্রথমদিকে যেসব পরিভাষাকে অপরিবর্তনীয়-ভাবে প্রামাণ্য মনে করেছেন, পরে সেগুলিরও অন্যবিধ নামকরণে তাঁকে নিরলস

সন্ধানী দেখা যায়। যেমন 'সিলেব্‌ল্‌'-কে প্রথমে 'অক্ষর' হিসাবে মেনে নিয়েও পরে তিনি 'দল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃতে 'সিলেব্‌ল্‌' অর্থে 'অক্ষর' গৃহীত হলেও অন্যত্র বর্ণ ও অক্ষর সমার্থক হয়েও পড়ে, তাই প্রবোধচন্দ্র চাইলেন একটি নতুন পরিভাষা তৈরী করতে। তবু এ সম্পর্কে তাঁর যুক্তি বহুবিস্তৃত হলেও এবং বহুজনগৃহীত হলেও, সম্পূর্ণ অভেদ্য কিনা সে-সংশয় আজও থেকে যায়। আসলে সত্যেন্দ্রনাথের 'পাপড়ি' প্রবোধচন্দ্রে 'দল' হয়েছে। এ-মত কিন্তু সুনীতিকুমার বা সুকুমার সেন মেনে নিয়েছেন এমন মনে হয়না। ডঃ সেন তাঁর ভাষাতত্ত্বের বইতে এখনো 'অক্ষর' শব্দেরই ব্যবহার রেখেছেন দেখেছি। এরপর আসে 'মাত্রা' শব্দটি যা প্রবোধচন্দ্রের পরিভাষায় 'কলা'। ডঃ সুকুমার সেন কিন্তু উক্ত গ্রন্থে 'মাত্রা' শব্দই গ্রহণ করেছেন। তবে এতে বিশেষ কিছু যায় আসে না, যেহেতু মহাকবি আগেই বলে গেছেন যে, গোলাপকে যে নামেই ডাকা যাক না কেন, সে গোলাপই। প্রবোধচন্দ্র বাংলা ছন্দের তিনটি রীতি স্বীকার করেন এবং সে তিনটি রীতির নামকরণেও তাঁর অস্থিরতা দেখা যায়। এ সম্পর্কে নীলরতন সেন লিখেছেন :

> "যাঁরা নিয়মিত বাংলা ছন্দের চর্চা করে থাকেন তাঁদের অবশ্যই জানা আছে বাংলা পদ্য সাধারণতঃ তিনটি ছন্দোরীতিতে লেখা হয়ে থাকে। এই তিন রীতির পরিচিত নাম মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত (বা মৌলিক ছন্দ)।—এ নামগুলি একসময় প্রবীণ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনই প্রবর্তন করেছিলেন। বর্তমানে তিনি উক্ত ছন্দত্রয়ীকে যথাক্রমে সরল কলাবৃত্ত (সংক্ষেপে কলাবৃত্ত), মিশ্র কলাবৃত্ত (সংক্ষেপে মিশ্রবৃত্ত) এবং দলবৃত্ত নাম দিয়েছেন। অপর বর্ষীয়ান ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় উক্ত তিন ছন্দরীতিকে যথাক্রমে ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান এবং শ্বাসাঘাতপ্রধান নামেই পরিচিত করেছেন।"

নীলরতন পরিভাষার বিতর্কে যাননি—মোটামুটিভাবে প্রবোধচন্দ্রের পরিভাষাই মেনে নিয়েছেন। আমরাও এ-বিতর্কে অংশ নিতে চাইনা, তবে একথা না বলেও উপায় থাকে না যে, প্রবোধচন্দ্রের বারবার পরিভাষার পরিবর্তন কিছু অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি করে, যার ফলে তাঁর সমূহ প্রবন্ধাবলীর মধ্য থেকে সর্বশেষ নিবন্ধটিকে খুঁজে নিতে দেরী হয়। কিন্তু সে-প্রশ্নও থাক।

কথা হলো বাংলা ছন্দের তিনটি রীতিকে মেনে নেওয়া সহজ হলেও

তাদের অন্তরশায়ী একটি সামান্য বৈজ্ঞানিক ঐক্যসূত্রকে অস্বীকারের যুক্তি কোথায়, এ প্রশ্ন অনুচ্চারিত থাকলে শুভবুদ্ধির প্রসারে বিঘ্ন ঘটে। আমরা যখন সংস্কৃত বা ইংরেজি ছন্দের চর্চায় আসি তখন সে-সন্ধিৎসা কেবল বর্ণনা না হয়ে একটা মৌলিক তত্ত্বসন্ধানে আসেনা কি? তাহলে বাংলায় সমান্তরালভাবে তিনটি ছন্দকে স্বীকার করে নিলে আমাদের তাবৎ ছন্দচর্যাও বড় উপরিতল-সঞ্চারী মনে হয়না কি? অথচ অমূল্যধন যখন একদা বাংলার তথাকথিত তিনটি ছন্দকে তিনটি রীতিসিদ্ধ মনে করেও তার অন্তর্নিহিত একটি ঐকান্তিকতার আবিষ্কারে নিরলস, তখন 'পরিচয়' পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ যে কি ভাবে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সে-কথা সকলেই জানেন। এখানে বাংলা ছন্দের ঐক্য-তত্ত্ব সম্পর্কে আচার্য অমূল্যধনের প্রশ্নটিকে আবার নূতন করে স্মরণ করি :

> "বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালী সর্বদাই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দেখিতে পায়। বাংলা ছন্দের জগতে নানাবিধ রীতি (style) থাকিতে পারে—যেমন হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-জগতে গোয়ালিয়রী, জৌনপুরী ইত্যাদি নানাবিধ ঢং আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ছন্দোবন্ধনের কোন একটা মূল নীতি থাকা সম্ভব নয় কি? বাংলার ভাষা ব্যাকরণ ইত্যাদিতে যদি একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে তবে বাংলা ছন্দে থাকিবে না কেন?……তাহার কি কোন সহজবোধ্য মূল সূত্র পাওয়া যায় না?"

সেই ঐক্যসূত্রের সন্ধানী অমূল্যধন লক্ষ্য করেন—বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিকতা যেমন ছন্দ-সৃষ্টির ও ছন্দবোধের প্রাথমিক শর্ত, তেমনি বর্ণ বা হরফের দৃশ্যমানতা কোনমতেই ছন্দবিচারে গ্রাহ্য নয়, অবশ্য তথাকথিত অক্ষরবৃত্তের বা অক্ষরমাত্রিক ছন্দের শৈশব-ধারণা অতিক্রম করে সকল ছান্দসিকই এখন এ-প্রসঙ্গে দ্বিমত নন। তাছাড়া যতির অবস্থান থেকেই যে ছন্দের শ্রুতিবোধ জাগে একথাও বোধ হয় এখন আর আলোচনার অপেক্ষা রাখেনা। অর্ধযতি এবং পূর্ণ-যতির নির্ণয়ে এক একটি পর্ব তৈরী হয় যাকে অমূল্যধন বলেছেন 'বাংলা ছন্দের উপকরণ'। প্রত্যেকটি পর্ব কয়েকটি (২ বা ৩ টি) পর্বাঙ্গে বিভক্ত এবং সবচেয়ে বড় কথা, পর্বাঙ্গগুলির সজ্জায় একটা আরোহ বা অবরোহ ক্রম অবশ্যম্ভাবী না হলে ছন্দ তৈরী হয় না। অমূল্যধন দেখালেন বাঙালীর স্বাভাবিক কথার মধ্যেই স্বরপ্রবাহের একটি গ্রাম থাকে—'প্রতি শব্দের প্রথমে স্বরের গাম্ভীর্য কিছু বেশী হয়, শব্দের শেষে কিছু কম হয়'; আবার পর্বাঙ্গের প্রথম থেকে স্বরের গাম্ভীর্য

শেষে ক্রমিক হ্রাস পায়। সুতরাং দেখা যাবে 'স্বরগাম্ভীর্যের বৃদ্ধি অনুসারে পর্বাঙ্গ বিভাগ করা যায়'। পর্ব-মধ্যবর্তী পর্বাঙ্গের দ্বিত্ব বা ত্রিত্ব সম্পর্কেও তিনি অপূর্ব ইঙ্গিত তুলে ধরেন যে এই ব্যাপারটিও আসলে একটি বিশ্বজাগতিক ছন্দেরই অন্তর্গত এবং তা মূলতঃ বোধ হয় গাণিতিক সামান্য সূত্রের অনুসারী—

"আমাদের পক্ষে এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে গণিতে ২ আর ৩-কে প্রাথমিক জোড় ও বিজোড় সংখ্যা বলা হয় এবং তাহা হইতেই যে সমস্ত সংখ্যার উৎপত্তি তাহা স্বীকার করা হয়। এইরূপ কোন দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে ছন্দোবিজ্ঞানে ২ আর ৩-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা যায়।"

বলা বাহুল্য, লেখক এই ইঙ্গিতটুকুকে বিস্তৃত করেননি; মনে হয় বর্ণনামূলক ছন্দচর্চার সহজপন্থা ছেড়ে এজাতীয় মৌলিক সন্ধানে আজো কেউ প্রাগ্রসর নন। যাই হোক, পর্বাঙ্গগুলির স্বরগাম্ভীর্যের হ্রাসবৃদ্ধি যে-যাদুস্পর্শ তৈরী করে তাই বস্তুতঃ ছন্দের প্রাণ; তাছাড়া আরো বলা যেতে পারে যে, আমাদের দৈনন্দিন বাক্যমাত্রই যে স্পষ্টতঃ ছন্দোময় হয়না (গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দপ্রবাহের কথা মনে রেখেই বলছি) তারও কারণ, সেখানে যতি-পাত থাকলেও তা অনিয়মিত এবং পর্বের গঠনে পর্বাঙ্গের পূর্বোক্ত সূত্রাবলীও সেখানে সুস্থির নয়। অমূল্যধনের মতে পর্ব-পর্বাঙ্গের এবংবিধ বিন্যাস এবং লয়দারির রহস্যের মধ্যেই বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব গুহাহিত; তাছাড়া যেহেতু বাংলায় সংস্কৃত নিয়মে অক্ষর-মাত্রার স্থিরত্ব নেই সেক্ষেত্রে পর্ব-পর্বাঙ্গের এই অভিনিবেশ শুধু অক্ষরবিশেষের মাত্রা-নির্ণয়ে সাহায্যকারী হয়না, অধিকন্তু তার থেকে ছন্দের চালটিও স্পষ্ট হয়ে আসে, অন্যেরা যাকে ছন্দের স্বতন্ত্র রূপ বলেই ধরে নেন। অমূল্যধন কিন্তু প্রথম থেকেই ছন্দে জাতিভেদকে মানেননি এবং এক এক জাতির ছন্দে মাত্রাবিকারের স্বতন্ত্র পদ্ধতিও তাঁর কাছে অনাবশ্যক ও অর্থহীন মনে হয়েছে—

"বাংলায় অক্ষরের (syllable-এর) মাত্রা বাঁধাধরা কিংবা পূর্বনির্দিষ্ট নহে, ছন্দের আবশ্যকতা-মত অক্ষরের (syllable-এর) হ্রস্বীকরণ বা দীর্ঘীকরণ হইয়া থাকে; কিন্তু ছন্দের আবশ্যকতার সূত্র কি, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া, তাঁহারা বাংলায় নানারকম 'স্বতন্ত্র' রীতি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা বাংলা ছন্দকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া 'স্বরবৃত্ত', 'মাত্রাবৃত্ত' এবং 'অক্ষরবৃত্ত' এই তিনটি নাম দিয়াছেন, এবং বলিতেছেন যে, তিনটি বিভিন্ন রীতিতে বাংলায় ছন্দ রচিত হয়।"

বস্তুতঃ অমূল্যধনের ছন্দতত্ত্ব-বর্ণনা আমার উদ্দিষ্ট নয়, কারণ সে-বর্ণনা তিনি নিজেই করে গেছেন; একথাও অবিশ্বাসের কারণ নেই যে যাঁরা তাঁর মত সম্পর্কে অনীহা পোষণ করেন কিংবা সত্যকারের বিতর্কে যাঁরা ভয় পান, তাঁরা সকলেই বিগত আচার্যের মতামত সম্পর্কে সচেতন; কিন্তু এই ভেবে আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনা যে অপরাপর ছান্দসিক অথবা ছন্দবিজ্ঞান-কৌতূহলীর একজনও অমূল্যধনকে পূর্বপক্ষ-বিচারের তোলে খণ্ডন করতে অগ্রসর হলেন না কেন?

এ সম্পর্কে আমি মোটামুটি যেটুকু ধারণা পোষণ করি তা এই যে, যেভাবে প্রবোধচন্দ্রের সুযোগ্য ছাত্ররা গুরুর গবেষণা-মার্গে বিচরণশীল সেভাবে অমূল্যধনের উত্তরসাধক হিসাবে কাউকেই পাওয়া যাচ্ছেনা, এবং এর কারণ অমূল্যধন নিজেই। তিনি যেভাবে তাঁর নিজের নব নব গবেষণায় নিয়ত এগিয়ে গেছেন সে-পরিমাণে তিনি ছাত্র তৈরী করেননি।

দ্বিতীয়তঃ, ছন্দচর্চায় যেভাবে বর্ণনামূলক ধারাটি প্রসারিত হতে পেরেছে সেভাবে মৌল বিশ্লেষণী ধারাটি প্রসারিত হয়নি; হয়নি এই কারণেই যে তার অভাবে যে শূন্যতা থেকে যায় সেটুকু এগিয়ে গিয়েও বিদ্যায়তনিক ছন্দচর্চায় বাধা সৃষ্টি হয়না।

তৃতীয়তঃ, অমূল্যধন ও প্রবোধচন্দ্রের গবেষণা যে পরস্পরবিরোধী, এ-ধরনের একটি ভ্রান্তির বিস্তার—মৌল বিশ্লেষণে অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছে; অথচ একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়, তাঁদের উভয়ের মনন-কৃত্য পরস্পরের বিরোধী তো নয়ই, বরং সদর্থেই পরস্পরের পরিপূরক।

আমাদের আজকের কাজ হলো এই দুই গবেষণার সমন্বিত রূপটিকে আবিষ্কার করা, তাতে কারো ক্ষতি হবেনা কিংবা কোন মনীষী সম্পর্কেই অমর্যাদা প্রকাশ পাবেনা, বরং তাতে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ দিকের উজ্জ্বলতাই পরি-দৃশ্যমান হবে।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ও বাংলা ছন্দ

রঞ্জিত সিংহ

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' শুধু বহু-পঠিত, বহু-আলোচিত প্রামাণ্য ছন্দোবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থই নয়, অগ্রণীর সম্মানও এই গ্রন্থটির প্রাপ্য।

কিন্তু গ্রন্থের আলোচনায় প্রবেশের আগে ছন্দ সম্পর্কে বর্তমানে প্রচলিত কয়েকটি ধারণার উল্লেখ ও আলোচনা করে নিতে চাই। প্রথমত, অধিকাংশের মধ্যেই একটি ধারণা বেশ ভালোভাবে চালু আছে যে আধুনিক বাংলা কবিতা মানেই ছন্দহীন কবিতা। দ্বিতীয়ত, কবিদেরও বলতে শুনি অমুক কবিতাটি ছন্দে লেখা। এইজাতীয় ধারণার কথা শুনলেই সাধারণত মন বিতর্কমুখর হয়ে ওঠে। প্রশ্ন জাগে, আধুনিক বাংলা কবিতা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারীদের পরবর্তী কবিদের কবিতা তবে কি ছন্দহীন ছন্নছাড়া কবিতা বা বর্তমানে ছন্দে লেখেন না যাঁরা তাঁরাও কি সেই ছন্দছাড়া কবিতা রচনার প্রয়াসী? ছন্দে লেখেন বা লেখেন না—এ দুটি কথারই বা তাৎপর্য কি? অনুসন্ধানে জানা যেতে পারে যে, সেই কবিতাকেই ছন্দের কবিতা বলা হচ্ছে যে কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস আছে। শ্বাসাঘাতপ্রধান দ্রুত চাল ও ধ্বনিপ্রধানের বিলম্বিত চালও সুস্পষ্ট স্পন্দনের জন্য ছন্দের কবিতার অভিধা পায়। বর্তমান কবিদের পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয় যে তাঁদের অধিকাংশ কবিতাই অন্ত্যানুপ্রাসহীন মুক্তবন্ধ তানপ্রধান বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কদাচ শ্বাসাঘাতে, ধ্বনিপ্রধানের ব্যবহার কখনোই নয়।

এইসব ভ্রান্তধারণার সঠিক ও নির্ভুল উত্তর আছে 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্রে'। 'দুই যতির মধ্যে কালপরিমাণ বাংলা ছন্দের প্রধান বিচার্য বিষয়। মাত্রা মানেই কালপরিমাণ বা duration।' এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বাংলা ছন্দকে 'পর্ব-পর্বাঙ্গবাদ' নামে অভিহিত করেছেন অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। উক্ত ধারা-গুলির ভ্রান্তিকরতার প্রমাণে এবং সেইসব ভ্রান্তির নিরসনে অমূল্যধনের উপরের উক্তিগুলি প্রকৃষ্ট উত্তর।

ছন্দ সম্পর্কে আরো একটি প্রচলিত অথচ প্রচ্ছন্ন ধারণা আছে যে, ছন্দ যেন কবিতার অলংকার। উপমা-উৎপ্রেক্ষার মতো ছন্দের ক্রিয়া আলংকারিক নয়। অমূল্যধনের ভাষায়, ছন্দ কবিতার প্রাণ। হৃৎস্পন্দনের মতো ছন্দের স্পন্দন।

ভাবের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাণ ও গাম্ভীর্য (intensity) নিয়েই বাংলা ছন্দের কারবার। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় আরো একধাপ এগিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, পদ্যের ছন্দে পর্ব-পর্বাঙ্গ বিভাগ নিয়মিত, গদ্যের ছন্দে যা অনিয়মিত। প্রভেদ শুধু এইখানেই। কিন্তু ছন্দ পদ্যে কেন, গদ্যেরও প্রাণ।

কারণ ছন্দের সঙ্গে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের নিগূঢ় সম্বন্ধ। শারীরিক কারণেই আমরা একনিশ্বাসে পদ্যের একটি চরণ বা গদ্যের একটি বাক্য পড়ে যেতে পারি না। নিশ্বাস একসময় ছাড়তেই হয় প্রশ্বাসগ্রহণের জন্য। এই দুই ক্রিয়ার মধ্যবর্তী ক্ষণটি বিরতিক্ষণ বা যতিক্ষণ। এখানেই একটি পর্বাঙ্গের সমাপ্তি ও নতুন পর্বাঙ্গের সূচনার ইঙ্গিত। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধের একটি বাক্য পর্বাঙ্গের দ্বারা বিভক্ত। পদ্যের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, গদ্যের বাক্য অনিয়মিত যতিচিহ্নে বিভক্ত।

এই গ্রন্থের প্রশংসা বা গুণগান আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির অপেক্ষা রাখে না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থে অমূল্যধনের মতবাদকে প্রতিবাদ করতে গিয়ে পাকেপ্রকারে তাঁর মতবাদকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তর্ক উঠেছিল নয়মাত্রার ছন্দ নিয়ে। ছন্দ যাঁর সহজাত কবচকুণ্ডলের মতো, সেই রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন অন্য কারো মত হলে তিনি গণ্য করতেন না, অমূল্যধন বলাতেই তাঁর 'ধাঁধা' লেগে গেছে। অমূল্যধনের বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ যাকে নয়মাত্রার ছন্দ বলেছেন, তা আসলে ছয়মাত্রার ছন্দ, তিনমাত্রা অপূর্ণপদী। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, এই ছন্দের পূর্ণ চরণ পর্বাঙ্গে বিভক্ত হলে ৩+৩+৩ হয়। অঙ্কশাস্ত্র অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ঠিক। কিন্তু ছন্দের নিয়ম যা চোখে দেখার নিয়ম নয়, কানে শোনার নিয়ম, সেই নিয়মে এই ছন্দের চরণ যতিচিহ্নে বিভক্ত হলে মূল পর্ব দাঁড়ায় ছয়ে, অপূর্ণপদী তিন। এইটি অমূল্যধনের মত। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর 'অশিক্ষা'র কথা কবুল করে তাঁর 'অশিক্ষিতপটুত্ব'-এর দাবী রেখে এই ব্যাপারে অমূল্যধনের সঙ্গে রফায় আসতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়ে 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থের 'নয় মাত্রার ছন্দ' প্রবন্ধের পাদটীকায় অমূল্যধন বলেছেন যে, নয় মাত্রার চরণ নয়, নয় মাত্রার পর্ব নিয়ে সে মূল গণ্ডগোল, রবীন্দ্রনাথ সেইখানেই বারবার ভুল করছিলেন।

কিন্তু এই গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা, মুগ্ধতা বা বিস্ময়ের কারণ অন্যত্র। এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে এবং পঞ্চাশ বছরের মাথায় এই

গ্রন্থের সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই পঞ্চাশ বছরে বাংলা কবিতার ভাষার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন কবিতার ভাষা কথ্যরীতির অনুবর্তী। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণরীতিকে অবিকৃত রাখা—এখন বাংলা কবিতার সাধারণ লক্ষণ। পূর্বে মাত্রার কালপরিমাণ স্থির রাখার জন্য শব্দের সুবিধাবাদী বিকৃতি কবিতায় গ্রহণযোগ্য ছিল। ভাষার এই বর্তমান পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে কবিতার রাজ্যে যা এতকাল নির্বাসিত ছিল সেই ভাবনা বা ভাবের স্বচ্ছন্দ অনুপ্রবেশের অধিকারে। প্রাচীন বাংলা কবিতা থেকে রবীন্দ্রানুসারী কবিতা পর্যন্ত বাংলা কবিতার মৌলিক বিষয় প্রেম, প্রকৃতি ও ঈশ্বর। ব্যতিক্রম আছে, ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিকতা-আক্রান্ত সামাজিক ব্যঙ্গ, মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ'-এর মতো ক্লাসিক্যালধর্মী বিষয় ইত্যাদি। কিন্তু এখন কবিতায় প্রবেশ করেছে সামাজিক মানুষ তার নানা মুখচ্ছবি নিয়ে, চরিত্রের নানা ভাঁজ নিয়ে,—নাটকীয় সংঘর্ষ এসেছে। যেসব ভাব একসময় কবিতায় প্রবেশাধিকার পেত না, সেই ক্ষোভ, ক্রোধ, এমনকি ঈর্ষা সমস্তই কবিতার বিষয় হতে পেরেছে। যা গদ্যের বিষয় তা যে পদ্যেরও বিষয় হতে পারে—এই মৌল লক্ষণ বর্তমান কবিতাকে পূর্ববর্তী কবিতা থেকে পৃথক করে দিয়েছে। বিষয়ের পরিমাপে আর গদ্য ও পদ্যের বিভাজন সম্ভব নয়। বিষয়ীর উপস্থাপনাতেই শুধু পার্থক্য নিরূপিত হয়। প্রাণীর শরীরে যেমন হৃৎস্পন্দন, কবিতার শরীরে তেমন ছন্দোস্পন্দন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। অমূল্যধনের দূরদৃষ্টি ও প্রাজ্ঞতা এইখানে যে তিনি বহুপূর্বেই ধরতে পেরেছিলেন, বাংলা ছন্দের প্রধান গুণ 'স্থিতিস্থাপকতা' শক্তি। বলতে পেরেছিলেন, 'ছন্দ ধ্বনিগত, ছন্দের বিচার চোখে নয়, কানে'। 'প্রত্যেক খাঁটি কবিই ছন্দের ইতিহাসে একটি নূতন পর্বের সূচনা করেন। যাহার নিজস্ব সম্পদ আছে সে কখনও পরের সোনা কানে দেয় না, যাহার নিজস্ব বাগ্‌বিভূতি আছে সে পরের কথায় ও বাঁধা বুলির অনুকরণ করে না ; যে কবির অন্তঃকরণে যথার্থ প্রেরণার আবির্ভাব হয়, সে পূর্বপ্রচলিত অনুবর্তন করিতে স্বভাবত একটা অসুবিধা বোধ করে।' এই গ্রন্থে বহু বিস্ময়-উদ্রেককারী পর্যবেক্ষণ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এই উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলি এই গ্রন্থের উজ্জ্বলতম মাণিক্য। কারণ পঞ্চাশ বছর পরেও বাংলা কাব্যভাষার আমূল পরিবর্তনের মধ্যেও গ্রন্থটির সমসাময়িকতা যে লুপ্ত হয়নি তা লেখকের ঐ পূর্বোদ্ধৃত পর্যবেক্ষণগুলির জন্য। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 'স্থিতিস্থাপকতা' গুণ

বোঝাতে গিয়ে কবিতায় রবীন্দ্রনাথের একটি শব্দ ব্যবহারের উল্লেখ করেন। দেখিয়েছিলেন, কেমনভাবে একই ছন্দে—তানপ্রধান বা অক্ষরবৃত্তে 'দিক্-প্রান্ত' শব্দটিকে কখন তিনমাত্রা কখন চারমাত্রার গুরুত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'স্থিতিস্থাপকতা' গুণ আছে বলেই মাত্রার এই হ্রস্বীকরণ বা দীর্ঘীকরণ সম্ভব। এই কারণেই বর্তমান বাংলা কবিতায় বহু পথচলতি শব্দ ও মৌলিক ক্রিয়াপদ অনায়াসে প্রবেশাধিকার পেয়েছে ছন্দের আইন বজায় রেখেই। বিচিত্র রসানুভূতির তাগিদে পূর্বপ্রচলিত আইনের ভাঙচুর হচ্ছে। শ্রুতির আইন অবিচলিত থাকছে বলেই ছন্দের মৌলিক ব্যাকরণও বিপর্যস্ত হচ্ছে না। যেমন, তানপ্রধানের প্রচলিত নিয়ম ৩+৩+২। এই নিয়ম ভেঙে ২+৩+৩ বর্তমানে করা হচ্ছে। কান কিন্তু বিদ্রোহ করছে না। এমনকি এর চেয়েও আরো বিপজ্জনক পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হচ্ছেন এখনকার কবিরা। তানপ্রধান বা অক্ষরবৃত্তের সাধারণ নিয়ম সে জোড়ে চলে, বিজোড়ে কখনই নয়। যেমন, দুই, চার, আট, দশ মাত্রা। পাঁচ মাত্রা চলে না। কিন্তু এখনকার কবিতায় লক্ষ্য করা গেছে ৭+৭=১৪ বা ৫+৫=১০ মাত্রা করা হয়েছে অক্ষরবৃত্তে বা তানপ্রধানে। অথচ তানপ্রধানের ধীরলয় বজায় থেকেছে, ধ্বনিপ্রধানের বিলম্বিত লয় আরোপিত হয়ে যায়নি। একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> 'যেমন পড়েছিলেন স্বপ্নে চৈতন্যভাগবত রাসসুন্দরী দেবী,
> ঠিক সেইভাবে
> না-পড়ে পড়া, না-দেখে দেখা, না-শুনে শোনা, না-ধ্যানে ধ্যান
> হয়ে গেল তার।'

প্রথম চরণে 'চৈতন্যভাগবত রাসসুন্দরী দেবী' ৭+৭=১৪ মাত্রা যেমন তানপ্রধানের সাধারণ নিয়মে চলে না, তেমনি আবার তৃতীয় চরণে ব্যাকরণ-বহির্ভূত অথচ কানের আইন বজায় রেখে পাঁচমাত্রা এমনভাবে সাজানো যে ১০ মাত্রার পর্বে বিভক্ত। বলা বাহুল্য, কানে তানপ্রধানের ধীর লয় স্পন্দিত হচ্ছে।

যাইহোক, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ আলোচনা করতে গিয়ে অমূল্যধন দেখিয়েছেন, বাঁধা নিয়ম বড় কবির কাজে আসে না। মিত্রাক্ষরের অনুপস্থিতি যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান লক্ষণ নয়, ছেদ ও যতির বি-যোগ এই ছন্দের যে প্রাণভ্রমরা—সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাংলা ছন্দে মধুসূদনের বিশাল অবদানের প্রতি আমাদের সন্দেহাকুল মনকে সন্দেহাতীত রাজ্যে এনে

অমূল্যধন উপস্থিত করেছেন। বাংলা ছন্দোবিজ্ঞানের এই পথিকৃৎ এই কথাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের গূঢ় রহস্য রবীন্দ্রনাথের কাছে অনবহিত থাকেনি। নিজের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছেদ ও যতির বিচ্ছেদ ঘটিয়ে মধুসূদন-প্রবর্তিত রীতিই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের যা গৌণ লক্ষণ—অন্ত্যানুপ্রাস বর্জন—তাকে রবীন্দ্রনাথ সম্মান প্রদর্শন করেননি। অন্ত্যানুপ্রাসকে ফিরিয়ে আনলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই রীতির কবিতায়। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ভাবের তন্তুজালে যে এক ধ্রুপদী রুক্ষতা আছে তারই জন্য অন্ত্যানুপ্রাস-বর্জন প্রয়োজনীয় ছিল—ঐ রুক্ষতাকেই গাঢ়তর করে তুলবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন জাতের কবি। তাঁর কাব্যস্বর চড়াসুরে কদাচই বেজেছে। সেইসব ব্যতিক্রমী মুহূর্তেও তিনি সেই সুরের তীব্রতা বা রুক্ষতাকে যতদূর সম্ভব কোমলতার পুষ্পশ্যামলতায় ঢেকে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যমানসিকতাই তাঁর কবিতায় অন্ত্যানু-প্রাসকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছিল।

যখন অমূল্যধন বলেন বাংলা ছন্দের বিচার চোখে নয়, কানে—আবার যখন বলেন বাংলা ছন্দ Quantitative যেখানে ইংরেজী ছন্দ Qualitative তখন অনেকের মনে হতে পারে যে দুটি মন্তব্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে। গূঢ়তর প্রণিধানে বোঝা যাবে যে ঐ দুই বক্তব্য পরস্পরবিরোধী তো নয়ই, বরং পরস্পরের পরিপূরক। কারণ অমূল্যধন জানিয়ে দিয়েছিলেন বাংলা ছন্দে মাত্রার গুরুত্ব ও অক্ষরের স্থিতিস্থাপকতা শক্তির কথা। একটি চমৎকার উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছিলেন, বাংলা অক্ষরের মাত্রা বাঙালী মেয়েদের খোঁপার চুলের মতো। কখনো আঁট করে বাঁধা থাকে, আবার কখনো এলায়িত থাকে। তাছাড়া অমূল্যধন বারবার তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, ছন্দের ব্যাপারে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখার কথা, বিশেষ রসানুভূতির সমতালে মাত্রা-সংস্থাপনের কথা। ফলে জীবনানন্দ দাশের কাব্যপঙ্ক্তি 'বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত'—এখানে 'লজ্জাবশত' শব্দটি তানপ্রধানের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পাঁচমাত্রা হলেও বাংলা অক্ষরের মাত্রার স্থিতিস্থাপকতা-শক্তিতে 'জ্জা' এই যুক্তাক্ষরের দীর্ঘীকরণ করা অন্যায় হবে না—কান বিদ্রোহ করছে না। 'লজ্জা' শব্দের যুক্তাক্ষরকে টেনে পড়ছি আমরা স্বচ্ছন্দে—তিন মাত্রার গুরুত্ব দিয়েই পড়ছি। এইসব স্বাধীনতা নিতে গিয়ে সজ্ঞান কবিরা বাংলা ছন্দের বিজ্ঞানকে

বিস্মৃত হননি। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 'স্থিতিস্থাপকতা' শব্দের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বাংলা ছন্দের ভবিষ্যতের দিক দিয়ে কতটা গভীর ও সুদূরপ্রসারী, গ্রন্থটির জন্মকালের পঞ্চাশ বছর পরে যেন আরো বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছি।

বাংলা ছন্দ নিয়ে যাঁরা পড়াশোনা করেন বা কবিতা লেখালিখির সহায়ক হিসাবে বাংলা ছন্দের কোন গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে চান, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থটিকে তাঁরা নির্দ্বিধায় বেছে নিতে পারেন। বইটির আপাত চেহারা অত্যন্ত সাদাসিধে, ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণের মতো। ভাষা বা পরিভাষার কায়দা-কানুন-বর্জিত এই বইটি পড়তে শুরু করলেই বোঝা যাবে এক অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক চেতনায় প্রতিটি পৃষ্ঠা মূল্যবান। দ্ব্যর্থকতাহীন সরলভাষায় বাংলা ছন্দের প্রকৃতি যত পরিচ্ছন্নভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তা বাংলা ছন্দের উপর অন্যান্য বইয়ে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ', প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' বা অন্যান্য বইয়ের অপরিসীম গুরুত্ব একটুও খাটো না করেও বলা যায় ঐ লেখকরা যে বিষয়কে সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন সেখানে এই বইটিতে ব্যবহৃত হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ। 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র'র একটি সার-সংক্ষেপ এখানে তুলে দিচ্ছি যা বাংলা ছন্দের ছাত্র, চর্চাকারীদের কাছে প্রমাণ করবে এই গ্রন্থটির সমসাময়িকতা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বলেই পঞ্চাশ বছর পরেও বইটির সমসাময়িকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

১. বাংলা ভাষার প্রকৃতি, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালির স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর বাংলা ছন্দের ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠিত।

২. বাংলা ভাষার ছন্দকে 'The Beat and Bar Theory' বা পর্ব-পর্বাঙ্গবাদ বলা যেতে পারে।

৩. পর্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ।

৪. ছন্দ ধ্বনিগত; ছন্দের বিচার চোখে নয়, কানে।

৫. ছেদ ও যতির পরস্পর বি-যোগ ঘটিয়েই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ও অন্যান্য বৈচিত্র্যবহুল ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে।

৬. স্পন্দনই ছন্দের প্রাণ। প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের ন্যায় এই ধ্বনিতরঙ্গই পর্বের প্রাণস্বরূপ। যখন শিব ও শিবানী-রূপ দুই পর্বাঙ্গের মিলন ঘটে

'বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে ওঠে তখন দুলে'

অর্থাৎ ছন্দের সৃষ্টি হয়।

৭. বাংলা ছন্দ quantitative বা মাত্রাগত। ইংরেজী ইত্যাদি qualitative জাতীয় ছন্দ থেকে বাংলা ছন্দ ভিন্নজাতীয়।

৮. অক্ষরের মাত্রার স্থিতিস্থাপকতা—বাংলা ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য। যেমন 'বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত'—তানপ্রধান ছন্দের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 'লজ্জা' ছ'মাত্রার সম্মান পায়, স্থিতিস্থাপকতা শক্তি দিয়ে 'লজ্জা' এখানে তিন মাত্রার গুরুত্ব পেয়েছে। কিংবা 'রূঢ় দীপের আলোক লাগিল ক্ষমাসুন্দর চক্ষে'—এই ধ্বনিপ্রধান চরণের ছ'মাত্রার পর্বে বিভক্ত। কিন্তু আলোতে দৃষ্টিতে প্রথম পর্বে পাঁচ মাত্রা। 'রূ' এই স্বরান্ত অক্ষরের উপর একটি অতিরিক্ত উচ্চারণগত ঝোঁক পড়ায় অনায়াসে দীর্ঘ হয়ে গেছে। ফলে 'রূঢ়' তিন মাত্রার গুরুত্ব পেয়েছে।

৯. বাংলা ছন্দের লয় তিন প্রকার—দ্রুত, ধীর ও বিলম্বিত। দ্রুত লয়কে বলে শ্বাসাঘাতপ্রধান, ধীর লয়কে তানপ্রধান ও বিলম্বিত লয়কে ধ্বনিপ্রধান।

১০. রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি কবিতায় মিত্রাক্ষর থাকলেও রবীন্দ্রনাথের এইজাতীয় কবিতা সাধারণ মিত্রাক্ষর থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতির সহোদর-স্থানীয়। কারণ ছেদ ও যতির বিচ্ছেদের মূল নীতি 'মেঘনাদবধ' ও 'বসুন্ধরা' উভয় কবিতায় অনুসৃত হয়েছে। এই প্রকৃতির ছন্দকে বলা উচিত 'অমিত্রাক্ষর' নয়, 'অমিতাক্ষর'। অমিতাক্ষরের মূলনীতিকে অবলম্বন করেই 'গৈরিশ ছন্দ' ও রবীন্দ্রনাথের 'বলাকার ছন্দ' সৃষ্টি হয়েছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ অর্থাৎ ছেদ ও যতির বিচ্ছেদ ঘটিয়ে প্রবহমানতার প্রবর্তন করে মধুসূদন বাংলা ছন্দে যেমন বিপ্লব এনেছিলেন, তেমনি 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে ধ্বনিপ্রধান ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ পুনর্জীবিত করে তোলেন। হলন্ত অক্ষরকে দু'মাত্রার সম্মান দিয়ে বাংলা ছন্দে একটি ধ্বনিজগৎ রচনা করলেন, যে ছন্দের প্রাক্-রূপ পাওয়া যাবে বৈষ্ণবকবিদের কবিতায়। শ্বাসাঘাতপ্রধান বা ছড়ার ছন্দ শুধু হালকা পদ্যের প্রাণশক্তি বলে পরিচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব, তিনি গুরুগম্ভীর ভাবপ্রকাশে এই ছন্দোস্পন্দন বা লয়কে সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছিলেন। 'লিপিকা'য় রবীন্দ্রনাথ দেখালেন যে, গদ্যের পদ দিয়ে পদ্যের গঠন অর্থাৎ Prose-Verse নির্মাণ সম্ভব।

১১. যদি ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণপদ্ধতি অব্যাহত রেখে বিভিন্ন বাক্যাংশ কোন সুস্পষ্ট সুন্দর আদর্শ অনুসারে সাজানো হয়, তবে সেখানে ছন্দ আছে বলা যেতে পারে।

১২. দুই যতির মধ্যবর্তী কালপরিমাণই বাংলা ছন্দের বিচার্য বিষয়।

১৩. ছন্দের আলোচনার সময় উচ্চারণের দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হয়। লিখিত হরফ বা বর্ণ এবং অক্ষর এক নয়। 'ব' একটি হরফ বা বর্ণ, 'বৈ' একটি অক্ষর।

১৪. ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারটি ধর্ম: (১) তীব্রতা (pitch), (২) গাম্ভীর্য (intensity বা loudness), (৩) স্বরের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাণ (length বা duration), (৪) স্বরের রঙ (tone-colour)। দৈর্ঘ্য ও গাম্ভীর্য —এই দুটি নিয়েই বাংলা ছন্দের কারবার।

১৫. বাংলা ছন্দের সমস্ত হিসাব মাত্রা অনুসারে। মাত্রার মূল তাৎপর্য duration বা কালপরিমাণ।

১৬. বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতিতে মাত্রা সুনির্দিষ্ট নয়। হলন্ত অক্ষরের, কথনো কথনো স্বরান্ত অক্ষরেরও ইচ্ছামতো হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ করা যেতে পারে।

১৭. প্রত্যেক খাঁটি কবিই ছন্দের ইতিহাসে একটি নতুন পর্বের সূচনা করেন। যার নিজস্ব সম্পদ আছে সে কখনো 'পরের সোনা কানে দেয় না'।

১৮. Syllable-এর অর্থ অক্ষর। অক্ষর ও হরফ এক নয়। 'দল' Syllable-এর বাংলা নয়। 'দল' অর্থে চরণ, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় hemistich অর্থাৎ half-line of verse।

পঞ্চাশ বছর আগে 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র'-র প্রথম প্রকাশকালের অব্যবহিত পরে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই গ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে আস্থাস্থাপন করেছিলেন অমূল্যধনের পর্ব-পর্বাঙ্গবাদে। কারণ অমূল্যধনের যুক্তি উপলব্ধি করেই তিনি বলেছিলেন 'পর্ব ও পর্বাঙ্গ অর্থাৎ কাল পরিমাণ বাংলা ছন্দের প্রাণ।' এই ছান্দসিকের মতকে স্বীকার করে সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'এক ঝোঁকে কতকগুলো কথার উচ্চারণই বাঙালীর রীতি।' জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন: 'আমার মনে আর কোন সন্দেহ নেই যে অমূল্যধন বাংলাছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে যা বলেন নি, তা বক্তব্যই নয়।'

সাহিত্যের রহস্য-সন্ধানী অমূল্যধন

ভূদেব চৌধুরী

ভূরি-কথন আর ভূরি-লিখন যে-কালে বাংলা সাহিত্যালোচনার মজ্জাগত হয়েছে, তখন অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের (১৯০২—১৯৮৪) মতো মৃদু ও মিতভাষী স্বল্প-লেখ রচয়িতার পক্ষে হট্টগোলে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। বস্তুত তিনি গেছেনও তাই। কিন্তু পরিমাণ ছেড়ে গুণগত স্বতন্ত্রতার পরিমাপ যদি সাহিত্য-মূল্য-সন্ধানের নিরিখ হয়, তাহলে বাংলা সাহিত্যালোচনার ধারায় একটি নিজস্ব আসনের দাবি তাঁর আছে। সে-দাবি সম্পর্কে অবহিত হতে পারা উত্তরগামীদের আপন স্বার্থেই বাঞ্ছনীয়।

অনেকটা রবীন্দ্রনাথের পথ ধরেই অমূল্যধন বলেছিলেন, "সাহিত্য-সমালোচনা কেবল বিচার নহে, তাহাও একপ্রকারের সৃষ্টি।"[১] অর্থাৎ, সাহিত্যের মূল্যানুসন্ধানও অনেকাংশে উদ্ভাবনী কল্পনার বিষয়। তাতে সমালোচকের ব্যক্তিগত পরিবেশ ও প্রবণতার ছাপ পড়ে যায় আপনা থেকে। অমূল্যধনও বলেন, 'সাহিত্য-রসিক' "নিজস্ব রসবোধের গুণেই সাহিত্য সম্ভোগ করেন।"[২] স্বভাবতই, এ-সকল ক্ষেত্রে, রচনার সঠিক পরিচয় ধরতে রচয়িতার 'নিজস্ব' স্বরূপ ও প্রবণতার পরিচয় খতিয়ে দেখতে হয়।

প্রথম শ্রেণীর কৃতিত্বসম্পন্ন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র বাংলা ছন্দের গোত্র-চরিত্রের সন্ধানে নিয়োজিত করেছিলেন নিজেকে সাহিত্যালোচনার প্রথম ধাপে। পদ্য-ছন্দের শাস্ত্র নিগূঢ় কার্যকারণ-চালিত নিয়ম-পদ্ধতির সমষ্টি ; বলা ভালো, কবিতা ধ্বনির ব্যাকরণ। কিন্তু আপন স্বরূপে ছন্দ তো কবিতার—ব্যাপক অর্থে, সকল রকমের সাহিত্য-শিল্পের প্রাণ! বাংলা ছন্দ-শাস্ত্রালোচনার দাপটে ইদানীং বাংলা কবিতার প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে চলেছে। অমূল্যধন সেই প্রাণের রহস্য খুঁজতেই ছন্দের ব্যাকরণ গড়ে দেখতে চেয়েছিলেন। এখানেই তাঁর সাহিত্যরস-সন্ধানের স্বতন্ত্রতা।

'ছন্দই কাব্যের লক্ষণ' ; একথা বলেই বলেছেন, 'ছন্দের অর্থ কি,…।" উত্তরও দিয়েছেন নিজেই, "পদ্যের ছন্দ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। চরণের অক্ষর-সংখ্যা, মাত্রা-সংখ্যা ইত্যাদির সহিত তাহা সম্পৃক্ত। অনেক হিসাবে তাহা

একটা বহিরঙ্গের ব্যাপার। এই পদ্যছন্দই অবশ্য কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ নহে।" বুঝে দেখতে হয়, এ ঘোষণা 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থের স্বনামখ্যাত রচয়িতার। তাঁর মতে, "…ছন্দকে যদি Rhythm-এর ব্যাপক অর্থে ধরা যায়, তবে আপত্তির কোন কারণ থাকে না।…কাদম্বরীর ন্যায় আখ্যায়িকাতেও ছন্দ আছে, পদ্যছন্দ নাই। সম্প্রতি গদ্যের ছন্দ, নৃত্যের ছন্দ প্রভৃতি কথা আমরা ব্যবহার করিতেছি।…ছন্দের আসল কথা সামঞ্জস্য, সঙ্গতি। এই সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি সৃষ্টির ও সৌন্দর্যের প্রাণবস্তু। ইহার আবির্ভাবেই সুন্দরের প্রকাশ, ইহার অভাবেই সৌন্দর্যের নাশ।"[৩]

আবার স্মরণ করি, 'এই সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি' একটা বহিরঙ্গীয় লক্ষণ নয়, অমূল্যধনের চোখে সে আন্তরিক স্পন্দন (rhythm)-এর সূচক। আর তারই গভীরে রয়েছে সাহিত্যের বচনাতীত সত্তা। নিজস্ব প্রবণতাবশে অমূল্যধন সাহিত্যের এই আন্তর রহস্যের সন্ধানী, ঐখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয়তা।

কিন্তু এই ব্যক্তিক প্রবণতা এক সুনির্দিষ্ট সাহিত্যরুচির আওতায় সংবর্ধিত হয়েছিল। তার পরিচয়ও দিয়েছেন অমূল্যধন: "সাহিত্যবিচারে আমি উদার-নৈতিক। সনাতনী হইলেও আমি আধুনিক সাহিত্যের রসগ্রাহী।"[৪] 'সনাতনী' অর্থে বর্তমান শতকের কুড়ির দশকে, কিংবা তারও পূর্ববর্তী সময়ে ইংরেজি সাহিত্যের যে-পঠন-পাঠন এদেশে চলেছিল, তারই পরিমণ্ডলে গড়েছিল অমূল্য-ধনের সাহিত্যরুচি। বলা ভালো, ভিক্টোরীয় ইংরেজি সাহিত্যের রসভাণ্ডার ভিত রচনা করেছিল তাঁর সাহিত্যভাবনার। তাহলেও প্রথম যুদ্ধোত্তর 'আধুনিক' মেজাজের রহস্য এবং মূল্যানুসন্ধানও করেছেন উদারদৃষ্টিতে। 'উদারতা'র অর্থ কিন্তু সব-কিছুকেই সমমূল্যে গ্রহণ নয়; বরং সাহিত্যে সকল ধারাকেই সমান আগ্রহে অনুধাবন ক'রে, আপন সাহিত্যরুচির নিকষে তার তাৎপর্য-সন্ধান।

'সনাতনী' ভাবনার সঙ্গে 'সাহিত্যে আধুনিকতা'র তুলনাসূত্রে বলেছিলেন, "সনাতনী সাহিত্যিকেরা ভারতীয় বেদান্তদর্শন ও ইউরোপীয় Idealism-এর দোহাই দিয়া থাকেন। আধুনিকেরা দোহাই দেন Marx এর, কিন্তু Marx-এর দর্শন সাহিত্যবিচারে যে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে তাহা মনে হয় না। ইউরোপের রোমান্টিক সাহিত্য কান্টের নব্যন্যায় (dialectic) ও ফিক্‌টে, শেলিং,

হেগেলের দার্শনিক মতবাদের সহায়তায় যেভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই-ভাবে চিন্তাজগতে সাহিত্যিক আধুনিকতা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন নূতন দর্শন এখনো পর্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপ্রণালীবদ্ধভাবে রচিত হয় নাই।"[৫]

আধুনিকেরা সকলেই কিন্তু মার্কস-এর 'দোহাই' দেন না। একই প্রবন্ধের শুরুতে লেখক 'আধুনিকতার অন্যতম নায়ক' বলে টি. এস. এলিঅট-এর উল্লেখ করেছেন[৬]; এলিঅট অন্তত মার্কস্-এর অনুসারী ছিলেন না। অমূল্যধন একথা আমাদের চেয়ে বেশি জানতেন। তা হলেও স্বীকার করতেই হয়, মার্কস্-এর ভাবনা ঐ প্রবন্ধরচনার সমকালে আধুনিক সাহিত্যের একটি শাখার মুখ্য স্তম্ভ ছিল। আর আধুনিক সাহিত্যরচনার মূলে সুনির্দিষ্ট দার্শনিক প্রবণতার কোনো সর্বায়ত ভিত্তি যে নেই, এ সিদ্ধান্ত তো সংশয়াতীত!

এইভাবেই 'সনাতনী' দৃষ্টি 'উদারনৈতিক' আগ্রহবশে সাহিত্যের রসলোকে অবাধ বিচরণ করে ফিরেছে।

এইসব মিলিয়েই অমূল্যধনের সাহিত্য-সন্ধানী ব্যক্তিত্ব: (১) সাহিত্যের আস্বাদনে বিচারের চেয়েও—বিচার বাদ দিয়ে নয়—উদ্ভাবনী কল্পনার ওপরে তাঁর নির্ভর বেশি—বহির্লক্ষণের তুলনায় তার অন্তরঙ্গ রহস্যের উন্মোচনে প্রধান ঝোঁক; (২) নিজস্ব একটি সাহিত্য-রুচি ['সনাতনী' বলেছেন লেখক] সহযোগে সকল কালের সকল ধরনের সাহিত্যের অন্তর্লোকে অনুপ্রবেশের আগ্রহ; (৩) সর্বোপরি সাহিত্যের স্পন্দিত (rhythmic) অন্তঃসত্তাকে আবিষ্কার করতে চাওয়ার মৌলিক প্রবণতা—প্রতীচ্য-সাহিত্যপাঠ-জনিত দর্শন-শিল্প-ভাবনায় যা সংহত, সমৃদ্ধ!

তা হলেও, আগেও বলেছি, সামর্থ্যের তুলনায় অমূল্যধনের রচনার পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর; মাত্র তিনটি স্বল্প-পরিসর গ্রন্থ-সীমায় আবদ্ধ: 'কবিগুরু' (১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭১), 'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা' (১৩৬৭), 'রবীন্দ্রনাথের মানসী' (১৩৮১)। দ্বিতীয়টি আবার বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংকলন। তারই মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থটি নানা দিক থেকেই সাহিত্য-রসসন্ধানী অমূল্যধনের উদ্ভাবনী প্রবণতার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর। পুস্তিকাটির সম্পর্কে বিস্ময়ের কারণ যে রয়েছে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর 'ভূমিকা'য় সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধের মাধ্যমে ধীরে ধীরে একটি সুনির্দিষ্ট ভাবের মালা গেঁথে তুলছিলেন অমূল্যধন অনেকদিন ধরে; একটি বইয়ে একত্র গ্রথিত

হতেই পুরো মালাটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এ-মালা সাহিত্য-আস্বাদনের পথে তাঁর উদ্ভাবনী অনুভবের রচনা। অমূল্যধন বলেছেন, বইটিই লেখা হয়েছিল আগে সামগ্রিকভাবে। পরে তারই বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়।

সে যেমনই হোক, 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'শেষ লেখা' অবধি,—'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর পূর্বভূমিতেও বিচরণ করেছে তাঁর ভাবনা,—রবীন্দ্রকাব্যসৃষ্টির ইতিহাসকে একটি ক্রমানুগত—ক্রম-অভিব্যক্ত প্রবাহের আকারে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন লেখক তাঁর 'কবিগুরু' গ্রন্থে।[৭] এ-চেষ্টা অবশ্য অভিনব নয়; অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তির উপলক্ষে, তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অভিব্যক্তির বিশিষ্ট ধারাটিকে ধরবার চেষ্টা চলে আসছে। কিন্তু অমূল্যধন তাঁর নিজের কালের কাছে একটি মৌলিক বক্তব্য পেশ করতে চেয়েছিলেন: আজ তা বহুল-উচ্চারিত হতে থাকলেও বাঙালি পাঠকের সংবিৎ যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠতে পারেনি এখনো সে-বিষয়ে। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা: "রবীন্দ্রনাথ মাত্র কবি ছিলেন না"[৮] আরো স্পষ্ট কথা, "রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের 'খণ্ডিত, সঙ্কুচিত জীবনের মাঝখানে পূর্ণতর মানবতার অবতার…।[৯] অমূল্যধনের স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ 'মানুষের ধর্ম'র অবিচল সাধক রবীন্দ্রনাথের প্রতি। তাঁর বক্তব্য, "রবীন্দ্রনাথ ভারতের সাধনার সনাতন ধারাকে নূতন দিকে নূতন আদর্শের অভিমুখে মোড় ফিরাইয়া দিয়াছেন।"[১০] সমন্বয় তার মূল কথা; কেবল পূর্ব-পাশ্চমের নয়, বৈচিত্র্যের চেয়ে বিপরীতের মধ্যে সমন্বয় সাধন! "এ সমন্বয় ঐহিকের সহিত পারত্রিকের, কর্মের সহিত ধর্মের, বুদ্ধির সহিত বোধের, রজোগুণের সহিত সত্ত্বগুণের, ভোগের সহিত ত্যাগের, 'সঙ্গে'র সহিত মুক্তির, নীরস কর্তব্যপালনের সহিত রসোচ্ছল উপলব্ধির সমন্বয়।"[১১]

অতএব সেক্সপীয়র বা কালিদাসের মতো নিছক নান্দনিক মাপকাঠিতে রবীন্দ্রকাব্যের বিচার চলে না, এ-সম্পর্কে লেখক নির্দ্বিধ।[১২] রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচারে অন্তত অমূল্যধন যে স্রষ্টার ভূমিকাই নিতে চেয়েছিলেন, তার দুটি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ 'কবিগুরু' গ্রন্থিকার 'প্রস্তাবনা'য় আভাসিত রূপালেখ্য—'কথিকা' বলেছেন লেখক—'স্বর্গের চক্রান্ত',[১৩] আর 'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা' বইয়ের কৌতুক রচনা 'রবীন্দ্র সমস্যা'।[১৪] রবীন্দ্রনাথ নূতন সত্যের, মর্ত্য-স্বর্গের জীবনদূত, সেই তাৎপর্যেই তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে; কেবল তাঁর রচনার

পাঠ মিলিয়ে তাঁকে ধরা যাবে না, গুরু-লঘু ভাষণের লেখা দুটিতে এ-কথাই অমূল্যধনের প্রতিপাদ্য।

তাহলে রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিমাপের মান কী হবে? ছন্দোরসিক লেখকের অসংশয়িত উত্তর : 'ছন্দের মধ্যে'।[১৫] কথাটায় জোর দিতে চাই। অমূল্যধন কেবল ছন্দোবিৎ, ছন্দের বৈয়াকরণ ছিলেন না ; ছন্দকে তার প্রাণময় রসরূপে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন সাহিত্য-রহস্য-সন্ধানের প্রয়াসে। সে-কথা দেখেছি আগে। এখানেও তাঁর অনুভব,—"রবীন্দ্রনাথের দেবতা নটরাজ, কারণ নৃত্যেই ছন্দোময় সত্তার প্রকাশ।...এই নৃত্যচ্ছন্দে প্রাণ জাগ্রত হইলে সব বন্ধন হইতে মুক্তি হয়।...এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সাধনাকে জীবনে ও জগতে সার্থক ও পূর্ণ করার পথ নির্দেশ করিয়াছেন। এই পথে চলিলে আমরা যাহা পাইব তাহা ব্রহ্মনির্ব্বাণ নহে, স্পন্দনময় ব্রহ্মানন্দ।"[১৬]

এপর্যন্ত উদ্ধৃত রবীন্দ্র-আলোচনার ভাষিক চরিত্র আবেগস্ফীত মনে যদি হয়ও, অমূল্যধনের ভাব-প্রকৃতি কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত ; নিজেও সে-সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।[১৭] তাহলেও সত্যের একটি অভাবিত অবয়বকে ধরতে চাওয়া, কিছুটা ধরতে পারার উদ্দীপনাকে রোধই বা করবেন কী করে সাহিত্য-রহস্যের ভাবুক সন্ধানী! 'সাহিত্যের সমালোচক' অভিধাটি বারেবারেই পরিহার করতে চাইছি অমূল্যধন সম্পর্কে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-বিচার নয়, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "সুন্দরের অন্তরে একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য রয়েছে,"[১৮] সাহিত্যের সেই অনির্বচনীয় রহস্যের সন্ধানেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। সেই পরিচয়েই সাহিত্য-জিজ্ঞাসু অমূল্যধনের অনন্যতা।

কিন্তু রবীন্দ্র-সৃজনী-চরিত্রের উন্মোচন শেষ হয়ে গেলে রবীন্দ্রকাব্যধারার ক্রমবিকাশের উপস্থাপনে লেখক অতিশয় সংক্ষিপ্ত এবং সংহতভাষণে বক্তব্য প্রতিষ্ঠার এক অ-সাধারণ নিদর্শন উপস্থিত করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে 'রবীন্দ্রকাব্যের প্রথমযুগ'-এর পরিকল্পিত তৃতীয় তথা অন্তিম 'পর্ব' রূপে 'মানসী' কাব্যের বিবেচনা শেষ হতে পেরেছে মাত্র তিনটি পৃষ্ঠার পরিসরে। অথচ লেখকের বলার কথা যে কত ব্যাপক এবং বিস্তারিত হতে পারে, তার পরিচয় মেলে 'রবীন্দ্রনাথের মানসী' নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরচনায়।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছাত্র অমূল্যধনের পরিকল্পিত রবীন্দ্রকাব্য-বিকাশের প্রকরণ আলোচনার প্রসঙ্গে মনে করেছিলেন, 'ক্ষণিকা' কাব্যকে ঐ

ছকের বাইরেও রাখা হয়ত যেত।[১৯] এ-বিষয়ে মতভেদ ঘটতেও পারে। কিন্তু অন্যত্রও অমূল্যধনের কোনো কোনো বিবেচনার সঙ্গে ভিন্নমত হওয়া যেতেই পারে। সাহিত্যের রহস্যসন্ধানে উপলব্ধি, রুচি ও চিন্তার পার্থক্যই সজীবতার লক্ষণ। কিন্তু স্বল্পতম পরিসরেও আপন যুক্তিধারাকে নিটোল গাঢ়তায় উপস্থিত করতে পেরেছেন লেখক, এ-সম্পর্কে সংশয় নেই।

'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা' বইটির 'আধুনিক' অভিধাটির ওপরে লেখকের মনের ঝোঁক ছিল প্রধান। তাঁর আযৌবন 'সনাতনী' সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতায় 'আধুনিকতা' নামক এই নতুন মর্জিটির উদ্ভব নানামুখী কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। বলেছি, সাহিত্যের নিত্যবহমান রহস্যলোকের প্রতিই তাঁর আগ্রহ ছিল ঐকান্তিক। 'সাহিত্যের আধুনিকতা', 'কাব্যের ধর্ম', 'কাব্যে কালান্তর', 'সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক' ইত্যাদি বেশ কিছু সংখ্যক রচনায় সাহিত্যের তত্ত্ব নিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে; তথ্যে নিরেট, যুক্তিতে তীক্ষ্ণ সে-সব রচনা। সেই সঙ্গে রয়েছে সাহিত্যশিল্পীদের মূল্য-নির্মাণেরও প্রচেষ্টা: বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলালের পাশে সেখানে রামপ্রসাদও জায়গা করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও আছে অতিরিক্ত কিছু ভাবনা।

'পরিশিষ্ট' অংশে ইংরেজি সাহিত্য ও তার দুজন শিল্পীকে নিয়ে আছে মোট তিনটি আলোচনা; 'নিবেদন' অংশে লেখক সে-বিষয়ে তাঁর উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত করেছেন। প্রবন্ধ-কয়টি বাংলা পড়ুয়ার কাছে ইংরেজি সাহিত্যের কয়েকটি কৌতূহলজনক প্রসঙ্গের ধারণা প্রাঞ্জল করতে সহায়ক হবে। বলা ভালো, বাংলা সাহিত্যের মূল্য-চিন্তনেও লেখকের ইংরেজি সাহিত্যপাঠের পরিশীলিত বোধ অনেকটাই কার্যকর হয়েছে।

কিন্তু এতসব দীর্ঘ আলোচনার একটাই উদ্দেশ্য। অমূল্যধনের পরিকল্পনায় সাহিত্যচিন্তনের যে-বিস্তার ও বৈচিত্র্য, যে মৌলিক অন্তর্দৃষ্টি ও প্রগাঢ়তা ছিল, তাঁর লেখনীতে তার প্রকাশ কেবল সীমিত হয়েই থেকেছে। সব মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যের সমালোচনার ধারায় তিনি একটি উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি, কিন্তু অসম্পূর্ণ! প্রাপ্তির পরিতৃপ্তির সঙ্গে এই আক্ষেপটুকুও জড়িয়ে থাকে মনে।

নির্দেশপঞ্জী

১ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা': 'নিবেদন'
তদেব

৩ তদেব : 'কাব্যের ধর্ম', পৃ ২২
৪ তদেব : 'নিবেদন'
৫ তদেব : 'সাহিত্যে আধুনিকতা', পৃ ১৩
৬ তদেব, পৃ ১
৭ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—কবিগুরু : 'নিবেদন'
৮ তদেব : 'কবিগুরু', পৃ ৮
৯ তদেব, পৃ ১০
১০ তদেব, পৃ ১৩
১১ তদেব, পৃ ১৪
১২ তদেব, পৃ ৮
১৩ দ্র. তদেব : 'স্বর্গের চক্রান্ত', পৃ. ১—৪
১৪ দ্র- অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা' : 'রবীন্দ্র সমস্যা' পৃ, ১৬৭- ১৭৭
১৫ তদেব—'কবিগুরু' : কবিগুরু, পৃ. ১৫
১৬ তদেব, পৃ. ১৭
১৭ দ্র. তদেব : 'নিবেদন'
১৮ রবীন্দ্রনাথ—'অবতরণিকা'—'রবীন্দ্ররচনাবলী' (বি.-ভা.), প্রথম খণ্ড, পৃ. একটাকা তেরো-চৌদ্দ আনা
১৯ দ্র. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায—ভূমিকা : অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—'কবিগুরু'

সাহিত্য-সমালোচনায় অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

অজিতকুমার ঘোষ

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ইংরেজি সাহিত্যের সুপণ্ডিত অধ্যাপক ছিলেন। দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করবার সময় সাহিত্যের মৌল তত্ত্ব ও সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তাঁকে অনেক চিন্তাভাবনা করতে হয়েছিল। সব সাহিত্যের তত্ত্ব ও সমস্যাই মোটামুটি এক, শুধু কেবল ভাষার তফাত। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হন এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে অর্জিত সমালোচনা-শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োগ করে বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। কালে কালে তিনি সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর শেষজীবনের গবেষণা গ্রন্থ **Sanskrit Prosody : Its Evolution** এক অর্থে গবেষক অমূল্যধনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। প্রধানত ইংরেজি সমালোচনা-শাস্ত্রের সূত্র প্রয়োগ ক'রে সাহিত্য-সমালোচনা করলেও সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের ফলে সাহিত্য সম্পর্কে তিনি উদার ও সামগ্রিক দৃষ্টির অধিকারী হ'য়ে সাহিত্য-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। প্রধানত ছন্দবিষয়ক মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী মর্যাদালাভ করেছেন। তাঁর 'কবিগুরু,' 'রবীন্দ্রনাথের মানসী', 'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা' ইত্যাদি গ্রন্থগুলিও সাহিত্য-সমালোচনা সম্পর্কে তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং তীক্ষ্ণ মননশক্তির পরিচয় বহন করে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণায় জন্মলাভ করেছে। আধুনিক বাংলা গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও নাটক সব কিছুই গঠনরীতি, আঙ্গিকপ্রয়োগ, চরিত্র-রূপায়ণ পদ্ধতি, ট্র্যাজেডি-চেতনা, ছন্দপ্রয়োগ ইত্যাদি দিক দিয়ে অল্পবিস্তর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যকে অনুসরণ করেছে। সুতরাং, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই যথার্থভাবে বাংলা সাহিত্যের উপাদানগুলির বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে সক্ষম। আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাজ্ঞ সমালোচক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি ইংরেজি সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকগণ বাংলা সাহিত্য সমালোচনা ক্ষেত্রে প্রবেশ করাতে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য অশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই। 'তুলনামূলক

আলোচনা এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাঁরা সাহিত্যের নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের পথ প্রদর্শন করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক যেমন বাংলা সাহিত্য ব্যাপক ও গভীরভাবে পাঠ ও অনুশীলন করে বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তেমনি বাংলা সাহিত্যের অনেক অধ্যাপকও ইংরেজি সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনা নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করে তবেই বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক মাননীয় ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক মনে করেন বাংলার অধ্যাপকের পক্ষে ইংরেজি সাহিত্যের কোনো উল্লেখ করা অমার্জনীয় অপরাধ। আসলে সকলকেই কষ্ট করেই বিদ্যা অর্জন করতে হয় এবং বিদ্যার ক্ষেত্রে কারও কোনো একচেটিয়া অধিকার নেই। অমূল্যধনকেও অনেক কষ্ট করে, অনেক সময় ব্যয় করে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এই সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমালোচনা করবার অধিকার লাভ করতে হয়েছে। তিনি প্রায়ই কোন বাঙালী লেখকের সঙ্গে কোনো পাশ্চাত্ত্য লেখকের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, এর ফলে পাঠকের চিন্তাশক্তি উদ্দীপ্ত হয়, তার ধারণা সুষ্ঠুতর হয়। প্রায়ই তিনি বাংলা সাহিত্যে কোনো প্রসঙ্গ কিংবা কোনো তত্ত্ব আলোচনার সময় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে অনুরূপ প্রসঙ্গ অথবা তত্ত্বের অবতারণা করেন, তার ফলেও পাঠকের কৌতূহল ও জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়ে যায়।

'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা'র ভূমিকায় অমূল্যধন লিখেছেন, 'সাহিত্যবিচারে আমি উদারনৈতিক। সনাতনী হইলেও আমি আধুনিক সাহিত্যের রসগ্রাহী।' একাধিক জায়গায় তিনি নিজেকে সনাতনী বলেছেন বটে, কিন্তু কোথাও তাঁর গোঁড়ামি কিংবা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়নি। শুধু কেবল তিনি মার্কস্‌বাদী মতবাদ ও সাহিত্য-বিচারভঙ্গি সমর্থন করেননি। তা ছাড়া সাহিত্যের সকলরকম মত ও আদর্শ তিনি খোলা মন নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাহিত্যে আধুনিকতা প্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্যকে সমর্থন জানিয়ে তিনি বললেন, 'মানবাত্মার গভীরতম উপলব্ধির প্রকাশ হিসাবে বা তাহার বিচিত্র প্রয়োগের নির্দেশক ধ্রুবতারা হিসাবে ইহার মূল্য ও সার্থকতা উপেক্ষার যোগ্য নয়।' তবে অমূল্যধনের বিভিন্ন জায়গার আলোচনা অনুসরণ করলে বোঝা যায় তিনি প্রাচ্য রসবাদকেই সাহিত্যবিচারে শেষ কথা ব'লে মনে করেন। লোকোত্তর, বিশ্বজনীন, আনন্দজনক, সহৃদয়হৃদয়সংবাদী রসই কাব্যের আত্মা

এবং সেই রসের স্বরূপ উপলব্ধিই হল তাঁর মতে কাব্যবিচারের সার সত্য। 'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা'র ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'সাহিত্যপাঠের ফলে যেটুকু আনন্দ পাইয়াছি তাহাই যুক্তি সহকারে পরিবেশনের চেষ্টা করিয়াছি। তজ্জন্য কেহ আমাকে impressionist কিংবা eclectic বলিলে আপত্তি করিব না।' কিন্তু বাংলা সাহিত্য-সমালোচনা প্রবন্ধে এই impressionistic সমালোচনা তিনি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেননি। তিনি এর ত্রুটি দেখিয়ে বলেছেন, 'আলোচ্য বিষয় ছেড়ে লেখক নূতন এক ভাবরাজ্যে চলে যেতে পারেন এবং সম্যকরূপে বিষয়টিকে দর্শনের যথেষ্ট অসুবিধা হ'তে পারে।' তবে যে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল impressionistic, সে-অর্থে অমূল্যধন কখনই impressionistic নন। আনন্দভোগ ব্যক্ত করবার জন্য তিনি সমালোচনা করেননি। তাঁর সমালোচনায় বিচার, বিতর্ক, তুলনা, যুক্তি ও তথ্যসন্নিবেশ দেখেছি। তিনি অনেক বিপরীত মত, বিতর্কিত বিষয় ও প্রথাবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন।

অমূল্যধনের লেখার মধ্যে কিছু কিছু স্ববিরোধিতা দেখা যায়। তিনি এক জায়গায় যা সমর্থন করেছেন কিংবা নিন্দা করেছেন অন্য জায়গায় আবার তার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন। হয়তো বিভিন্ন সময়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল ব'লে এই অনবধানতা ঘটে গেছে। 'বাংলা সাহিত্য-সমালোচনা' নামক সুলিখিত প্রবন্ধে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'সেই সময়ে আর একটা ধুয়া উঠেছিল—বাঙালীত্ব। অমুকের কবিতায় বাঙালীত্ব বজায় আছে কিনা সেই বিবেচনায় তার সাহিত্যিক কৃতিত্ব যাচাই করা হ'ত। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় ও রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় নাকি খাঁটি বাঙালীত্ব বজায় নেই, এই কারণে তাঁদের উপর দোষারোপ করা হ'ত।' বাঙালীত্বর পরিমাণ দিয়ে সাহিত্যবিচারের পদ্ধতি অমূল্যধন সঙ্গত ভাবেই সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই আবার সাহিত্যবিচারে এই বাঙালীত্বর প্রসঙ্গ এনেছেন। শরৎচন্দ্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে ('অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র') শরৎসাহিত্যে এই বাঙালীত্বের কথাই এনেছেন। 'নাট্যকার গিরিশ-চন্দ্র' প্রবন্ধে 'প্রফুল্ল' নাটকের সমালোচনা না করে আবার সেই বাঙালীত্বর প্রসঙ্গ আনলেন: 'প্রফুল্ল নাটকের যত ত্রুটিই সমালোচকেরা বাহির করুন না কেন, ইহার উপযুক্ত অভিনয় দেখিলে অভিভূত না হন এমন বাঙালী কে আছেন? যদি কেহ থাকেন, স এব কৃপণঃ—তিনি কৃপার পাত্র।' একই লেখার মধ্যে দু'রকম উক্তিও দেখা যায়। 'সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক' নামক রচনায় 'কান্না-

তরু বর', 'ভবনই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী' প্রভৃতি চর্যাপদকে রূপক রচনা বলেছেন। আবার কিছু পরে 'তুলি তুলি পিঠা ধরণ ন জাই' পদটিকে প্রতীক রচনা বলেছেন। 'কবিগুরু' গ্রন্থে লেখক 'মানসী' কাব্যকে 'প্রভাতসঙ্গীত' ও 'কড়ি ও কোমল'-এর সঙ্গে প্রথম যুগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথের মানসী' গ্রন্থে 'মানসী' কাব্যকে অন্য অনেক সমালোচকের মতো তিনি নূতন যুগের সূচক কাব্যরূপে অভিহিত করেছেন। এ-ধরনের পরস্পরবিরোধী কিছু কিছু উক্তি তাঁর লেখায় পাওয়া যায়।

ছন্দ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে অমূল্যধনের মৌলিক গবেষণা এবং নব নব বিষয়ে আলোকপাত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচিত ও স্বীকৃত হয়েছে। 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' নামক গ্রন্থটি দীর্ঘকাল ধরে পাঠ্য থাকায় তাঁর বক্তব্য ও মতবাদ শিক্ষার্থী-মহলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। ছন্দের বিভিন্ন শ্রেণীর নতুন নামকরণ এবং অভিনব আলোচনাপদ্ধতি পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু কেউ তাঁকে অস্বীকার করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কবিদের ছন্দ নিয়ে তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনা প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে। কাব্যের ছন্দের উপর তিনি এতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন যে, কাব্যের মূল প্রাণবস্তুরূপে তিনি এই ছন্দের স্থান নির্দেশ করেছেন। 'কাব্যের ধর্ম' নামক রচনায় তিনি বলেছেন: 'সুতরাং, কাব্যের মূল লক্ষণ ছন্দ, অন্তরে ও বাহিরে ছন্দ।…ছন্দোময় উপলব্ধি কাব্যের মূল তত্ত্ব।' অন্যত্র ('কাব্যে কালান্তর') তিনি বলেছেন: 'কাব্যের বাহন হইয়াছে ছন্দ, ছন্দই বাক্যকে নিত্য ব্যবহারের লোক হইতে, অর্থের বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া বহুদূরে কাব্যলোকে লইয়া যায়।' ছন্দবাদীরা বলে থাকেন ছন্দ কাব্যের বাহন মাত্র নয়, ছন্দ কাব্যের প্রাণ। অমূল্যধনের কথায়: 'কাব্যের নানা ভাব ও চিন্তাময় দেহ তাহার প্রাণস্বরূপ ছন্দের আধার মাত্র। কাব্যের আসল বস্তু হইতেছে একরূপ ছন্দোময় উপলব্ধি, কাব্যের কথা ও ভাব সেই উপলব্ধির উপলক্ষ বা উপকরণ।' অমূল্যধন রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনায় ছন্দের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয় রূপই নিষ্ঠার সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছন্দের মধ্যে তিনি বৈচিত্র্যমুখিনতা ও নৃত্যধর্ম বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অমূল্যধনের প্রথম আলোচনা-গ্রন্থ হ'ল 'কবিগুরু' (১৯৫১)। 'স্বর্গের চক্রান্ত' নামক প্রস্তাবনাটি রসরচনা। তবে এরূপ লঘুরচনা তত্ত্বমূলক গ্রন্থের গোড়ায় না থাকলেই বোধ হয় ভালো হ'ত। প্রাথমিক প্রবন্ধগুলিতে

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ উল্লিখিত হয়েছে। কোন নতুন তত্ত্ব ও চিন্তার পরিচয় এগুলির মধ্যে নেই। রবীন্দ্রমানসের তিনটি ধারা লেখক লক্ষ্য করেছেন—ধীসত্তা, রসসত্তা ও চৈতন্যসত্তা। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের কাব্যপ্রবাহের বিবর্তনের মধ্যে. তিনি তিনটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন : যথা—অভাব (ভাবাভাব), ভাব, মহাভাব। এই লক্ষণগুলির ব্যাখ্যা বিতর্কমূলক এবং যেভাবে লেখক যুগবিভাগ ও পর্ববিভাগ করে এক-একটি পর্বকে এক-একটি লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করেছেন তাও বহু বিতর্ক ও বিরোধ সৃষ্টি করবে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'কড়ি ও কোমল' মহাভাবের কাব্য। 'মানসী' ভাবাভাবের কাব্য এবং 'সোনার তরী' ভাবের কাব্য এইভাবে কাব্যগুলিকে চিহ্নিত করলে কাব্যগুলির যথার্থ মর্ম উদ্‌ঘাটিত হয় কিনা, এবং কাব্যগুলির মূল্য ওইসব লক্ষণের মধ্য দিয়ে যথাযথভাবে নির্ধারিত হয় কিনা সে-সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ থেকে যায়। পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দের বিবর্তনধারা সম্পর্কে সামগ্রিক সুখপাঠ্য আলোচনা রয়েছে। রবীন্দ্রছন্দের মধ্যে লেখক একটি নারী-সুলভ প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

'রবীন্দ্রনাথের মানসী' গ্রন্থে অমূল্যধন 'মানসী' কাব্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। উপক্রমণিকায় তিনি এই কাব্যের শিল্পগুণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ; যথা—মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রথম প্রবর্তন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও মুক্তবন্ধ ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রসঘন ভাষা ব্যবহারে নৈপুণ্য, ইত্যাদি শিল্পসৌন্দর্যের সঙ্গে গভীর জীবনজিজ্ঞাসা ও মানবাত্মার শাশ্বত সন্ধান এই কাব্যে দেখা যায়। 'রবীন্দ্রকাব্যে মানসীর স্থান' নামক পরিচ্ছেদে 'মানসী'-র রোমান্টিকতা এবং কীট্‌সের কাব্যের সঙ্গে তুলনা করে যে আলোচনা করা হয়েছে তা অত্যন্ত সারগর্ভ। কিন্তু 'সোনার তরী' সম্পর্কে লেখকের মত কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। " 'মানসী'তে বিশ্বপ্রকৃতি, প্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে যে সহজ সাধারণ উপলব্ধির পরিচয় আছে, পরবর্তী যুগে একটা অসাধারণ অনুভূতি তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। এইজন্যই 'মানসী' সর্বজনপ্রশংসিত, অথচ 'সোনার তরী'তে কবিত্ব-শক্তির অধিক প্রমাণ থাকাতেও ইহার কাব্যগুণ সম্পর্কে সন্দেহ উঠিয়াছিল।" কবিত্বশক্তির প্রমাণ থাকলে কাব্যগুণ সম্পর্কে কি-ভাবে সন্দেহ উঠতে পারে ? কথাটার অর্থ কি ? 'মানসী' অপেক্ষা 'সোনার তরী' কাব্যে প্রেম ও বিশ্বপ্রকৃতির উপলব্ধি গভীরতরভাবে এবং অধিকতর কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ

পেয়েছে, এ তো প্রায় সর্ববাদীসম্মত। এই সমালোচনা-গ্রন্থের পরিচ্ছেদগুলি খুব সংক্ষিপ্ত। গভীর ও বিস্তারিত আলোচনা কোনো বিষয়ে নেই। সেজন্য পড়বার সময় আমাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় বটে, কিন্তু সামগ্রিক প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে তা তৃপ্তিলাভ করে না।

সাহিত্যসমালোচক অমূল্যধনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় 'আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা'র (১৯৬০) রচনাগুলিতে। সমালোচনাগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা, সেজন্য প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, কোনোটির সঙ্গে কোনোটির যোগ নেই। কিন্তু লেখা-গুলির বিষয়বৈচিত্র্য দেখে বোঝা যায়, লেখকের পঠন ও জিজ্ঞাসা কত বহুবিস্তৃত ছিল। পরিশিষ্টে তিনি স্বক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন ; অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্যের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তুলনামূলক আলোচনা যে-সব জায়গায় করেছেন সেই জায়গাগুলি অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক হয়েছে। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মত অকুণ্ঠ ও স্পষ্ট।

'সাহিত্যে আধুনিকতা' নামক প্রথম প্রবন্ধটি অত্যন্ত সুলিখিত এবং সনাতনী সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের তফাৎ কোথায়, লেখক তা সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক যদিও নিজেকে সনাতনী দলভুক্ত করেছেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সম্পূর্ণ অপক্ষপাতী।

'কাব্যের ধর্ম' প্রবন্ধটিতে প্রাচ্য অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। রসবাদ, ধ্বনিবাদ, রীতিবাদ, বক্রোক্তিবাদ ও ঔচিত্যবাদ নিয়ে তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করে তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর পাননি। সব মতবাদ আলোচনা করে তিনি বললেন, 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর।' ছন্দবাদী অমূল্যধনের শেষ কথা হ'ল : 'কাব্যের মূল লক্ষণ—ছন্দ, অন্তর ও বাহিরে ছন্দ।' এই মতবাদ নিয়েও বিতর্ক চলতে পারে। সাহিত্যক্ষেত্রে বিতর্কের কি শেষ আছে ? 'কাব্যে কালান্তর' প্রবন্ধে আধুনিক কাব্যের লক্ষণগুলি তিনি পর পর নির্দেশ করেছেন। এখানেও তিনি শেষ করেছেন ছন্দের আলোচনায়—আধুনিক কবিতার মুক্তছন্দ ব্যাখ্যায়। 'সাহিত্যিক নাস্তিকতা' প্রবন্ধে মার্কস্‌বাদী বিচারপদ্ধতিকে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। এখানে লেখক লোকোত্তর রসবাদকেই বস্তুবাদী সমালোচনার উপরে স্থান দিয়েছেন।

'সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক' প্রবন্ধে তিনি একটি বিতর্কিত এবং বহু-আলোচিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। তিনি সঙ্কেত কিংবা সাঙ্কেতিকতার জায়গায় প্রতীক

কথাটি ব্যবহার করেছেন ; প্রবন্ধের একেবারে শেষে সাঙ্কেতিক কথাটি ব্যবহার করেছেন। অনেক জায়গায় তাঁর উক্তি নানা সংশয় উদ্রেক করে। তিনি বলেছেন, রূপক রচনার উৎপত্তি হয়েছে অলৌকিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য। তাই কি ? বিশেষজ্ঞরা তো বলেছেন, রূপকে লৌকিক উপায়ের মধ্য দিয়ে লৌকিক তত্ত্ব ও নীতিরই আভাস দেওয়া হয়। ধর্মসাধনায় কথায় ও গানে অনেক রূপকের ব্যবহার হয়, কিন্তু সেখানে রূপকের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব লৌকিক বুদ্ধি ও চিন্তার আয়ত্ত। অলৌকিকতার আভাস দেওয়া যায় শুধুমাত্র সাঙ্কেতিক রীতির মধ্য দিয়ে। 'রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রতীকের ব্যবহার বেশী নয়'—এ-উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। " 'রাজা' নাটককে নীরস রূপক নাটক বলা যেতে পারে"—এ-মন্তব্যও বিস্ময়কর।

'রম্যরচনা' প্রবন্ধে রম্যরচনার প্রকৃতি এবং কোন্ কোন্ রচনাকে রম্যরচনা বলা যায় না তা আলোচনা করেছেন। Personal essay কিংবা ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে কি রম্যরচনা বলা যায় ? লেখক এ-বিষয়ে আলোচনা করেননি। রম্যরচনার কিছু দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করলে ভালো হ'ত। 'বাংলা সাহিত্য-সমালোচনা' একটি আকর্ষণীয় রচনা। বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার হাস্যকর দিকগুলি লেখক সঙ্গতভাবেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন্ সমালোচনা পদ্ধতি তাঁর আদর্শ তা ব্যাখ্যা করেননি। কেন ঈশ্বর গুপ্ত ও রাজসিংহ যথার্থ সমালোচনা তাও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলেননি। রবীন্দ্রনাথের impressionistic সমালোচনার বিপদের কথা বলে আবার 'রাজসিংহ'-কে কেন আদর্শ সমালোচনা বললেন ? এ-সব বিষয় তাঁর লেখায় স্পষ্ট হয়নি।

অমূল্যধন কবিতার সমালোচনায় সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। 'আধুনিক বাংলা কবিতার পঁচিশ বছর (১৯২৬—৫০)' প্রবন্ধটিতে বাংলা কবিতার একটি আকর্ষণীয় আলোচনা তিনি উপহার দিলেন। টি. এস. এলিঅট প্রভৃতি কবির সঙ্গে তুলনার ফলে তাঁর আলোচনা আরো বেশি সারগর্ভ হয়েছে। 'সাম্প্রতিক বাংলা কথা-সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব' প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে। শুধুমাত্র নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের উপন্যাস নিয়ে লেখক আলোচনা করলেন, কিন্তু কল্লোল-গোষ্ঠী ও ভারতী-গোষ্ঠীর বহুতর কথাসাহিত্যিকের কোনো নাম উল্লেখ করলেন না। আর চেতনাস্রোতপদ্ধতির লেখকদের সম্পর্কেও আরো বিশদ আলোচনা করতে পারতেন।

'ভক্তকবি রামপ্রসাদ' প্রবন্ধে লেখক রামপ্রসাদ সম্পর্কে অনেক নতুন চিন্তা আমাদের মনে উদ্রেক করেছেন। রামপ্রসাদ তাঁর গানগুলির মধ্যে তখনকার সংসার-জীবনের কথা বলেছেন, কিন্তু রামপ্রসাদকে লেখক কোন্ অর্থে আধুনিক বলেছেন ? আধুনিক মানবতাবাদ রামপ্রসাদের কবিতায় আবিষ্কার করা একটু কষ্টকল্পনা বলে মনে হয়। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতার একটি রসগ্রাহী আলোচনায় লেখক যথার্থ বলেছেন যে, তাঁর কবিতার রূপ ও আঙ্গিক আধুনিক নয় বলেই আধুনিক মনের কাছে তিনি জনপ্রিয় নন।

'অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে লেখক প্রাথমিক কিছু প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় তাঁর নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন : 'তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অনেক দিক দিয়া শরৎচন্দ্র খুবই রক্ষণশীল।' শরৎচন্দ্র কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্ষণশীল সমাজের যথাযথ চিত্র এঁকেছেন বটে, কিন্তু রক্ষণশীল সমাজকে কোথাও সমর্থন ও সহানুভূতি জানিয়েছেন কি ? লেখক বলেছেন : 'তাঁহার উপন্যাসে অনেক সময়ই জীবনের সাধারণ সত্য ও স্বাভাবিক গতিকে লঙ্ঘন করিয়া কাহিনীর একটা মুখরোচক পরিণতি দেখান হইয়াছে।' কোথায় ? 'দত্তা', 'পরিণীতা'র মতো মাত্র স্বল্প কয়েকটি উপন্যাস ছাড়া মুখরোচক পরিণতি কোথায় ? লেখকের মন্তব্য : 'শরৎচন্দ্রের মধ্যে যথার্থ বৈজ্ঞানিকসুলভ বাস্তবপন্থী দৃষ্টি ছিল না।' দেনাপাওনা, চরিত্রহীন, পথের দাবী, গৃহদাহ, শেষ-প্রশ্ন উপন্যাসে কী দৃষ্টি ছিল ? লেখকের আর একটি সিদ্ধান্ত : 'অপক্ষপাত দৃষ্টি তাঁহার নাই। জীবন সম্বন্ধে কোন একটা সামগ্রিক বোধ বা একটা জীবনদর্শন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রকাশ পায় নাই।' শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে তিনি কান্নার জোলাপ বলেছেন। এ-ধরনের উক্তি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার তীক্ষ্ণ প্রতিধ্বনি মাত্র। প্রথমদিককার কিছু গল্প-উপন্যাস ছাড়া শরৎচন্দ্রের রচনায় কান্নার বাড়াবাড়ি কোথায় ? লেখকের ভবিষ্যদ্বাণী : 'আজি হতে শতবর্ষ পরে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হইলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস কতটা হৃদয়গ্রাহী থাকিবে তাহা সন্দেহের বিষয়।' শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর শতবর্ষ না হোক, পঞ্চাশ বর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং শরৎচন্দ্রের সমকালীন সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু শরৎ-চন্দ্র এখনও জনপ্রিয়তম ঔপন্যাসিক।

'নাট্যকার গিরিশচন্দ্র' প্রবন্ধে লেখক শেকস্‌পীয়রের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের তুলনায় আপত্তি করেছেন। ইংরেজ কবিদের সঙ্গে বাঙালী কবিদের অনবরত

তুলনা হয়, সেজন্য ইংরেজ নাট্যকারের সঙ্গে বাঙালী নাট্যকারের তুলনায় আপত্তি হবে কেন ? তবে শেকস্‌পীয়রের সমকক্ষ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে কখনই বলা যায় না। স্বয়ং গিরিশচন্দ্রই বলেছেন : 'মহাকবি সেক্ষপীয়রকে অনুসরণ করে চলেছি।' একাধিক জায়গায় তিনি শেকস্‌পীয়রের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এ-প্রভাব কোথায় কোথায় পড়েছে, তা আলোচনা করা যাক। প্রথমত, শেকস্‌পীয়রের নাটকের বৃত্তগঠনরীতি তিনি গ্রহণ করেছেন। পঞ্চাঙ্ক ও অঙ্কের অন্তর্গত দৃশ্যবিভাগ তিনি গ্রহণ করেছেন। শেকস্‌পীয়রীয় বৃত্তের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যরূপ তিনি অনুসরণ করেছেন। বৃত্তগঠনের এই অবিচ্ছিন্নতা ও দৃঢ়বদ্ধতার জন্য তাঁর পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকও অসংলগ্ন ও শিথিলবৃত্ত যাত্রার স্তরে পরিণত হয়নি। দ্বিতীয়ত, গিরিশচন্দ্রের অনেক চরিত্র দ্বন্দ্বময়, সংগ্রামশীল, শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিক চরিত্রের অনুরূপ। তৃতীয়ত, চণ্ড, সিরাজদৌল্লা, মীরকাসিম প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকগুলি শেকস্‌পীয়রীয় নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবে লিখিত। চতুর্থত, শেকস্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডির প্রভাবে তাঁর সামাজিক নাটকের রস-পরিণতি ঘটেছে, যদিও শেকস্‌পীয়রীয় নাটকের ট্র্যাজিক রস ও তাঁর সামাজিক নাটকের করুণ রস ঠিক একজাতীয় রস নয়। মানব-স্বভাবের বিকৃতি ও বিপর্যয়ে শেকস্‌পীয়রের নাটক পরিপূর্ণ : হত্যা, রক্তপাত, বিশ্বাসঘাতকতা, ছলনা, প্রতারণা, ব্যভিচার ইত্যাদি সেখানে নাটকীয় উপাদান যুগিয়েছে ; গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক একই ধরনের উপাদানে পরিপূর্ণ। যাত্রার ভক্তিময়তা, দৈবশক্তির উপর নির্ভরতা, অতিপ্রাকৃত প্রভাব এবং গানের আতিশয্য গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের উপর কিছু প্রভাব-বিস্তার করেছে বটে, কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিত গঠন-পারিপাট্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভেঙে গৈরিশী ছন্দের নাটকীয় প্রয়োগ এবং চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতময় রূপ গিরিশচন্দ্রের নাটককে মঞ্চে অভিনেয় নাটকের স্তরেই বজায় রেখেছে। বিল্বমঙ্গল, জনা, বুদ্ধদেবচরিত যথার্থভাবেই মঞ্চনাটক। বিল্বমঙ্গল নাটকের মূল ভাব এবং চরিত্র-গুলির বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে লেখক যে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে গভীরতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

'দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান' নিয়ে অমূল্যধনের বিস্তারিত আলোচনায় হাসির গানের প্রকৃতি, বিষয় ও হাস্যরস নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হাসির গানে নানা ধরনের রস আছে। কোনো কোনো গানে উদ্ভট চরিত্র ও

পরিস্থিতি থেকে নিছক কৌতুক-রস, কোনো কোনো গানে sublime ও ridiculous-এর পাশাপাশি অবস্থান থেকে উদ্ভূত অসঙ্গতিজনিত হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে, কোথাও ব্যঙ্গের কাঁটাগুলি একটু তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ করে। আবার কোথাও-বা নিছক রঙ্গরসে কবি মাতোয়ারা। সর্বত্রই একটু মজা করাই তাঁর লক্ষ্য।

আলোচ্য সমালোচনা-গ্রন্থের শেষতম প্রবন্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কয়েকটি মৌলিক লক্ষণ লেখক উল্লেখ করেছেন। শেষ-দিকের তিনটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। 'রবীন্দ্র-সমস্যা' প্রবন্ধটি সম্পর্কে লেখক নির্দেশ দিয়েছেন : 'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে এই প্রবন্ধটি পঠনীয়।' সুতরাং আমাদের জীবদ্দশায় এটি পাঠ করা আর হয়ে উঠবে না। রবীন্দ্রনাথ যে যথার্থ-ভাবে জাতির অন্তরাত্মার প্রতীক, লেখক সে-বিষয়ে আলোচনা করলেন 'জাতীয় সত্তার প্রতীক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অমূল্যধনের মত নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

সাহিত্য-সমালোচক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

অনেকসময় এ-ধরনের ঘটনা, বলতে পারি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, কারো কারো জীবনে অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সারস্বত জীবনও এ-ধরনের ঘটনার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তস্থল। তাঁর জীবনে দেখি, একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সিদ্ধি ও সাফল্যের ফলে তাঁর প্রতিভার অন্য একটি দিকের পরিচয় বহুলাংশে প্রচ্ছন্ন থেকে গিয়েছে পাঠকসমাজে। বস্তুত ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের ব্যাপক পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠার আড়ালে অনেকখানি ঢাকা পড়ে গেছে তাঁর সাহিত্য-সমালোচক সত্তা। বর্তমান নিবন্ধের অন্বিষ্ট হ'ল অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সেই প্রচ্ছন্ন প্রতিভার স্বরূপটিকে পাঠকসমাজের কাছে উন্মোচিত করা।

অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের বাংলা সমালোচনা গ্রন্থের সংখ্যা তিনটি। সংখ্যা গণনার বিচারে নিশ্চয় তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। আয়তনের দিক থেকেও আদৌ স্ফীতকায় বলা চলেনা এদের। কিন্তু সেইসব গ্রন্থের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের অনন্যসাধারণ মনস্বিতায় নিঃসন্দেহে মুগ্ধ হয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে মাতৃভাষার সেবা করে গেছেন অমূল্যধন। তাঁর অসামান্য কীর্তি 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র'-ই তাঁর প্রথম প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ। এরপর সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রথম গ্রন্থ 'কবিগুরু' বেরোয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। বাকি দুটি গ্রন্থ 'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা' ও 'রবীন্দ্রনাথের মানসী' প্রকাশিত হয় একই বছরে—১৯৬১ সালে।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনা-গ্রন্থগুলি সম্পর্কে কিছু বলার আগে তাঁর সমালোচক সত্তা সম্পর্কে সাধারণভাবে দু'-একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় একটি নিবন্ধে শ্রেষ্ঠ সমালোচকের যে গুণাবলী নির্দেশ করেছিলেন সেগুলি হল: স্বভাবসিদ্ধ রসগ্রাহিতা, অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের উপযোগী প্রতিভা, অভ্রান্ত বিচারশক্তি, ইত্যাদি। আমরা মনে করি,

অমূল্যধন যে গুণগুলি তাঁর শিক্ষাগুরু, সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন—বস্তুত সেইসব গুণাবলী তাঁর স্বল্পসংখ্যক সমালোচনা-গ্রন্থের সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন মনোযোগী পাঠকমাত্রেই। রসানুভূতির সঙ্গে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি এবং মর্মগ্রাহিতার সঙ্গে মননশীলতার একাত্মতার ফলে যথার্থ উন্নতমানের সমালোচনার যে সামর্থ্য জন্মায়—বলা বাহুল্য, অমূল্যধন সেই বিশিষ্ট শক্তির অধিকারী ছিলেন।

২

সমালোচক হিসাবে এইসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকাংশেরই পরিচয় মেলে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত সাহিত্য-সমালোচনা-গ্রন্থ 'কবি-গুরু'তে। অমূল্যধনের আগে রবীন্দ্রসমালোচনার ক্ষেত্রে বহু বিশিষ্ট সমালোচকের আবির্ভাব ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অনুপুঙ্খ রসগ্রাহী বিচার-বিশ্লেষণে ও তার রসলোকের মর্ম-উদ্‌ঘাটনে তাঁদের সামর্থ্য সংশয়াতীত। কিন্তু অমূল্যধন সেই পূর্বসূরিদের অনুসৃত ধারা-প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলেন না, বরং তাতে যোজনা করলেন এক নতুন তরঙ্গবেগ। পূর্বসূরিদের হাতে-জ্বালা দীপালোকে রবীন্দ্র-কাব্যের মুখচ্ছবি দেখতে চাইলেন না, তিনি জ্বাললেন তাঁর আপন রসগ্রাহী গভীর-সঞ্চারী মনের আলোক। সেই আলোকে রবীন্দ্রকাব্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক নতুন ভাষ্যের দীপ্তিতে, 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র'র মতো রবীন্দ্রকাব্যেরও একটি অজ্ঞাতপূর্ব মূলসূত্র আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করলেন অমূল্যধন। আগেই বলেছি, 'কবিগুরু' গ্রন্থটি ক্ষুদ্রায়ত। স্বাভাবিক কারণেই এতে সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যের কবিতাবলীর ভাববস্তু বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্যসন্ধান প্রত্যাশিত নয়। লেখকের তা অভিপ্রেতও নয়। তিনি এই গ্রন্থরচনার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে বলেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলীর বিশদ ব্যাখ্যা নহে, রবীন্দ্র-কাব্যের মূলসূত্রের নির্দেশই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।' অন্যত্র বলেছেন, '…এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে রবীন্দ্রকাব্যের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য এবং রবীন্দ্রমানসের অভিব্যক্তির ধারা নির্ণয়ের প্রয়াস করিয়াছি।' (প্রথম সংস্করণের 'নিবেদন')

লেখকের এই মন্তব্য দুটিকে একত্র করলেই লেখকের উদ্দেশ্য স্পষ্টতর হবে। লেখকের আসল লক্ষ্য রবীন্দ্রমানসের অভিব্যক্তির ধারা নির্ণয়। বিভিন্ন সমালোচক রবীন্দ্রকাব্যবিচারে রবীন্দ্রমানসের পরিচয় পরিস্ফুট করতে প্রয়াসী

হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সকলের আলোচনায় কবিমানসের অভিব্যক্তির তেমন কোন স্পষ্ট সুনির্দিষ্ট ধারা নির্দেশিত হয়নি। অনেকে কাব্যগুলি নিয়ে পৃথক পৃথক আলোচনা করেছেন, কেউ-বা একাধিক কাব্যের সমবায়ে এক-একটি পর্ব বা যুগবিভাগ করে সেই পর্ব বা যুগের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত কোন মূলসূত্র আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছেন অতি বিরলসংখ্যক সমালোচক। অমূল্যধন তাঁদের অন্যতম, এবং আপন স্বাতন্ত্র্য-গৌরবে অদ্বিতীয়।

লেখক তাঁর 'কবিগুরু' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে একটি নূতন অধ্যায় যুক্ত করেছেন। অধ্যায়টির শিরোনাম: 'রবীন্দ্রমানসের ত্রিধারা'। এই অধ্যায়ে তিনি রবীন্দ্রমানসের বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের মধ্যে এক গভীরতর সত্যের সন্ধানে নিরত হয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'এই সত্যের ভিত্তি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে।' অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতে, রবীন্দ্রনাথের সেই অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের তিনটি প্রধান অংশ—ধী সত্তা, রস-সত্তা ও চৈতন্য-সত্তা। রবীন্দ্রনাথের ধী-সত্তার প্রকাশ তাঁর মননশীল যুক্তিবাদে, তাঁর বাস্তব নিষ্ঠায় ও অনলস কর্ম-সাধনায়। এই সত্তার প্রকাশ হয়েছে প্রধানত তাঁর মনীষাদীপ্ত বহুসংখ্যক গদ্য-রচনায় এবং গতিশীল বহুমুখী কর্মসাধনায়। দ্বিতীয় অংশ 'রসসত্তা'র বিস্ময়কর প্রকাশ তাঁর কবিতায়, গানে ও চিত্রকলায়: "এই রসসত্তার আবেশই রবীন্দ্র-জীবনের প্রধান তত্ত্ব, ইহাই তাঁহাকে মুখ্যত কবি ও শিল্পী করিয়াছে।"

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় যথার্থই নির্দেশ করেছেন যে, বাস্তব- ও যুক্তি-নিষ্ঠ ধী-সত্তা এবং সৌন্দর্য- ও কল্পনা-আশ্রয়ী রস-সত্তার এই দুটি ধারা রবীন্দ্রমানসে বরাবরই প্রবল ছিল—তাঁর কাব্যে এরা অনেকসময় পাশাপাশি বয়ে চলেছে। কবি তাঁর স্বীয় জীবনে ও সারস্বত রচনায় এই দুটি আপাতবিরোধী ধারাকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন।

রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের তৃতীয় ধারা হ'ল তাঁর চৈতন্য-সত্তার প্রকাশ। যে ধর্ম- ও অধ্যাত্ম-বোধ রবীন্দ্রকাব্যে 'পূর্বাপর অনুস্যূত'—তাতেই এই ধারার পরিচয়। বলা বাহুল্য, তাঁর কাব্যে এই বোধের যে প্রকাশ, তা নিতান্ত ঔপ-নিষদিক তত্ত্ব-সঞ্জাত নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে স্বকীয় উপলব্ধির কথাই বলেছেন।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতে, যে রোম্যান্টিকতা রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান

লক্ষণ, তার উৎস এই ধর্মবোধ বা আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি। 'নিষ্ফল কামনা' ও 'নিরুদ্দেশযাত্রা'য় নিহিত প্রথমজীবনের রোম্যান্টিক ব্যাকুলতা শেষজীবনে পরিণত রূপ পেয়েছে 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' এবং 'আমার আমির ধারা, মিলে ···যাবে ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসঙ্গমে'—এই নিগূঢ় অধ্যাত্ম-উপলব্ধিতে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিপ্রবাহের গভীরে অমূল্যধন রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের এই তিনটি প্রধান ধারার স্রোতোবেগের সন্ধান পেয়েছেন। লেখক কর্তৃক রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের এই মূলসূত্র আবিষ্কারের প্রবণতা শেষ অবধি প্রসারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ধারার বিভিন্ন যুগ ও পর্বের স্বরূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন যুগ ও পর্বের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবিকাশের সূত্র-সন্ধান-প্রসঙ্গে অমূল্যধন ভারতীয় দর্শনের সুবিখ্যাত 'ভাবাভাব, ভাব ও মহাভাব' তত্ত্বসূত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের অভিব্যক্তির গূঢ় সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেল-এর Thesis, Anti-thesis ও Synthesis—এই পারম্পর্যের কথা যে স্বভাবতই মনে আসতে পারে, সে-বিষয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সম্পূর্ণ অবহিত। কিন্তু তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, হেগেল-কথিত সূত্রের সঙ্গে রবীন্দ্র-মানসের বিবর্তন-সূত্রের আপাতসাদৃশ্য থাকলেও, মূলত তাদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান।

রবীন্দ্র-সমালোচনার জগতে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক এই মূলসূত্র-সন্ধান-প্রয়াস এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা কেবল সংখ্যার দিক থেকে অজস্র অগণ্য নয়। তার ভাববৈচিত্র্যও এত অপরিমিত যে, পাঠক এই রবীন্দ্রকবিতার বিপুলায়ত জটিল অরণ্যে যেন দিশাহারা হয়ে যায়। এই অসংখ্য অজস্র কবিতার মধ্যে কোন ভাবগত শৃঙ্খলা বা সূত্র খুঁজে না পাবার ফলে পাঠকের মনে হতে পারে যে, কবিতাগুলি বুঝি 'কবিচিত্তের অবিমিশ্র স্বচ্ছন্দ-চারিতার নিদর্শন' মাত্র। কবি বুঝি তাৎক্ষণিক অনুভূতি আশ্রয় করে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলি একের পর এক খেয়ালখুশীমতো রচনা করে গেছেন। অবশ্য আমরা জানি যে, কবি স্বয়ং তাঁর এই বিপুল ও আপাতবিচ্ছিন্ন কবিতার প্রবাহ-কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও ভাষ্য রচনা করে একটি ঐক্যসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করেছেন। স্বীয় কাব্য সম্পর্কে তাঁর সেই অতিপরিচিত ঐক্যবিধায়ক সূত্র 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা' কেবল নয়, 'আত্মপরিচয়'

গ্রন্থে ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কবির মন্তব্য এর সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু সেই-সব ব্যাখ্যার অন্যবিধ যে মূল্যই থাক-না, তার সাহায্যে কবির 'সমগ্র' কাব্য-প্রবাহের অন্তর্নিহিত কোন নিগূঢ় ঐক্যবিধায়ক সূত্রের সন্ধান মেলে কি? সে-দিক থেকে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের এই মূলসূত্র সন্ধানের প্রয়াস সশ্রদ্ধ প্রশংসার দাবী রাখে। এর মধ্য দিয়ে একাধারে তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, বিচার-নিয়ন্ত্রিত মননশীলতা ও প্রগাঢ় রসানুভূতির পরিচয় মেলে। সমালোচকপ্রবর ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবিগুরু' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় অমূল্যধনের এই মূলসূত্র সন্ধানের উচ্চ প্রশংসা করতে গিয়ে বিশেষভাবে তাঁর আলোচনা-পদ্ধতির 'জড়িমাহীন মনীষাদীপ্ত সুস্পষ্টতার' উপর জোর দিয়েছেন। আমরাও ডঃ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের এই মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করি। রবীন্দ্রকাব্যের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে অনেকেই এর সৌন্দর্য-কল্পনা ও ভাবের অন্তঃস্রোতের টানে কিছুটা ভেসে গেছেন। বিশেষ কবিতা বা কাব্যের ভাব-সৌন্দর্যের যথার্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এঁরা সক্ষম হলেও, এঁদের দৃষ্টির আলোয় কবিমানসের অভিব্যক্তির সামগ্রিক রূপটি তেমন সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়নি। সেই অসম্পূর্ণ কাজটি সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করেছেন অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমরাও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব সম্পর্কে অভিন্ন-মত যে, 'রবীন্দ্রসাহিত্যের সমগ্র পরিকল্পনা, ইহার পরিণতির বিভিন্ন স্তরগুলি যে কবিমানসের একটি বিশেষ পরিবর্তনশীল অন্তঃপ্রেরণায় শৃঙ্খলিত হইয়া নিয়মসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে……সে বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট জ্ঞান রবীন্দ্রকাব্য বিচারে যে বিশেষভাবে সহায়তা করিবে, তাহা নিঃসন্দেহ।'

৩

ভাব, ভাবাভাব ও মহাভাব—সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবিকাশের মূলসূত্র হিসাবে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই তিনটি স্তর নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যচক্রকে একটা continued spiral (সীমাহীন কম্বুরেখা) মনে হয়। কম্বু-রেখার গতির অনুসরণ করিয়া তাঁহার কাব্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবিরাম ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর লোকে প্রয়াণ করিয়াছে।" এ-থেকে বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে অমূল্যধনের এই মূলসূত্র-সন্ধান নিতান্ত যান্ত্রিক ব্যাপার নয়, বস্তুত এর মধ্য দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার উত্তরণধর্মী চেতনার মহান্ রূপকেই প্রত্যক্ষ করতে

চেয়েছেন।

ভাব, ভাবাভাব ও মহাভাবের এই মূলসূত্রের মাপকাঠিতে অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যকে মোট আঠারো পর্বে বিভক্ত করতে চেয়েছেন। এর প্রথম পর্বে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্য ও অষ্টাদশ বা শেষ পর্বে 'রোগশয্যায়' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত কাব্যসমষ্টি। এই আঠারোটি পর্বের অন্তর্গত একাধিক পর্ব নিয়ে এক-একটি যুগের পরিকল্পনা। যেমন, প্রথম যুগের অন্তর্গত তিনটি পর্ব 'প্রভাতসঙ্গীত' এবং 'ছবি ও গান' (ভাব), 'কড়ি ও কোমল' (মহাভাব) এবং 'মানসী' (ভাবাভাব)। দ্বিতীয় যুগেরও অন্তর্গত তিনটি পর্ব : 'সোনার তরী' (ভাব), 'চিত্রা', 'চৈতালী' (মহাভাব) এবং 'কল্পনা', 'কথা ও কাহিনী' (ভাবাভাব)। এভাবে একের পর এক যুগ ও পর্বের আবির্ভাব ঘটেছে।

আগেই বলেছি, অমূল্যধন-কথিত মূলসূত্রটি হেগেলের Thesis, Anti-thesis ও Synthesis—ত্রি-তত্ত্ব থেকে মূলতঃ পৃথক। রবীন্দ্রনাথের সাধনার ইতিহাসে হেগেলের মতো ভাবের অনুক্রম ভাবাভাবে নয়, মহাভাবে। অর্থাৎ 'সোনার তরী'র পর 'কল্পনা' নয়—'চিত্রা'। রবীন্দ্রসাধনায় 'মহাভাবের পর ভাবাভাব দেখা দেয় বটে, কিন্তু এই বিরোধের অবসান ঘটে বৃহত্তর কোন ভাবের মধ্যে উভয়ের সম্মিলনে নহে, একটা নূতন অপ্রত্যাশিত (emergent) আবির্ভাবে।' ভাবধর্মী পর্বের কাব্য—প্রভাতসঙ্গীত, সোনার তরী, ক্ষণিকা, খেয়া, পূরবী ও প্রান্তিক-এর মৌলিক উপলব্ধির কথা চিন্তা করলেই সমালোচক শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সারবত্তা সহজেই প্রতিপন্ন হ'বে।

অমূল্যধন 'কবিগুরু' গ্রন্থে রবীন্দ্রকাব্যের মূলসূত্র নির্দেশ করেছেন। সূত্র-নির্দেশ যিনি করেন, স্বভাবতই মনন ও যুক্তি তাঁর পথের দিশারী। রস-সম্ভোগ তাঁর অন্বিষ্ট নয়। এর ফলে এ-ধরনের রচনা স্বাদহীন ও নীরস হবার আশঙ্কা। কিন্তু শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের ছিল সহজাত হৃদয়সংবাদী রসানুভবশক্তি, যার ফলে তিনি রবীন্দ্রকাব্যের কেবল মূলসূত্রের সন্ধান পাননি, সেইসঙ্গে তার অন্তর্নিহিত গভীর প্রাণধর্ম ও রসস্বরূপকেও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এ-কারণেই 'কবিগুরু' গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য পাঠকের কেবল মননকেই স্পর্শ করে না, তা তার সমগ্র সত্তার কাছে প্রত্যয়সিদ্ধ হয়ে ওঠে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছা ছিল : 'এই গ্রন্থের মন্তব্যগুলি সম্প্রসারণ করিয়া রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশ করিব' (দ্র. দ্বিতীয়

সংস্করণের ভূমিকা, 'কবিগুরু')। আমাদের দুর্ভাগা, তাঁর সে-ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। কেবল তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের মানসী' নামক ক্ষুদ্রায়ত গ্রন্থে এ-ধরনের আলোচনার স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু এ তো কেবল একটি কাব্যের সমালোচনা। সেই পূর্ণাঙ্গ 'বিস্তারিত আলোচনাগ্রন্থ' প্রকাশিত হলে অমূল্যধনের মনীষা ও রসগ্রাহিতার সার্থকতর সম্মিলনে রবীন্দ্র-সমালোচনার জগৎ নিঃসন্দেহে আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠত।

৪

সাহিত্য-সমালোচক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের আর-একটি স্মরণীয় আলোচনা-গ্রন্থ—'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা'। গ্রন্থটিতে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক (যেমন কবিতা, কথাসাহিত্য, নাটক ইত্যাদি) অবলম্বনে কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। বেশির ভাগই রবীন্দ্র-সমকালীন বা রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্য অথবা অপেক্ষাকৃত পুরনো যুগের সাহিত্যকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের প্রয়াস। রবীন্দ্রকাব্যের অপরূপ ইন্দ্রজালে, কবির অসামান্য রসকল্পনা ও সৌন্দর্য-চেতনায় শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো সহৃদয়, সংবেদী পাঠকের চিত্ত গভীরভাবে আবিষ্ট হলেও তাঁর সাহিত্যবোধের শেষসীমান্ত কেবল রবীন্দ্রনাথ নন। তিনি 'ক্লাসিকস্'-এর পরম অনুরাগী সন্দেহ নেই, কিন্তু সেজন্য আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ও আগ্রহ বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায়নি। তাঁর নিজের কথায় : 'সাহিত্যবিচারে আমি উদারনৈতিক। সনাতনী হইলেও আমি আধুনিক সাহিত্যের রসগ্রাহী' ('নিবেদন'—আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা)। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর এই রসদৃষ্টির মূলে আছে, এই সাহিত্যে তাঁর ব্যাপক ও গভীর প্রবেশ এবং সাহিত্যের এই পর্যায় সম্পর্কে তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব। 'সাহিত্যে আধুনিকতা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : 'অতি-আধুনিকতাকে মাত্র সাময়িক অনাচার হিসাবে দেখা সমীচীন হইবে না। ইহার একটা নিজস্ব পদ্ধতি এবং একটা নিজস্ব গৌরব ও মাহাত্ম্য আছে। মানবাত্মার গভীরতম উপলব্ধির প্রকাশ হিসাবে বা তাহার বিচিত্র প্রয়াসের নির্দেশক ধ্রুবতারা হিসাবে ইহার মূল্য ও সার্থকতা উপেক্ষার যোগ্য নয়' (আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা, পৃ. ১)।—এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে আধুনিক সাহিত্যের তাৎপর্য ও পদ্ধতি বিচার করেছেন অমূল্যধন। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'সাহিত্যে আধুনিকতা'য় লেখক

বৈজ্ঞানিক মনোভাব তথা নাস্তিক জড়বাদ, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, বিদ্রোহ-চেতনা, নৈরাশ্যময় মনোবৃত্তি ইত্যাদি কয়েকটি লক্ষণের সাহায্যে যেমন সাহিত্যে আধুনিকতার স্বরূপ নির্ণয় করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি 'কাব্যে কালান্তর'-এ আধুনিক কবিতার গঠনরীতির স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণে প্রয়াসী হয়েছেন। পূর্বোক্ত দুটি নিবন্ধ এবং 'কাব্যের ধর্ম', 'সাহিত্যিক নাস্তিকতা', 'সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক' প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়াশ্রয়ী নিবন্ধের মধ্য দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত মনস্বী এই লেখকের যে দূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে, তার আলোয় কেবল বাংলা সাহিত্য নয়, সাধারণভাবে সাহিত্যভাবনার এক সামগ্রিক প্রেক্ষাপট উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পাঠকমনে।

৫

এই সংকলনগ্রন্থের একটি বিশেষ উল্লেখ্য প্রবন্ধ 'সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক'। লেখকের মনন-চিন্তার বিশিষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে প্রবন্ধটি। বেদ ও বাইবেল থেকে শুরু করে আবহমান সাহিত্যে সকল প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে রূপ ও প্রতীকের সংজ্ঞা, পরিচয় ও স্বরূপ নির্ধারণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। রূপক ও প্রতীক নিয়ে সাধারণ সাহিত্যপাঠকের মনে যে অস্পষ্টতা আছে—লেখক তা বিস্তৃত বিদগ্ধ আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাশ্রয়ী নাটকগুলির রূপক বা প্রতীক-লক্ষণ বিচারের ক্ষেত্রে লেখকের মনন ও বিচারশক্তির স্বচ্ছতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি যখন বলেন—'রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক নাটকগুলির মধ্যে কতকগুলি পরিষ্কার রূপক, কতকগুলি রূপক-লক্ষণাক্রান্ত হলেও পুরোপুরি রূপক নয়। এই শেষোক্ত ধরণের রচনাকে কেউ কেউ প্রতীক নাটক বলতে চান। কিন্তু সে অভিধা সঙ্গত হবেনা। অসম্পূর্ণ রূপককে প্রতীক বলা চলেনা।'—এবং এই মন্তব্যের সমর্থনে যে ব্যাখ্যা ও যুক্তি প্রয়োগ করেন, তার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে তাঁর মনন-চিন্তার স্পষ্টতা ও প্রত্যয়ের দৃঢ়তা। অবশ্য কোথাও কোথাও তাঁর মন্তব্য বা মত সকলের গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। বিশেষত 'রাজা' নাটক সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : 'এই নাটকটি জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা ছাড়া আর কিছু নয়।' নিঃসন্দেহে একটি বিতর্কিত, হয়তো-বা ঈষৎ অসতর্ক মন্তব্য। তবে রবীন্দ্রনাথের এমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি রচনা সম্পর্কে লেখকের এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সমালোচক হিসাবে

যে তাঁর নির্ভীক স্পষ্টভাষিতার পরিচয় মেলে, তাতে সন্দেহ নেই।

আলোচ্য সংকলনগ্রন্থের প্রথম ছ'টি নিবন্ধ সাধারণভাবে সাহিত্য-জিজ্ঞাসা-মূলক ; বাদবাকি প্রায় সব রচনাই (চোদ্দটি) বাংলা সাহিত্য নিয়ে। কেবল পরিশিষ্টের তিনটি নিবন্ধ পাশ্চাত্য-সাহিত্য-বিষয়ক।

বাংলা-সাহিত্য-সংক্রান্ত লেখাগুলির অনেকগুলিই কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টি-প্রতিভা কিংবা তাঁদের রচনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে। আর বাকিগুলিতে 'সাম্প্রতিক' বাংলা সাহিত্যের কোন একটি ধারার, যেমন—কবিতা, কথাসাহিত্য, শিশু-কবিতা ইত্যাদির গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা। বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত রামপ্রসাদ, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শরৎচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অমূল্যধনের চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে বর্তমান প্রবন্ধে আগেই আলোচনা করেছি।

অন্যান্য লেখকদের নিয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় যে-সব নিবন্ধ রচনা করেছেন তার মধ্যে মাত্র দু'-একটির উল্লেখ করছি। সেগুলি হল : ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এবং গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল'। বঙ্কিম-সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে 'ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সম্পর্কিত বিচারে প্রায়শই যে ভ্রান্ত মাপকাঠি ব্যবহার করা হয়, যে 'অসাহিত্যিক মতামত অথবা ভ্রান্ত সাহিত্যবাদের দ্বারা প্রণোদিত' হয়ে অনেক সমালোচক বঙ্কিম-সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে প্রয়াসী হন—অমূল্যধন সেই ভ্রান্তি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন : 'বঙ্কিমচন্দ্র যে ধরণের উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও সামাজিক উপন্যাস বলিলে তাহার স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হয়না। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজচিত্র অঙ্কন, সামাজিক সমস্যার আলোচনা বা বিগত কোন যুগের রূপ ও রস পরিবেশনের উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হ'ন নাই।' এর পরেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উদ্দিষ্ট কী, সে-সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত স্পষ্ট-ভাবে জানিয়েছেন : 'সামগ্রিক ভাবে মানবজীবনের রহস্য প্রতিপাদনই তাঁহার উপন্যাসের উদ্দিষ্ট। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে এক মহাজাগতিক দৃশ্য—নানা চরিত্র ও প্রবৃত্তির নরনারী, তাহাদের আকাঙ্খা ও দ্বন্দ্ব, সামাজিক রীতি-নীতি, লোকাচার ও ব্যবহার, প্রাকৃতিক জগতের লীলাচঞ্চল প্রবাহ, অতি

প্রাকৃতের রহস্যময় ছায়া ও কচিৎ ইঙ্গিত, জীবন-সংগ্রামের তরঙ্গ, অদৃষ্ট পুরুষের পরিহাস, মানবজীবনের নীতিধর্মের কঠোর প্রশাসন ইত্যাদি নানা উপাদানের সমবায়ে সেই দৃশ্যপট রচিত। জীবন-জিজ্ঞাসাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিষয়।" উদ্ধৃতি ঈষৎ দীর্ঘ হ'ল। কিন্তু বলা বাহুল্য, বঙ্কিমসাহিত্য-বিচারে অমূল্যধনের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করতে পূর্বোক্ত মন্তব্যগুলি বিশেষ সহায়তা করবে। এই ব্যাপক ও গভীর জীবনাশ্রয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের নানা প্রবণতা— প্রণয় ও রোমান্স প্রবণতা, নিসর্গ ও অতিপ্রাকৃত তথা নিয়তি-চেতনা, ধর্ম ও নীতিবোধ ইত্যাদির বিচার করতে চেয়েছেন অমূল্যধন। সমালোচকের পক্ষে এই সামগ্রিক দৃষ্টিই যথার্থ দৃষ্টি বলে মনে করি। বস্তুত এর সাহায্যেই সমালোচক সাহিত্যস্রষ্টার সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপটি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হন। সীমিত পরিসরের একটি নিবন্ধের মধ্য দিয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বহুলাংশে সেই উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়েছেন, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার স্বরূপ নির্ণয় ও মূল্যায়নে অমূল্যধন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। শেকস্‌পীয়রের নাট্যবৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে গিরিশচন্দ্রকে বিচারের যে প্রবণতা এতাবৎকাল প্রচলিত ছিল, ইংরেজি সাহিত্যের সুপণ্ডিত হ'য়েও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তা' থেকে মুক্ত। তাঁর মতে, "গিরিশচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে আমাদের মন হইতে শেকস্‌পীয়র complex বাদ দিতে হইবে।" তিনি বলেছেন যে, গিরিশচন্দ্রকে বিচারের মাপকাঠি হিসাবে শেকস্‌পীয়রকে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়, তাঁর সৃষ্টিকে দেশজ নাটক তথা যাত্রার প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার করা প্রয়োজন। তার কারণ "যাত্রা-জাতীয় নাটকের যাহা প্রাণ, তাহার রূপান্তর গ্রহণ করিয়া গিরিশচন্দ্রের নাটকে স্পন্দিত হইতেছে"। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে হয়তো বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু নিঃসন্দেহে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে অমূল্যধনের বিশ্লেষণ ওই বিশিষ্ট নাট্যকার সম্পর্কে পুনর্বিচারের প্রেরণা যোগায়।

গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে অমূল্যধনের বিশ্লেষণের মৌলিকতা তাঁর একটি বিশেষ নাটক অবলম্বন ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেটি 'বিল্বমঙ্গল'। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতে 'বিল্বমঙ্গল' শুধু গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর মধ্যে নয়, "ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি"। অমূল্যধনের মতে, শিল্পকলা প্রধানতঃ দুই প্রকারের। একপ্রকার বাস্তবাশ্রয়ী, অন্যপ্রকারের শিল্প ধ্যান-

লোকের প্রেরণাজাত। বিল্বমঙ্গল-স্রষ্টা গিরিশচন্দ্রকে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় শেষোক্ত শ্রেণীর শিল্পের স্রষ্টা বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, 'বিল্বমঙ্গল' নাটক পড়লেই "শেকস্পীয়র প্রভৃতি নাট্যকারের সহিত গিরিশচন্দ্রের···গুরুতর প্রভেদ" ধরা পড়বে। কারণ, তিনি মনে করেন, শেকস্পীয়র, হোমার, চসার প্রভৃতির রচনায় আমরা যে জগৎ ও জীবনের সাক্ষাৎ পাই, এখানে আমরা তা পা'বনা। কারণ "জীবনের বাহ্য রূপ ও পার্থিব মানবের সংসারলীলা নহে,—মানবচরিত্রের নিগূঢ় রহস্য ও জীবনের দুর্জ্ঞেয় সত্যই" বিল্বমঙ্গল নাটকের বিষয়বস্তু। উক্ত নাটকের চরিত্রসমূহের মাধ্যমে জীবনের এই দুর্জ্ঞেয় সত্যসন্ধানের আকাঙ্ক্ষার মূলে অমূল্যধন স্পষ্টত অনুভব করেছেন গিরিশন্দ্রের গভীর আত্ম-অন্বেষণের ব্যাকুলতা। তাঁর মতে 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে গিরিশচন্দ্রের "শিল্পনৈপুণ্য এত খুলিয়াছে, তাহার কারণ এখানে তিনি দিয়াছেন—পরের কথা নয়, নিজের কথা—শাস্ত্রের কাহিনী নয়, জীবনের প্রত্যক্ষানুভূতি।" 'বিল্বমঙ্গল' নাটক তথা গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার উৎকর্ষের উৎসসন্ধানে অমূল্যধনের প্রয়াসের এই স্বকীয়তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের পূর্বোক্ত নিবন্ধগুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে আরেকটি রচনার উল্লেখ করতে চাই। সেটি "দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান' "। বর্তমান নিবন্ধের সীমিত পরিসরের কথা মনে রেখে এটি সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'-একটা কথা বলি। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তার তুলনায় 'হাসির গান'-স্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল অনেকখানি পশ্চাদ্‌বর্তী। কিন্তু অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সুলভ জনপ্রিয়তার আড়ালে অনেকসময় শিল্পীর যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তাকে উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান' গ্রন্থটিকে বাংলা সাহিত্যের অতি বিরল সংখ্যক 'ক্লাসিক্‌স'-এর অন্যতম বলে গণ্য করেছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত যে নিছক আবেগ-সঞ্জাত অত্যুক্তি নয়, এই নিবন্ধে 'হাসির গান'-স্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ বিশদভাবে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি তা' নিংসংশয়ে প্রতিপন্ন করেছেন।

৬

বর্তমান নিবন্ধের সূচনায় যে কথা বলেছিলাম, সেখানেই আবার ফিরে আসি। ছান্দসিক অমূল্যধনের খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার আড়ালে সাহিত্য-সমালোচক অমূল্যধন

অনেকখানি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন। কিন্তু সেই নেপথ্যলোকে দৃষ্টি রাখলে বুঝি যে, তাঁর এই অনতিপরিচিত রূপটি তাঁর ছান্দসিক সত্তার মতোই সারস্বত দীপ্তিতে ভাস্বর।

'বাংলা সাহিত্য সমালোচনা' নিবন্ধে অমূল্যধন যথার্থ সমালোচকের বৈশিষ্ট্য বিচার প্রসঙ্গে বলেছেন : "যথার্থ সমালোচক রচনার স্বরূপ নির্ণয় করেন, তার রসের যথার্থ পরিচয় দেন, তার মূল্য নির্ণয় করেন।...তখন আমরা যে শুধু কবিকে বুঝি বা কাব্যকে বুঝি তা' নয়, তখন যেন জীবন ও জগতের মানবিক তাৎপর্য আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।" এই মানবিক তাৎপর্য—শুদ্ধ রস-সৌন্দর্যের সন্ধানই, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতে, প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনার অন্বিষ্ট। তাঁর কাছে সাহিত্য-সমালোচনা কেবল 'ক্রিয়েটিভ' সাহিত্যকে কেটে ছিঁড়ে বিশ্লেষণ করা নয়,—তা' ওই সৃষ্টিধর্মী রচনার নিহিত সৌন্দর্য ও রসের উন্মোচন। আর সেই রস-সন্ধানের তন্ময়তার মধ্য দিয়েই সমালোচনা নিজেও হয়ে ওঠে এক সৃষ্টি। 'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'নিবেদন'-এ অমূল্যধন বলেছেন : "সাহিত্য-সমালোচনা কেবল বিচার নহে, তাহাও এক প্রকারের সৃষ্টি। 'অন্তর হ'তে আহরি বচন / আনন্দলোক করি বিরচন'—ইহা শুধু কবির নহে, সমালোচকেরও মর্মবাণী বলিয়া আমি মনে করি।"—অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য-সমালোচনার দ্বারা সত্যই এক 'আনন্দলোক' রচনা করে গেছেন, যা' একই সঙ্গে যুক্তি-নির্ভর মননশীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ত জীবনমুখী রসপ্রাণতার সার্থক মিশ্রণে রচিত।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যাযের সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলী সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে সমালোচকপ্রবর অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত যথার্থই লিখেছিলেন :

"These comments are not merely exercises in critical gymnastics, they also knit us to a closer understanding of life."

[*Amrita Bazar Patrika, 8. 10. 61*]

জীবননিষ্ঠ সাহিত্য-রচয়িতাদের সমালোচনাসূত্রে 'জীবন-উপলব্ধির' এই বিশেষ মাত্রাযোগেই সমালোচক অমূল্যধনের ব্যক্তিত্বের অনন্যতা।

সমালোচক অমূল্যধন

অপূর্বকুমার রায়

'যে ব্যাখ্যানের সাহায্যে কোন আলোচ্য বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় ও সেই বিষয়ের সহিত আমাদের বুদ্ধির ঐকান্তিক সংযোগ স্থাপিত হয়, তাহাই সম্যক আলোচনা বা সমালোচনা।' [অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথের মানসী', ভূমিকা]

সমালোচনার কাজ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কিন মুলুকের হেন্‌রি লুই মেন্‌কেন্ অনেকটা এ ধরনের মন্তব্যই করেছিলেন। অমূল্যধন যেখানে 'ব্যাখ্যানের সাহায্যে আলোচ্য বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধি'র কথা বলেছেন, সেখানে মেন্‌কেন্ বলেছেন, 'to provoke a reaction between the work of art and the spectator', আর তিনি যেখানে পাঠক বা দর্শকের মনে 'intelligible impression' সৃষ্টি করাই সমালোচনার উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন সেখানে বুদ্ধির সঙ্গে বিষয়ের ঐকান্তিক সংযোগ স্থাপনই সমালোচনার মূল লক্ষ্য বলে অমূল্যধন বিবেচনা করেছেন। বিষয়ের সঙ্গে বুদ্ধির ঐকান্তিক সংযোগ সাধনই ছিল সমালোচক অমূল্যধনের সাধনা; তাই, তাঁর সমালোচনা মননশীলতায় ভাস্বর।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রথিতযশা অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় একাধারে ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য এবং সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর এই বিস্তৃত পঠন-পরিধি সমালোচনার ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, আধুনিককালে বাংলা সমালোচনার জগতে যাঁরা বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অমলেন্দু বসু, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ উল্লেখনীয়। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এই সমালোচকগোষ্ঠীরই অন্যতম উজ্জ্বল প্রতিভূ। সমালোচক হিসাবে বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই, নবীন বয়সে, বাংলা কাব্য ও রবীন্দ্র-কাব্যের ছন্দ বিষয়ে মৌলিক আলোচনার জন্য, তিনি বিদগ্ধ সমাজের সম্মানিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। জীবনের প্রান্তিক পর্বে পৌঁছে তিনি সংস্কৃত ছন্দের

একটি মূল্যবান ও মনোজ্ঞ ইতিহাস (Sanskrit Prosody : Its Evolution) রচনা করেছিলেন। তাঁর ছন্দ-বিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে তিনি এই গ্রন্থটিকে magnum opus বলে মনে করতেন। সমালোচক হিসাবে তাঁর রচনা পরিমিত এবং পরিশীলিত। ওঅশিংটন আর্বিং সাহিত্যকর্মে ও অর্থনীতিতে, বহুক্ষেত্রে, অনেক কাগজ এবং অপরিসীম দারিদ্র্যের সহাবস্থান (In literature as in finance much paper and much poverty co-exist) লক্ষ্য করেছেন। অমূল্যধনের রচনা অবশ্যই এই বক্তব্যের পরিপোষণা করেনি।

অমূল্যধনের তিনটি বাংলা সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে দু'টি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক : 'কবিগুরু : রবীন্দ্রকাব্যের মূলসূত্র' (মিত্রবিহার প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬৪) এবং 'রবীন্দ্রনাথের মানসী' (করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৬৮)। অপর গ্রন্থটি আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার সংকলন : 'আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা' (বৌডার্স কর্নার, কলিকাতা, ১৩৬৮)। তাঁর বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'শেক্স্পীয়র ও বাংলা নাটক' (মনোজ বসু- সম্পাদিত সাহিত্যের খবর, বর্ষ ১১, সংখ্যা ৮, কলিকাতা, ১৩৭১), 'সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়' (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক গ্রন্থ, সাহিত্য সমালোচনা, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭৪) উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি রচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিবন্ধনিচয় উল্লেখযোগ্য : English Lyric Poetry in the Post-Victorian Period (এই মুদ্রিত প্রবন্ধের প্রকাশক এবং প্রকাশনার সময় জানা যায়নি), Miltonic Blank Verse in Bengali (*Calcutta Review*, November, 1958), An Apology for King Lear (Bulletin of the Department of English, Calcutta University, 1960), Tagore—the Apostle of a New Religion (*Indo-Iranica*, June, 1961), Last Words in Shakespearean Tragedy (Shakespeare Volume, ed., Bhabatosh Chatterji, Burdwan University, 1964), Girischandra : His Mind and Art (Bulletin of the Ramakrishna Misson Institute of Culture, Vol. IX, No. 4, Calcutta, 1968)। তাঁর আর একটি গ্রন্থ *Leaves from English Poetry* (Orient Longmans, Calcutta, 1954) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত। সঙ্কলিত কবিতানিচয়ের টীকা-ভাষ্য-সম্বলিত এই পুস্তকটি প্রথমে কয়েক বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং

পরে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সমালোচক হিসাবে অমূল্যধন তন্নিষ্ঠ আস্বাদন ও ব্যাখ্যানের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশী। টি. এস. এলিয়ট এক ধরনের আত্মম্ভরি, তরল ও সাংবাদিকতা-মূলক সমালোচনা (pretentious critical journalism)-কে সম্পূর্ণত মূল্যহীন বলে মন্তব্য করেছিলেন। এই শ্রেণীর আধুনিক সমালোচনার প্রতি অমূল্যধনেরও অশ্রদ্ধা ছিল। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি কখনো গ্রন্থনিষ্ঠ পাণ্ডিত্যের (textual scholarship) পন্থা অনুসরণ করেছেন, কখনো স্বানুভববিহারী সমালোচনার (impressionistic criticism) আশ্রয় নিয়েছেন, আবার কখনো তুলনামূলক পদ্ধতির (comparative method) সাহায্য নিয়েছেন। 'কবিগুরু' শীর্ষক গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব আস্বাদনের এক নতুন নিরিখ সৃষ্টি করেছেন। আলোচনাক্রমে রবীন্দ্রকাব্যে তিনি ত্রিধারার সন্ধান পেয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, একটি ধারায় কবির ধী-সত্তার প্রকাশ, যে ধী-সত্তার উদ্ভব বিজ্ঞানময় কোষ থেকে। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের 'উইট্', ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কৌতুকপ্রবণতা এই সত্তার পরিচয় বহন করে। আর একটি ধারায় কবির রসসত্তার প্রকাশ, যার জন্ম আনন্দময় কোষ থেকে। তিনি এই সত্তার সক্রিয়তা লক্ষ্য করেছেন কবির সঙ্গীতে এবং চিত্রকলায়। তৃতীয় ধারায় তিনি রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যসত্তার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন, সত্যাত্মা যার উৎস। যে ধর্মবোধ রবীন্দ্রকাব্যে পূর্বাপর অনুস্যূত রয়েছে সেই ধর্মবোধই এই ধারার পরিচালক। তাঁর বিশ্লেষণে,

> 'আপাতদৃষ্টিতে ইহাই রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান ধারা বলিয়া প্রতীত হয়। ইহাই মূলধারা কিনা সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ থাকিলেও ইহাই যে আর দুই ধারার সহযোগে রবীন্দ্রকাব্যের বিশিষ্ট গুণ ও রূপের সৃষ্টি করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই'। [কবিগুরু, পৃ. ৪৮]

অপরদিকে, তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, একটি সীমাহীন কম্বুরেখায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যচক্র আবর্তিত হয়েছে; এবং এই আবর্তন-সূত্র ভাবাভাব, ভাব এবং মহাভাব, এই তিন পর্যায়ে বিধৃত রয়েছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে,

> '...রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে সৃষ্টির মূলে যে শক্তি আছে তাহা ক্রমাগত একটা বিবর্তনের পথে চলিতেছে। তাহার ফলে একটা অভাবের (ভাবাভাব) পর

একটা ভাবের আবির্ভাব এবং সেই ভাব হইতে একটা মহাভাবের উৎপত্তি ঘটিতেছে। পুনশ্চ মহাভাবের পর আবার নূতন করিয়া ভাবাভাব ও তাহার পর একটা নূতন ভাব এবং তাহা হইতে একটা নূতন আর এক রকমের মহাভাব এবং তাহারও পর আর একটা ভাবাভাব—এইভাবে নক্শা কাটিয়া তাঁহার উপলব্ধির ইতিহাস অগ্রসর হইতেছে।' [কবিগুরু, পৃ. ৫৮—৫৯]

অমূল্যধনের বক্তব্য, হেগেলের ত্রয়ী-পরম্পরার (thesis-antithesis-synthesis) সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের বিবর্তন-সূত্রের আপাতসাদৃশ্য থাকলেও মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। যাই হোক, এই বিবর্তন-সূত্র অনুসরণ করে তিনি রবীন্দ্রকাব্যে ছয়টি যুগ এবং আঠারোটি পর্বের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাত-সঙ্গীত', 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থগুলি যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব, এবং ভাবাভাব, ভাব এবং মহাভাব পর্যায়ের অন্তর্গত করে আলোচনা করেছেন। আবার, 'মানসী' এবং 'চিত্রা' ও 'চৈতালী'র কবিতাগুচ্ছ যথাক্রমে চতুর্থ (ভাবাভাব), পঞ্চম (ভাব) ও ষষ্ঠ (মহাভাব) পর্বের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছেন। এইভাবে অষ্টাদশ পর্ব পর্যন্ত, পর্যায়ক্রমিক আবর্তন-চিত্রের মাধ্যমে, তিনি কবিগুরুর কবিতাবলীর রসাস্বাদনে অগ্রসর হয়েছেন। এ ধরনের যুগ ও পর্বের ক্রমিক আবর্তন-সাপেক্ষ আলোচনা সমালোচকের মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর বহন করে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল্যায়নে পূর্বসূরিদের পুচ্ছগ্রাহিতা পরিত্যাগ করে নিজের বৈদগ্ধ্য ও অনুভূতির উপরই তিনি আস্থা রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মর্মোদ্ঘাটনে তিনি অনেকসময় উপনিষদের আশ্রয় নিয়েছেন। অবশ্য, 'সমগ্রভাবে রবীন্দ্রকাব্য ঔপনিষদিক তত্ত্বের কাব্যরূপ' বলে তিনি কখনোই মনে করেননি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে এ ধরনের প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করে তিনি বলেছেন :

'রবীন্দ্রনাথ কাব্যে তাঁহার স্বকীয় উপলব্ধির কথাই বলিয়াছেন; তাঁহার প্রেরণার উৎস ঋষি-বাক্য নহে, তাঁহার 'অন্তরতমে'র নির্দেশ। কোন কোন ক্ষেত্রে সেই নির্দেশের মধ্যে উপনিষদের দুই একটি বচনের প্রতিধ্বনি থাকিতে পারে, এইমাত্র বলা যায়। মানবপ্রেম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুভূতি রবীন্দ্রকাব্যে যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ও তৎসম্পর্কে যে উপলব্ধির প্রকাশ রবীন্দ্রকাব্যে রহিয়াছে, তাহার উপর উপনিষদের বাণীর কোন প্রভাব নাই।' [তদেব, পৃ. ৪৯]

ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচয়ের ফলে, রবীন্দ্রকাব্যের আস্বাদনে, তিনি বহুক্ষেত্রে, তুলনাত্মক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। তুলনামূলক আলোচনায় তিনি ইংরেজি রোমান্টিক ও ভিক্টোরিয় যুগের কবি-সাহিত্যিকদের সবচেয়ে বেশী স্মরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেলী ও কীট্স্-এর সাদৃশ্য উপলব্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

'...গীতাঞ্জলির গানগুলি কবি Shelley-র রচনার অনুরূপ, এখানে ব্যঞ্জনার উৎকর্ষ আছে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠে নাই। অপরপক্ষে, বৈষ্ণব প্রেমের কবিতাগুলি Keats-এর কবিতার অনুরূপ। এখানে তীব্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরিচয় আছে এবং সেই অনুভূতিই একটা অসীমের আভাস আনিয়া দিয়াছে।' [তদেব, পৃ. ১৪৭]

কীট্স্-এর প্রথমদিকে লেখা কবিতার সঙ্গে, সমালোচক অমূল্যধন, রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের অন্তর্গত কবিতাবলীর সুর-সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। 'ইন্দ্রিয়জ ভোগের কল্পনাবিলাস, মানবসুলভ আকাঙ্ক্ষা' এই দুই কবির প্রথম দিকের রচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ভোগাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অতৃপ্তি এসে এই সমস্ত কবিতায় যুক্ত হয়েছে। আর, 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবিতাগুলিতে তিনি য়ুরোপীয় রোমান্টিকতার 'sturm und drang' পর্বের মনোভাবের পরিচয় পেয়েছেন। এছাড়া, তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কখনো ব্রাউনিং, আবার কখনো টেনিসনের সাদৃশ্য সন্ধান করেছেন। টেনিসনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

'রবীন্দ্রনাথ Tennyson-এর অনুরাগী ভক্ত ছিলেন, তাঁহার কবিপ্রকৃতির সহিত Tennyson এর যথেষ্ট মিল ছিল। আধুনিক যুগের সমালোচকেরা Tennyson-এর কাব্যের মর্মোদ্ঘাটন করিয়া পাইয়াছেন কোন দার্শনিক তত্ত্ব বা আদর্শবাদ নহে, পাইয়াছেন এক ভীত নিঃসঙ্গ মানবাত্মার আর্ত ক্রন্দন। অজানা জগতের গোধূলিময় প্রান্তে দাঁড়াইয়া কবির চিত্ত শিহরিয়া উঠিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছে—"হারিয়ে গেছি আমি"; সেই হারিয়ে-যাওয়া আত্মার আর্তনাদ ও শিহরণ-ই Tennyson-এর কাব্যের মর্মকথা।' [তদেব, পৃ. ২৮]

অমূল্যধনের 'রবীন্দ্রনাথের মানসী' শীর্ষক গ্রন্থটিও নতুন চিন্তার পরিচয় বহন করে। 'মানসী'র কবিতানিচয় তিনি কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন : নৈরাশ্যের কবিতা, স্বদেশপ্রেমের কবিতা, প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা এবং প্রেমের কবিতা।

শ্রেণীভিত্তিক আলোচনার অন্তে, দুটি অধ্যায়ে, 'মানসী'র মূলসুর এবং কবির জীবনদর্শন বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা সর্বপ্রথম স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'মানসী'র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি কীট্‌স্-এর, বিশেষত তাঁর sensuousness-এর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন :

'কোন কোন দিক দিয়া প্রথম যুগের রবীন্দ্রনাথের সহিত কবি Keats-এর অনেকটা মিল আছে ; উভয়ের মধ্যেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের অনুভূতি তীব্র, এবং উভয়ের মধ্যেই এই অনুভূতি একটা দার্শনিক উপলব্ধির উৎস। উভয়েই রূপসাগরে ডুব দিয়া অরূপরতনের খোঁজ পাইয়াছিলেন, এবং তীব্র মানবিক অনুভূতিকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহাদের জীবন-দর্শন গড়িয়া তোলার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।' ['রবীন্দ্রনাথের মানসী', পৃ. ১১]

অপরদিকে, জীবনের কঠোর সত্য সম্বন্ধে যে তীব্র বোধ কীট্‌স্-এর Ode to a Nightingale কবিতায় আছে, রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র কোন কোন কবিতায় সে ধরনের তীব্র বোধ রয়েছে বলে তিনি মনে করেছেন।

এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দের ক্ষেত্রেও অভিনবত্বের প্রথম স্বাক্ষর রেখেছেন তার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন ছন্দ-বিশেষজ্ঞ অমূল্যধন। তিনি দেখেছেন, পাঁচ মাত্রার ও সাত মাত্রার পর্ব অবলম্বন করেই যে বাংলা ছন্দের গতি অব্যাহতভাবে চলতে পারে সে-বিষয়ে প্রথম এবং সার্থক প্রমাণ পাওয়া গেল 'মানসী'র কবিতাগুলিতে।

অমূল্যধনের 'আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা' শীর্ষক গ্রন্থটি সাহিত্য-বিষয়ক নানা নিবন্ধের একটি মূল্যবান সঙ্কলন। এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রবীণ সমালোচক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছিলেন, '…readers of this collection will be struck by the wide catholicity, of the author's tastes and his infectious enthusiasm for literature' (*Amrita Bazar Patrika*, 8th August, 1961)। সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা, সাহিত্যে ও কাব্যে আধুনিকতা ও কালান্তর এবং স্বদেশ ও বিদেশের কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকারের (যেমন—রামপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বার্নার্ড শ', হুইটম্যান প্রভৃতি) মননশীল আলোচনা, এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির 'নিবেদন' অংশে অমূল্যধন নিজেকে 'উদারনৈতিক' বলে

চিহ্নিত করেছেন, আর এই কারণেই সাহিত্যবিচারে 'সনাতনী' হলেও তিনি 'আধুনিক সাহিত্যের রসগ্রাহী'। সমালোচক হিসাবে তাঁর এই আত্মসমীক্ষা যথার্থ। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁর রসগ্রাহিতা আদৌ হ্রাস পায়নি। ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সবিশেষ হলেও নবীন সাহিত্যের মূল্যায়নে তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখেছেন। এই কারণেই অতি-আধুনিকতাকে মাত্র সাময়িক অনাচার হিসাবে তিনি দেখেননি। যাই হোক, আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাঁর মনে হয়েছে, এই সাহিত্য কোন নতুন আদর্শ সৃষ্টিতে এখনও অক্ষম, কারণ,

> 'আধুনিকের কাছে সংসার ও জীবন 'waste land' বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। কোন 'new heaven' বা অভিনব স্বর্গলোক সৃজন করিতে সে পারে নাই, তাহার চক্ষে একটা new chaos অর্থাৎ নূতন রকমের বিশৃঙ্খলা মাত্র দেখা দিয়াছে।' [আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা, পৃ. ১৫]

'কাব্যে কালান্তর' শীর্ষক নিবন্ধে হপকিন্‌স্ এবং এলিয়টের আলোচনায় অগ্রসর হয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন,

> 'টি. এস. এলিয়ট অনেক সময়ই তাঁহার কাব্যে যুক্তিবিচারের শৃঙ্খলার অনুবর্তন করেন নাই, অবচেতন মনের ভাবধারার অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার বিখ্যাত কাব্য The Waste Land-এর শেষ পংক্তি এই পদ্ধতির চরম নিদর্শন।' [তদেব, কাব্যে কালান্তর, পৃ. ২৬]

কাব্যে কালান্তরের পথরেখা অনুসরণ করে অমূল্যধন দেখেছেন যে প্রতীক, রূপক ও বাক্‌প্রতিমা তথা চিত্রকল্পের অভাবনীয় ব্যবহার, শব্দপ্রয়োগ ও বাক্যবিন্যাসের অকল্পনীয় নতুনত্ব, অবচেতন মনের আধিপত্য, সনাতন ছন্দ প্রয়োগে অনীহা আধুনিক সাহিত্যকে জটিল এবং অভিনব করে তুলেছে। আধুনিক সাহিত্য যে নবযুগের সূচনা করেছে সেকথা সমালোচক দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করেছেন :

> 'তাঁহারা কাব্যকে সনাতন অলঙ্কারশাস্ত্রের 'বাঁধাপথের শেষে' টানিয়া আনিয়াছেন, তাঁহাদের বাগ্‌ধারা 'অবাধ পানে' 'অজানাদের দেশে' পথ কাটিয়া অগ্রসর হইতেছে। টি. এস. এলিয়ট ম্লান সন্ধ্যাকে patient etherised upon a table বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, হপ্‌কিন্স আকাশকে brinded cow-র সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই সমস্ত উপমা কেবল যে সনাতন বাগ্‌ধারাকে লঙ্ঘন করিয়াছে তাহা নয়, কাব্যধারাকে একটা

অভিনব পথের নির্দেশ দিয়াছে, গতানুগতিকতার পরিবর্তে একটা সন্তোস্থ প্রাণোচ্ছল ঔচিত্য কাব্যে আনয়ন করিয়াছে।' [তদেব, পৃ. ২৮-২৯]

সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্পর্কিত আলোচনায় আলোচ্য সমালোচক পাণ্ডিত্যের সাবলীল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক' শীর্ষক আলোচনায় তিনি কয়েকটি মাত্র বাক্য অবলম্বনে রূপক ও প্রতীকের মূল পার্থক্য অনবদ্যভাবে পরিস্ফুট করেছেন। তিনি দেখেছেন,

'রূপকের মূলে আছে সাদৃশ্যবোধ, আর প্রতীকের মূলে আছে সংস্পর্শবোধ। রূপকের কারবার হচ্ছে দুটি বিভিন্ন চিন্তাক্ষেত্রের অন্তর্গত দু'টি বস্তু নিয়ে, প্রতীকের কারবার হচ্ছে একই চিন্তাক্ষেত্রের অন্তর্গত দু'টি বস্তু নিয়ে। রূপকে লক্ষ্য করা হচ্ছে দু'টি বস্তুর সমগুণতা, আর প্রতীকে লক্ষ্য করা হচ্ছে দু'টি বস্তুর সহচারিতা।

লক্ষণা বাক্যালঙ্কারের (metonymy, synecdoche) সঙ্গে প্রতীকের ভাবগত ঐক্য আছে। প্রতীক বস্তুর প্রতিনিধি, রূপক বস্তুর প্রতিবিম্ব। রূপকের সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক আরোপিত ; প্রতীকের সঙ্গে স্বাভাবিক।' [তদেব, পৃ. ৪৪-৪৫]

বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞানের অধিকারীর পক্ষেই এ ধরনের স্পষ্ট, প্রত্যয়শীল এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পরিবেশনা সম্ভবপর। প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে সামান্য দুই-একটি রেখায় ব্যঙ্গ (wit) এবং হাস্যরস (humour)-এর পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। [বঙ্গদর্শন, চৈত্র সংখ্যা, ১২৭৯ দ্রষ্টব্য]

বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অমূল্যধনের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়। অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বাংলার স্কট' আখ্যায় বিভূষিত করেন। তাঁর বক্তব্য, বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের দ্বারা বিশেষত প্রভাবিত হয়েছিলেন, আর ফিল্ডিং, জর্জ এলিয়ট, উইল্‌কি কলিনস্‌, লিটন প্রভৃতির প্রভাবও তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায় ; কিন্তু, কোন প্রভাবই বঙ্কিম-প্রতিভার নিজত্ব নষ্ট করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্রাউনিং-এর Abt Vogler কবিতার একটি অবিস্মরণীয় পংক্তি স্মরণ করেছেন : 'out of three sounds he frame, not a fourth but a star'। ঘটনাবৃত্তের সুনিপুণ গ্রন্থনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ কৃতিত্বের প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন (রবীন্দ্রনাথ 'রাজসিংহ' উপন্যাসের কাহিনী-

সজ্জার অনন্যতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন)। হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের প্রচারক হিসাবে যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে চিহ্নিত করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য :

'Dante-র মহাকাব্য রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্মবিশ্বাসের সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ, তত্রাচ তাহার কাব্যগুণের হানি হয় নাই ; বঙ্কিমের উপন্যাস-ও হিন্দু ধর্মনীতির সহিত সংসৃষ্ট হইলেও তাহার রস বা সত্যের লাঘব হয় নাই।' [তদেব, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ. ২০১]

শরৎচন্দ্রকে তিনি অপরাজেয় কথাশিল্পী বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে শরৎচন্দ্র ছিলেন 'যথার্থ জনগণের সাহিত্যিক, যথার্থ 'novelist of democracy'। তাঁর 'উচ্ছ্বসিত ভাবাকুললোচন দৃষ্টি' বাঙালীচিত্ত বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল। শরৎ-সাহিত্যের অভিভূত আস্বাদনের মধ্যেও সমালোচক হিসাবে তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যথেষ্ট সজাগ ছিল। তাঁর মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে, শরৎচন্দ্রের 'দেশকালজয়ী দৃষ্টি'র অভাবে,

'আজি হতে শত বর্ষ পরে' সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হইলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস কতটা হৃদয়গ্রাহী থাকিবে, তাহা সন্দেহের বিষয়।' [তদেব, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, পৃ. ১২৮]

অমূল্যধনের বিচ্ছিন্ন দুই-একটি নিবন্ধের—যেগুলো তাঁর নিজস্ব সঙ্কলনে স্থান পায়নি—পরিচয় গ্রহণ করছি। 'সাহিত্যের খবর' সাময়িকপত্রে প্রকাশিত 'শেক্স্পীয়র ও বাংলা নাটক' নিবন্ধে বাংলা নাটকে শেক্স্পীয়রের প্রভাব বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রচলিত ধারণার বিপরীত। তাঁর মনে হয়েছে,

'যেভাবে বঙ্কিম বিলাতি উপন্যাস বা রবীন্দ্রনাথ বিলাতি কাব্য আত্মসাৎ ক'রে একটা মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, সেভাবে শেক্স্পীয়রের নাটক কেউ গ্রহণ করে নূতন কিছু সৃষ্টি করতে পারেননি।'

সমালোচক অমূল্যধন অপর এক সমালোচকের রচনা ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ উদ্ঘাটনে বিশেষ নিষ্ঠা ও মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, 'সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়' শীর্ষক নিবন্ধে। বাংলা সাহিত্যে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের বিশিষ্টতার বিষয়টি তাঁর আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। Neo-classic মতাদর্শে প্রত্যয়শীল শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের আলোচনানিচয় তিনি গঠনমূলক সমালোচনা (constructive criticism) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

ইংরেজি রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম সমালোচনা, 'English Lyric Poetry

in the post-Victorian Period', যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্লেষণধর্মী। নিবন্ধটি দুই পর্যায়ে বিন্যস্ত করে তিনি আলোচনা করেছেন। একটি পর্যায়ে আধুনিক প্রবণতা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, অপর পর্যায়ে আদর্শস্থানীয় কয়েকটি আধুনিক লিরিকের আলোচনা স্থান পেয়েছে। সমালোচক উত্তর-ভিক্টোরিয় যুগে গীতিকবিতার অবক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, ওয়েল্‌স্, শ' বা গোল্‌স্‌ওয়ার্দি-কে নিয়ে সমাজে যে ধরনের উত্তাপ-উৎসাহ সঞ্চারিত হয়ে থাকে, আধুনিক কবিদের নিয়ে সে-ধরনের আন্দোলন অনুপস্থিত। অমূল্যধনের ভাষায়, 'The poet is forgotte.'। এর কারণ হিসাবে তিনি লিরিক প্রতিভার অভাব লক্ষ্য করেছেন। তাছাড়া, বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ আর জটিল জীবন-জিজ্ঞাসার মরুপথে গীতিকবিতার রসধারা বিশুষ্ক। সুতরাং, আধুনিক সাহিত্য-জগতে, 'the triumphs have been in the realm of prose, fiction and the drama, not in poetry'।

তিনি আরো মনে করেছেন, 'Poetry requires an atmosphere, not of brooding but of enthusiasm; it requires a clear vision into some aspect of the highest Beauty and Truth.'

তবে, আত্মগত মুহূর্তের উচ্ছ্বসিত আবেদন আধুনিক কবিদের কাছে বিরল হলেও অনুপস্থিত নয়। এই কারণেই গীতিকবিতা আধুনিক কালেও সম্পূর্ণত বন্ধ্যা নয়, যদিচ পূর্ববর্তী যুগের কবিতার সঙ্গে তার প্রকৃতিগত পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক ইংরেজি লিরিকের রাজ্যে য়েইট্‌স্-কে সর্বাধিক মর্যাদা দিয়েছেন অমূল্যধন। গীতিকবিতার ক্বচিৎ কিরণে যে-সব আধুনিক ইংরেজ কবির রচনা উদ্‌ভাসিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে তিনি টমাস হার্ডি, রবার্ট ব্রিজেস, ফ্রান্সিস টম্‌সন্, এমিলি লরেন্স্, ওয়েন, রুপার্ট ব্রুক প্রভৃতির কথা স্মরণ করেছেন। শুরুতেই অবশ্য একথা তিনি মেনে নিয়েছেন যে, আধুনিক ইংরেজি লিরিক অসম্বাধ গীতরসধারা সিঞ্চনে অক্ষম।

অমূল্যধনের মনোগ্রাফ, Lectures on English Drama from Dryden to Sheridan—রেস্টোরেশন যুগের নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা। এই পুস্তিকার বিচ্ছিন্ন একটি নিবন্ধে তিনি ড্রাইডেনের *All for Love* নাটকটির আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় তিনি শেক্‌স্‌পীয়রের *Antony and Cleopatra* নাটকটির সাথে ড্রাইডেনের উল্লিখিত

নাটকটির জনপ্রিয় তুলনাত্মক আলোচনার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর মতে, এ দু'টি নাটকের শিল্পিক অনুভাবনা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য রয়েছে, এবং এদিক থেকে বিচার করলে বলা চলে যে *All for Love* নাটকটির কোন পূর্বসূরি বা উত্তরসূরি নেই। আর একটি নিবন্ধে তিনি শেরিডনের *The School for Scandal* নাটকটির আলোচনা করেছেন।

অমূল্যধনের 'Last Words in Shakespearean Tragedy' শীর্ষক আলোচনাটি বিশেষ মূল্যবান। ইংরেজি সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও শিক্ষক তারকনাথ সেন একসময় শেক্‌স্‌পীয়রের short lines-এর উপর মূল্যবান আলোকপাত করেছিলেন। আর, আলোচ্য সমালোচক উল্লিখিত প্রবন্ধে শেক্‌স্‌পীয়রের বিয়োগান্ত নাটকনিচয়ে সমাপ্তিসূচক শব্দমালার নাটকীয় গুরুত্ব বিষয়ে মৌলিক ও মনোজ্ঞ আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। তিনি দেখেছেন, Catastrophe-র পর শেষ দৃশ্যে, অনেকসময়ই, অকিঞ্চিৎকর কয়েকটি চরিত্রের আকস্মিক সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, এবং এ ধরনের কোন এক নগণ্য চরিত্রের মুখে নাটকের শেষ কথাগুলি উচ্চারিত হয়ে থাকে ; যেমন, *Romeo and Juliet* নাটকের শেষ সংলাপ শোনা যায় Prince-এর মুখে, নাটকীয় ক্রিয়ার অগ্রগতির ক্ষেত্রে যার ভূমিকা ছিল যৎসামান্য। অথচ, নাটকের শেষ বক্তব্য পরিবেষণের বিষয়ে অনেকেই হয়তো Friar Laurence-কে যোগ্যতর চরিত্র বলে বিবেচনা করবেন। অবশ্য, Prince-এর স্বপক্ষে সামান্য একটু যুক্তি আছে বলে সমালোচক মনে করেছেন ; কারণ, এই চরিত্রটিকে 'personification of the moral conscience in the play' হিসাবে মূল্য দেওয়া চলে। *Julius Caesar* নাটকটিতে শেক্‌স্‌পীয়র আরো একটু সরে এসেছেন। এই নাটকের শেষ দৃশ্যে, Brutus-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে অনেকেই অগ্রসর হয়েছে। আর, Antony-র শ্রদ্ধাঞ্জলি যে সর্বোৎকৃষ্ট সে-সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ নেই। অথচ, এই দৃশ্যে নাটকের সমাপ্তিসূচক সংলাপ শোনা গেল Octavius-এর কণ্ঠে, যে Octavius চরিত্র, *Romeo and Juliet* নাটকের Prince চরিত্রের মতো, নাটকটির নীতি-বিবেকের মূর্ত প্রতিনিধি হিসাবে চিত্রিত হয়নি। *Hamlet* নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে Fartinbras-এর উক্তি দিয়ে। এক্ষেত্রেও লক্ষণীয়, নাটকীয় ক্রিয়ার সঞ্চারে এই চরিত্রটির কোন ভূমিকা নেই। *Othello* নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি দেখেছেন, Lodovico-র মতো

নাটকের একজন নির্লিপ্ত দর্শকের মুখে শেষ শব্দনিচয় উচ্চারণের দায়িত্ব দিয়েছেন শেক্স্‌পীয়র। *King Lear* নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে Edgar-এর বক্তব্য দিয়ে। সমালোচকের মতে এ-বিষয়ে Edgar চরিত্রটি সবচেয়ে উপযুক্ত। Edgar এই নাটকের একটি নীতিবাদী চরিত্র এবং তার মন্তব্য নাটকের মর্মোদ্‌ঘাটনে সহায়ক হয়েছে। *Macbeth* নাটকের ক্ষেত্রে শেষ পংক্তিগুলি উচ্চারণ করেছে Malcolm, যে স্কটল্যাণ্ডের রাজার যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসাবে এখানে উপস্থিত হয়েছে। স্বভাবতই, তার কণ্ঠে villain-hero Macbeth-এর জন্য কোন শোকবাণী উচ্চারিত হয়নি। পরিবর্তিত অবস্থার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং নতুন শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ঘোষণায় সে দ্রুত সচেষ্ট হয়েছে। আর, Siward-এর মৃত্যুজনিত মর্মব্যথাকে সে এই ভাবনায় প্রশমিত করেছে যে তরুণ Siward প্রাণ-বিসর্জন করেছে ঈশ্বরের সৈনিক (God's soldier) হিসাবে, ন্যায়ের শুভপ্রতিষ্ঠায়, অশুভ শক্তি উচ্ছেদের জন্য সংগ্রামে। সমালোচক শেক্স্‌পীয়রের বিভিন্ন বিয়োগান্ত নাটকে উচ্চারিত সমাপ্তিসূচক পংক্তিনিচয়ের নাটকীয় অনিবার্যতা অন্বেষণ করেছেন, এবং পরিণামে বলেছেন :

> 'Every Shakespearean tragedy closes on a quiet note, on a note of sanity, on the recognition of the basic demands of life. The aftermath of tragedy is a return to normality.'

'An Apology for King Lear' শীর্ষক আলোচনায় অমূল্যধন নতুন আলোকপাত করেছেন। অধিকাংশ সমালোচকই সিদ্ধান্ত করেছেন যে King Lear নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতির মূলে রয়েছে Lear-এর চরম নির্বোধ ক্রিয়া (extremely foolish action)। রাজা হিসাবে এবং পিতা হিসাবে Kent এবং Cordelia-র প্রতি তাঁর আচরণের যাথার্থ্য নিরূপণে অগ্রসর হয়ে আলোচ্য সমালোচক বলেছেন :

> 'To judge Lear properly we must revise our present-day democratic notions about kingship and parenthood. Lear represents a cosmology in which both were considered sacred. Any show of disloyalty to either was not merely a a crime, but a sin, a sacrilegious transgression fatal to the

eternal order of things.'

এই নিবন্ধে একদিকে তিনি যেমন Lear-এর আচরণে সঙ্গতি খুঁজে পেয়েছেন, অপরদিকে তেমনি Cordelia এবং Kent-এর অযৌক্তিক আচরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'Miltonic Blank Verse in Bengali' প্রবন্ধে বাংলা ছন্দে মিল্টনীয় blank verse প্রবর্তন প্রসঙ্গে মধুসূদনের অনন্যতার দিকটি উদ্‌ভাসিত করেছেন। তাঁর মতে বাংলা ছন্দের প্রবহমানতা এবং মিত্রাক্ষরের প্রতি অতি-আসক্তি পরিত্যাগ করে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে সার্থকতা লাভ করা অল্প শক্তির পরিচায়ক নয়।

'Tagore—the Apostle of a New Religion' প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বে এক নব মানবধর্মের প্রবক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি দেখেছেন, আশাহত ইংরেজ কবি আর্নল্‌ড্‌-এর কাছে তাঁর নিজের যুগ 'iron time of doubts, disputes, distractions, fears' বলে বিবেচিত হয়েছিল; আর বিংশ শতকের বিশিষ্ট কবি এলিয়ট 'Waste Land'-এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন মানব-জীবনের প্রতিচ্ছবি। আধুনিক মানুষ, প্রকৃতপ্রস্তাবে, জীবনসংগ্রামের অর্থ ও প্রত্যয় হারিয়ে ফেলেছে। খুব সম্ভবত, আর্নল্‌ড্‌-এর 'Dover Beach' কবিতার সমাপ্তিসূচক সেই আশ্চর্য পংক্তিটি (where ignorant armies clash by night) স্মরণ করে তিনি বলেছেন, 'They hardly know why they carry on this struggle)। রবীন্দ্রসাহিত্যে কিন্তু জীবনপ্রত্যয়ের অভাব কখনোই পরিলক্ষিত হয়নি। অমূল্যধন রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন 'the universal man' হিসাবে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে কল্পনাবিলাসী, স্বপ্নলোকসঞ্চারী বলে অভিহিত করেন, অমূল্যধন তাঁদের সুরে সুর মেলাতে পারেননি। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথ ভাবের অন্তর্লীন মিষ্টিকমহলে অধিষ্ঠিত গজদন্তমিনারে কদাচ আশ্রয় নেননি। তিনি নিজে যেমন কর্মবিমুখ ছিলেন না, তেমনি তাঁর রচনা ও বাণী মানুষকে কর্মের পথেই ডাক দিয়েছে। আর, রবীন্দ্রনাথ যদি স্বপ্নবিলাসীই হয়ে থাকেন তবে 'স্বপনপারের ডাকে' তিনি এমন এক জগতে উপস্থিত হয়েছেন যেখানে জীবনসত্যের সর্বাত্মক রূপ উপলব্ধি করা সম্ভব। অমূল্যধনের মতে, রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি কিংবা সুরস্রষ্টা নন, তিনি একই সঙ্গে 'the mighty prophet and the seer blest', এবং তাঁর বাণী মানুষে মানুষে, জাতিতে

জাতিতে, এমনকি মানবপ্রকৃতির আপাতবিরোধী আবেগ ও প্রবণতার মধ্যে শান্তি ও সৌষম্য প্রতিষ্ঠার পরম নির্দেশনা।।

বাংলায় গিরিশচন্দ্রের উপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন অমূল্যধন (আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা দ্রষ্টব্য)। একটু ভিন্ন কোণ থেকে তিনি গিরিশ-প্রতিভার মূল্যায়নে অগ্রসর হয়েছেন 'Girischandra : His Mind and Art' প্রবন্ধে। কলকাতার একটি সওদাগরী অফিসের করণিক গিরিশচন্দ্র উত্তর কলকাতার এক অপেশাদার মঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' প্রহসনের নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে পেশাদার মঞ্চের প্রয়োজনে তিনি নাটক-রচনায় ব্রতী হলেন। 'Curtain-raiser' থেকে ক্রমশ পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার দিকে তিনি অগ্রসর হলেন। মঞ্চের প্রয়োজনে, তিনি 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত রচনার নাট্যরূপ দান করেছেন। অমূল্যধন গিরিশচন্দ্রকে বার্নার্ড শ'-এর মতো 'art for art's sake' তত্ত্বে অবিশ্বাসী বলে মনে করেছেন। তাঁর কোন নাটকই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। গিরিশচন্দ্রের নাটক-বিচারে কোন কোন আধুনিক সমালোচকের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। য়ুরোপীয় নাট্যনীতির মানদণ্ডে গিরিশচন্দ্রের নাটকের মূল্যবিচারে অগ্রসর হয়ে তাঁরা স্বভাবতই অনেক বিষয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। তাঁরা প্রায়শই বিস্মৃত হন যে, সাহিত্যের রীতিনীতি সর্বক্ষেত্রেই বিশ্বজনীন নয়। বিশেষত, নাটক এমন একটি রচনা-শিল্প যার নির্মিতি যুগ ও পরিবেশের অনপেক্ষ নয়। সুতরাং পেরিক্লিসের যুগে এথেনীয় রঙ্গমঞ্চে অথবা ইলিজাবেথীয় যুগে লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকনিচয়ের আদর্শে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের পটভূমিতে কলকাতা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত, গিরিশচন্দ্রের নাটকের বিচার সমীচীন নয়। গিরিশচন্দ্র নিজেকে জানতেন, তাঁর নাটকে যে-সব নটনটী অভিনয় করবেন তাঁদের জানতেন, দর্শকদের জানতেন, এবং এই জানার ভিত্তিতে যুগ-মানস ও মঞ্চ-সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে নাটক রচনা করতেন (শেক্স্‌পীয়রও কি তাই করেন নি ?)। সুতরাং অমূল্যধনের বিচারে,

> 'An Aristotle or a Bradley could not set down the rules for a correct judgement of Girischandra's dramas.'

আর, গিরিশচন্দ্র কিছুটা শেক্সপীয়রের নাটক, কিছুটা সংস্কৃত নাটকের দ্বারা

প্রভাবিত হলেও তিনি কিন্তু স্বভাবতই বাংলার নিজস্ব নাট্যরীতির দ্বারাই মূলত পরিচালিত হয়েছেন।

আধুনিক বাংলা সমালোচনার জগতে অমূল্যধনের নাম নিঃসন্দেহে স্মেয়। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্নধর্মী আলোচনায় তিনি বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তাঁর বিশ্লেষণী শক্তি, সমালোচক হিসাবে তাঁর বিষয়নিবিষ্টতা ও মননশীলতা এবং আলোচ্য বিষয়ের সংবেদিত প্রত্যবেক্ষণ প্রশংসনীয়। সমালোচনার আদর্শ বিষয়ে তিনি একসময় বলেছিলেন :

> 'সাহিত্য-সমালোচনা কেবল বিচার নহে, তাহাও এক প্রকারের সৃষ্টি। "অন্তর হ'তে আহরি' বচন/আনন্দলোক করি বিরচন"—ইহা শুধু কবি-র নহে, সমালোচকেরও মর্মবাণী বলিয়া মনে করি···। (আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা, 'নিবেদন')

এই প্রত্যয় ও প্রয়াস তাঁর সমালোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃত ছন্দের গবেষণায় অমূল্যধন

অনন্তলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বৈদিক ভাষায় মন্ত্রের অক্ষর-পরিমাণকে বলা হয় 'ছন্দ'—'যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ'। সংস্কৃত কাব্যের ছন্দের মতো সেখানে লঘু-গুরু বিচার না থাকলেও স্বরপ্রক্রিয়ায় হ্রস্ব-দীর্ঘ পূর্ণমাত্রাতেই আছে। সংহিতাপাঠের স্বর উচ্চারণের সময় সংহিতা-দীর্ঘত্ব (metrical lengthening) লক্ষ্য করা যায়। জাত্য স্বরিতের প্রয়োগের ক্ষেত্রে (independent Svarita) হ্রস্ব-দীর্ঘের প্রশ্ন স্পষ্টভাবেই দেখা যায়। উদাত্তের পর যে স্বরিত তাকে অজাত্য (dependent) স্বরিত বলা হয়। কিন্তু স্বরবর্ণের বিশিষ্ট সংযোগে স্বর উচ্চারণের প্রয়োজনে যে স্বরিত উপস্থিত হয়েছে তাকে বলা হয় জাত্য স্বরিত। উদাত্তের প্রভাব সেখানে নেই। জাত্য স্বরিত যদি হ্রস্বস্বর হয় তবে তার পাশে ১ লেখা হয় এবং জাত্য স্বরিত যদি দীর্ঘস্বর হয় তবে তার পাশে ৩ লেখা হয়। সুতরাং অক্ষর-পরিমাণের দ্বারা গায়ত্রী, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী প্রভৃতি বৈদিক ছন্দগুলি নির্ণীত হলেও স্বর-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে হ্রস্ব-দীর্ঘের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তীকালে বেদপাঠের সহায়ক হিসেবে ছয় বেদাঙ্গ রচিত হয়েছে। মন্ত্রে পাদের সংখ্যা এবং প্রতিপাদে অক্ষরের পরিমাণ কত হবে এই নিয়েই বৈদিক ছন্দের নামকরণ হয়েছে।

মহাকাব্যযুগের প্রধান ছন্দ শ্লোক এবং তা বস্তুতঃ বৈদিক ছন্দ অনুষ্টুপের পরিবর্তিত এবং নিয়ন্ত্রিত রূপ। তবে মহাকাব্যের যুগে এসে ছন্দের প্রয়োগরীতি ক্রমশ বৈদিকযুগের স্বচ্ছন্দতাকে পরিহার করেছে এবং বিশেষ নিয়মের ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ পার হয়ে সংস্কৃতছন্দ বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যে এসে পড়ে। যেমন সংস্কৃত কাব্যের একটি জনপ্রিয় ছন্দ 'বংশ-স্থবিল' রামায়ণেও বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। অযোধ্যাকাণ্ডে 'বংশস্থবিল'-এর বার বার ব্যবহার দেখা যায়। তেমনি সুন্দরকাণ্ডে ইন্দ্রবংশা এবং রুচিরা ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। মহাভারতে অন্তত পঞ্চাশবার রুচিরার প্রয়োগ আছে। এই দুটি ছন্দকেই বৈদিক ছন্দ জগতী-র পরিবর্তিত রূপ বলা যায়। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ থেকেই ইন্দ্রবজ্রা এবং শালিনী ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত কাব্যের যুগে।

সংস্কৃত কাব্যের সুপরিচিত ছন্দ বসন্ততিলক্-ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের পরিবর্তিত বিশেষ রূপ।

পুষ্পিতাগ্রা, অপরবক্ত্র, সুন্দরী প্রভৃতি অর্ধসমবৃত্তের ব্যবহার রামায়ণ ও মহাভারতে দেখা যায়। বেদের যেমন বৃহতী ছন্দ অসম অক্ষরের মিশ্রপাদে বিরচিত, অর্ধসমবৃত্তগুলিও সেইভাবে সৃষ্ট।

সবচেয়ে কঠিন হল বিষমবৃত্তকে বিশ্লেষণ করা। এগুলিকে অবক্ষয়িত যুগের কষ্টকল্পনা বলে অনেকে মনে করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত ছন্দের এই উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ।

সংস্কৃত ছন্দের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবর্তনের এক অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ বিধৃত হয়েছে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছন্দোবিৎ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অমূল্যধন মুখার্জী (১৯০২—১৯৮৪)-প্রণীত Sanskrit Prosody : Its Evolution (কলিকাতা : সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৭৬) গ্রন্থটিতে। বৈদিক যুগে, মহাকাব্যের যুগে ও ধ্রুপদী সংস্কৃত কাব্যের যুগে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগে সংস্কৃত ছন্দ কিভাবে বিকাশলাভ করেছে এবং ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে তার একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ এবং নিখুঁত আলোচনা তিনি করেছেন। বাঙালী কবি জয়দেব -প্রণীত গীতগোবিন্দের ছন্দোবিচারে আলোচনা শেষ হয়েছে।

অমূল্যধনের অসাধারণ শ্রমসাধ্য গবেষণা আমাদের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে এই কারণে যে, তিনি চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সংস্কৃত ছন্দের বিবর্তন বিশ্লেষণ করেননি। এই বিষয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন এবং সংস্কৃত ছন্দের বিবর্তন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন একটি ইতিহাসগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছেন। তিনি ছন্দের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনাতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে যুগে যুগে সংস্কৃত ছন্দও কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা নিপুণ যুক্তিবিন্যাসের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি সংস্কৃত ছন্দসমূহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন এবং তাদের কাঠামো-গত নীতিগুলি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

সংস্কৃত ছন্দের বিবর্তনের ধারা অনুসন্ধান করতে গিয়ে অমূল্যধন প্রয়োজন-মতো স্থানে স্থানে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার সময় প্রাচীন গ্রীক্ ও ল্যাটিন সাহিত্যে ছন্দপ্রয়োগের পদ্ধতিগুলি পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট করেছেন। ইতিপূর্বে

সংস্কৃত ছন্দের বিবর্তন সম্বন্ধে এত বিস্তৃত, গভীর ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা আর কেউই করেননি। তুলনামূলকভাবে ছন্দ-চরিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, সংস্কৃত ছন্দ, প্রাচীন গ্রীক্ ছন্দ ও ল্যাটিন ছন্দ একই পরিবার-ভুক্ত এবং মোটামুটি একই কাঠামোয় বিধৃত। তিনি প্রমাণ করেছেন, সংস্কৃত ছন্দে যেমন যুগে যুগে নতুন নতুন ছন্দসৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা গেছে, অনুরূপভাবে প্রাচীন ও ধ্রুপদী গ্রীক্ ও ল্যাটিন ছন্দের বিকাশেও একই প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা গেছে।

ভারতে সুপ্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃত-পণ্ডিতগণ ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বিরল। সংস্কৃত ছন্দের নানা বৈচিত্র্য তাঁদের চোখে ধরা পড়লেও ছন্দ-বিজ্ঞানের কোন নীতি প্রণয়নের বা ছন্দোবৈচিত্র্যের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাস করার কোন প্রচেষ্টা সংস্কৃত পণ্ডিতদের লেখায় দেখা যায়নি। সর্বোপরি, সংস্কৃত ছন্দ সম্পর্কে চিরাচরিত আলোচনায় ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বিচারের প্রাসঙ্গিকতা অনুপস্থিত। তার ফলে কোন্ বিশেষ প্রকারের ছন্দ কোন্ যুগে প্রথম ব্যবহৃত হয় সে-সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক ধারণা জন্মায় না। সংস্কৃত ছন্দের বিকাশ ও বিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনায় এই অভাব দূর করেছেন অধ্যাপক অমূল্যধন মুখার্জী তাঁর পরিণত বয়সের শ্রেষ্ঠ গবেষণামূলক গ্রন্থটিতে। এর আগে ১৯৩০-এর দশকে তিনি বাংলা ছন্দের মূল-সূত্র আবিষ্কারে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং বাংলা ছন্দের প্রথম প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত করেন।

সংস্কৃত ছন্দের আলোচনায় পথিকৃৎ ঋষি পিঙ্গল-কে অনুসরণ করেই অন্যান্য সংস্কৃত ছন্দোবিদ্‌গণ বিভিন্ন ছন্দের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলেও তাঁরা কেউই সংস্কৃত ছন্দের কোন নীতি বা তত্ত্ব নির্মাণ করতে সক্ষম হননি। ব্রিটিশ, জার্মান, মার্কিন ও ফরাসী সংস্কৃতজ্ঞ গবেষকগণ অনেক মূল্যবান কাজ করেছেন, কিন্তু তাঁরা কেউই ছন্দ সম্পর্কে এই ধরনের কাজ করেননি। অমূল্যধন সেই কাজটি সুসম্পন্ন করেছেন এবং তা করেছেন প্রশংসনীয় বিশ্লেষণী দক্ষতার সঙ্গে।

অমূল্যধনের আলোচনার ও মতের কিছু পরিচয় দেওয়া এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। তাঁর মতে সংস্কৃত ছন্দের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য-দুটি রচনার যুগে অর্থাৎ আনুমানিক 400 B.C. থেকে 200 B.C. সময়ের মধ্যে। ছন্দোবৈচিত্র্য আরো বিশেষভাবে চোখে পড়ে মহাকাব্যযুগের

পর আরো দু'শো বছরের মধ্যে। অমূল্যধন এই সময়টিকে প্রাক্-ধ্রুপদী (pre-classical) যুগ বলেছেন যখন নতুন নতুন ধরনের ছন্দ প্রণয়ন ও ছন্দের সৌকর্য বিধানের জন্য বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কবি-নাট্যকার অশ্বঘোষ থেকে নাট্যকার ভাস-এর রচনায় এই ধরনের ছন্দোসৃষ্টির প্রয়াস বিশেষভাবে দেখা যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যের ক্লাসিকাল যুগ আনুমানিক চতুর্থ শতক থেকে নবম শতক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত যা সাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের 'স্বর্ণযুগ' বলে পরিচিত। এই সময় উত্তর ভারত ও মধ্য ভারত অঞ্চলে গুপ্ত সম্রাটদের ছত্রচ্ছায়ায় নানা দিক থেকেই সমৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যায় এবং কবি-সাহিত্যিক-পণ্ডিতগণ এক উচ্চ জীবনাদর্শের সাধনায় রত হন। এই সারস্বত প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ ফসল মহাকবি কালিদাস, যিনি বিভিন্ন ধরনের প্রচলিত ছন্দোবৈচিত্র্য ব্যবহার করেন এবং নিজেও স্বাগতা, মঞ্জুভাষিণী, মত্তময়ূর এবং মহামালিকা নামে চার ধরনের নতুন ছন্দ-প্রকরণ সৃষ্টি করেন।

নবম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়কে অমূল্যধন 'অবক্ষয়ের যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন যখন সংস্কৃত কবি-নাট্যকারগণ শুধু অনুকরণের (imitation) মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন। এই যুগের শেষদিকে একমাত্র উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিশীল গীতিময় ছন্দ সৃষ্টি করার প্রয়াস দেখা যায় 'গীতগোবিন্দ'-এর কবি জয়দেবের মধ্যে। ছন্দ নিয়ে জয়দেব যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সে-সম্বন্ধে অমূল্যধন বিস্তৃত ও গভীর আলোচনা করেছেন পুরো একটি অধ্যায়ে। এই সময়ের পর থেকে সংস্কৃত ভাষা তার প্রাণশক্তি হারাতে বসে এবং নতুন নতুন Indo-Aryan ভাষাগুলির জন্ম হতে থাকে। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও 'গীতগোবিন্দ'-র ছন্দের মধ্যে নতুন উদীয়মান Indo-Aryan ভাষাগুলির প্রভাব দেখা যায় বলেই অমূল্যধনের ধারণা। 'গীতগোবিন্দ'-কে তিনি সংস্কৃত কাব্যের "swan song" বলে বর্ণনা করেছেন, কারণ তারপর সংস্কৃত ছন্দ তার প্রাণস্পন্দন হারিয়ে ফেলে হয়ে যায় "merely mechanical exercise in versification, lacking life and genuine inspiration."

অমূল্যধনের আলোচনায় ও ছন্দ-বিশ্লেষণে গভীর মনীষার ছাপ রয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সমাজ-জীবনের বিবর্তনের সঙ্গে সংস্কৃত ছন্দের বিবর্তনকে তিনি মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন। ইংরেজিতে যাকে Sociology of

Knowledge বলে, কিছুটা সেই ধরনের চিন্তাপদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন তিনি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছন্দ-বিজ্ঞান-সম্পর্কিত তাঁর বিপুল ও গভীর জ্ঞান। তিনি কখনই পিঙ্গল-কে অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি সংস্কৃত ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব্ ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজে প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক জে. সি. রাইট (J. C. Wright)-কে লিখিত ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ তারিখের চিঠিতে অমূল্যধনের স্বীকারোক্তি : "I am not an orthodox believer in Pingala's theory of Sanskrit metrics".[১] ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর কাব্য ও ছন্দের যে-কোন গবেষকের কাছেই অমূল্যধনের আলোচনা অর্থবহ ও মূল্যবান বলে মনে হবে। এই প্রসঙ্গে অমূল্যধনের কাছে লিখিত পত্রে ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক লুডো রোশার-এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে : "Our knowledge of Sanskrit metrics is extremely limited. It is only through studies like yours that we shall be able to come to a better understanding."[২]

সংস্কৃত ছন্দের গবেষণায় অধ্যাপক অমূল্যধন মুখার্জীর দান শুধু উল্লেখযোগ্য ও চিত্তাকর্ষক তাই-ই নয়, তাঁর বক্তব্যের পরিবেশনা ও যুক্তিবিন্যাস উচ্চ প্রশংসা দাবী করে। একমাত্র দুঃখের বিষয় হল, তিনি এই কাজে হাত দিলেন জীবনের শেষ পর্যায়ে। তাঁর গবেষণা-গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার (১৯৭৬) পর আর মাত্র কয়েক বছর পরেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। সংস্কৃত ছন্দের বিবর্তনের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলির ছন্দ-বিবর্তনের তুলনামূলক আলোচনা করলে আরো চিত্তাকর্ষক কিছু সিদ্ধান্ত পাওয়া যেতে পারে এবং সে-কাজ তাঁর মতো দক্ষ ছান্দসিকই করতে পারতেন। আমাদের সে প্রত্যাশা অপূর্ণই রয়ে গেল। অধ্যাপক মুখার্জীর গ্রন্থটির 'পূর্বকথা' লিখেছেন ভাষাচার্য জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি অধ্যাপক মুখার্জীকে যে-ভাষায় অভিনন্দন জানিয়েছেন তা পুনরায় স্মরণ করে অমূল্যধনের প্রগাঢ় ছন্দ-

১. অধ্যাপক রাইট-কে লেখা অমূল্যধনের চিঠিটি দেখার সৌভাগ্য হয় অমূল্যধনের পুত্র অধ্যাপক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

২. পত্রাংশটি Sanskrit Prosody : Its Evolution গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

জ্ঞান ও বিশ্লেষণী দক্ষতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি : "...We have to thank Professor Amulyadhan Mukherji for his valuable offering of his at the shrine of Vāk or Saraswati, the goddess of Speech, as a tribute of adoration through science."

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

(১৯০২—১৯৮৪)

আদিত্য ওহ্‌দেদার

সেই ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ চুয়ান্ন বছর আগে, আমি যখন কাশী (বর্তমানের বারাণসী)-তে কলেজে পড়ছি তখনই আমার কাছে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয় নাম হয়ে উঠলেন।

এর কারণ রবীন্দ্রনাথ।

কথাটা একটু ভেঙ্গে বলি। তখন রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থ সদ্য বেরিয়েছে। সেই বইখানি কিনতে Students' Friends-এর দোকানে দেখি ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত কবির 'ছন্দ' বইখানিও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ অনু-করণ করে কবিতা লিখছি, দু'-একটা ছাপার অক্ষরে বেরচ্ছে এ-হেন অবস্থায় 'ছন্দ' বইটা কিনব না, এ কেমন কথা! এক টাকা দামের 'ছন্দ' বইটাও কিনে ফেললুম। তার পাতা উল্টোতেই দেখলুম, বিজ্ঞপ্তিতে কবি লিখেছেন, "বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যত কিছু আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হোলো। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওই বিষয় নিয়ে আমার কিছু বাদপ্রতিবাদ হয়েছে, তাঁদের তর্কের উত্তর এই গ্রন্থের অন্তর্গত করেছি। এই উপলক্ষ্যে বলা আবশ্যক, তাঁদের সঙ্গে আমার কিছু কিছু মতভেদ সত্ত্বেও ছন্দের বিচারে, তাঁদের প্রবীণতা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করে থাকি।" তারপর আরো পাতা উল্টে দেখি 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন, " 'আঁধার রজনী পোহাল' গানটি নয় মাত্রার ছন্দে রচিত। ছন্দতত্ত্বে প্রবীণ অমূল্যবাবু ওর নয়মাত্রিকতার দাবী একেবারে নামঞ্জুর করে দিলেন। অমূল্যবাবু বললেন, এটা তো নয়মাত্রার ছন্দ নয়ই, বাংলা ভাষায় আজো নয় মাত্রার উদ্ভব হয়নি, হয়তো নিরবধিকালে কোনো এক সময়ে হোতেও পারে। তিনি বলেন, বাংলা ছন্দ দশ-মাত্রাকে মেনেছে, নয়মাত্রাকে মানেনি। এ কথায় আরো আমার ধাঁধা লাগল।" স্পষ্টতই, কবি অমূল্যধনের কথা মানতে পারছেন না, মানেনওনি—কারণ, একটু পরেই স্পষ্ট বলেছেন যে, ছন্দের মাত্রা নির্ণয় সম্বন্ধে অমূল্যধনের পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর পদ্ধতির মূলেই প্রভেদ আছে। কিন্তু ছন্দতত্ত্ববিদ্ অমূল্যধনের প্রতি কবির

কতখানি শ্রদ্ধা ছিল তা জানা যায় কবির এই কথায় : "আর কারো হাত থেকে একথা এলে তাকে আপিল করবার যোগ্য বলেও গণ্য করতুম না, এ ক্ষেত্রে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে। রাস্তার লোক এসে যদি আমাকে বলে তোমার হাতে পাঁচটা আঙুল নেই তাহলে উদ্বেগের কোনো কারণ ঘটেনা। কিন্তু শরীরতত্ত্ববিদ্ এসে যদি এই সংবাদটা জানিয়ে যান তাহলে দশবার ক'রে নিজের আঙুল গুণে দেখি, মনে ভয় হয় অঙ্ক বুঝি ভুলে গেছি।"

'ছন্দতত্ত্বে প্রবীণ'—এই সম্মান-শিরোপা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অমূল্যধন লাভ করেন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'বাংলাছন্দের মূলসূত্র' বইটির দৌলতে। তবে বইটি হল ১৯৩০ সালে কৃত এক গবেষণার ফলশ্রুতি। 'প্রিন্‌সিপল্‌স অভ বেঙ্গলি প্রোসডি' নামে গবেষণাপত্র দাখিল করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও মোয়াট পদক পান। আঠাশ বছর বয়সে যিনি মৌলিক গবেষণার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন তাঁর ছাত্রজীবনের কৃতিত্ব কী পরিমাণ ছিল তা জানতে কৌতূহল জাগে। সে পরিচয় রীতিমতো গরিমাময়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় রাজসাহী বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণী পেয়ে উত্তীর্ণ হন। ঐ পরীক্ষায় আবশ্যিক বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ইংরেজিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষা দেন নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে, কিন্তু পাস করেন প্রথম শ্রেণী পেয়ে এবং পদক লাভ করে।

কর্মজীবনে অমূল্যধন ছিলেন অধ্যাপক। অবশ্য বি. এ. পাস করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করে এ. জি. বেঙ্গলে ঢোকেন। সেখানে থাকলে বড়ো চাকুরে নিশ্চয়ই হতেন কিন্তু এক-ডাকে-চেনা ছন্দতত্ত্ববিদ্ হতে পারতেন কিনা সন্দেহ। ভালোই হল, বছর দুই পরে ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে এ.জি. বেঙ্গল ছাড়তে হল। কারণ এরপর এম.এ. পাস করে তাঁর যোগ্য কাজ—অধ্যাপনায় ব্রতী হলেন। প্রথমে রংপুর কারমাইকেল কলেজে, পরে কলকাতার আশুতোষ কলেজ ও যোগমায়া দেবী কলেজে। রংপুরে কাজে ঢোকার বছরতিনেকের মধ্যেই বাংলা ছন্দ সম্পর্কে একাগ্র গবেষণা শুরু করেন এবং ছ'মাসে শেষ করেন। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই খ্যাতি।

কিন্তু তাই বলে অমূল্যধন কবিতার নিছক [illegible]

আঁতের খবর নিতেও গভীরভাবে আগ্রহী হয়েছেন। কবিতাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও তেমনি দেখেছেন। এই দেখাটা রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে আশ্রয় করেই ঘটেছে, যার পরিচয় রয়েছে তাঁর রচিত 'কবিগুরু' (১৯৫১, ২য় সং ১৯৬৪) ও 'রবীন্দ্রনাথের মানসী' (১৯৬১) বই দুটিতে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ছন্দ নিয়ে তাঁর 'স্টাডিজ ইন রবীন্দ্রনাথস্ প্রোসডি' নামে ইংরেজি প্রবন্ধটি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত Journal of the Department of Letters পত্রিকার ৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত) অত্যন্ত মূল্যবান। এতে তত্ত্ব ও রসবোধ হরিহর-আত্মা হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের নানাবিধ ছন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে কবির কাব্য-মানস কীভাবে বিকশিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা রবীন্দ্র-সন্ধিৎসুর কাছে এক চিত্তাকর্ষক-আলোচনা।

অমূল্যধনের সাহিত্য আলোচনার আশ্রয় রবীন্দ্রনাথ হলেও তিনি বাংলা সাহিত্যের এবং ইংরেজি তথা ইউরোপীয় সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ভূমিতে অবাধে বিচরণ করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণের প্রমাণ আছে তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটিতে (১৯৬১)। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য লেখকদেরও প্রতি তাঁর আকর্ষণ যে ছিল তা জানতে পারি তাঁর লেখা 'দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়লে। (প্রবন্ধটি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল -সম্পাদিত 'সমালোচনা সাহিত্য' গ্রন্থে সঙ্কলিত)। এইরকম তাঁর আরো রচনা ইতস্তত হয়ত ছড়িয়ে আছে, অন্বেষণ প্রয়োজন।

২

১৯৬৫-তে অমূল্যধন যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে অবসরগ্রহণ করলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ইংরেজি বিভাগে নিযুক্ত করেন। ঐ সময় আমি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক। একদিন দেখি, লাইব্রেরীতে আমার বসবার ঘরে প্রবেশ করলেন খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা বেঁটে-খাটো এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক—লর্ড ওয়াভেল (একদা ভারতের বড়োলাট)-ছাঁদে ছাঁটা গোঁফ, প্রশস্ত কপাল, মাথার চুল কদম-ছাঁটা কদম-ছাঁটা লাগে। গোঁফ ও মাথার চুলের সবটাই প্রায় সাদা।

আগন্তুক বললেন, আমার নাম অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগে কিছুদিন হল যোগ দিয়েছি। আমার 'কবিগুরু'

বইটার উল্লেখ আপনি আপনার বইতে করেছেন। শেষের কথাটা এমনভাবে বললেন যেন ওঁর ঐ বই আমার 'রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ধারা' (১৯৫৯)-তে উল্লিখিত হওয়ায় উনি ধন্য হয়ে গেছেন। বুঝলুম, অমূল্যধন একান্তই নিরহঙ্কার এবং তাঁর মনটা শিশুর সরলতায় ভরা।

আমি বললুম, আমার বয়স যখন সতেরো তখনি আপনি আমার কাছে একজন 'হিরো'।

অমূল্যধন শিশুর মতো হাসি হেসে ও কৌতূহলী হয়ে বললেন, কী রকম, কী রকম?

আমি ব্যাপার খুলে বললুম।

অমূল্যধন তখন বললেন, তাহলে আপনাকে বলি। রংপুর কলেজে ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, উনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের শিষ্য। ওঁর প্রেরণাতেই ছন্দ নিয়ে আমি গবেষণায় মাতি। সে হল ১৯২৭ সালের কথা। 'বলাকা'র ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতে উনি বললেন, তুমি বাংলা ছন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লেখ না? আমি দেরি করছি দেখে একদিন বললেন, কই হে অমূল্য, তোমার লেখার কি করলে? আমি সেই রাত্রেই লিখতে বসলাম, মাস ছয়েকের মধ্যে থিসিস্ শেষ। নাম, স্টাডিস ইন বেঙ্গলী প্রোসডি, ভাল্যুম ওয়ান: প্রিন্সিপল্স। দীনেশ সেন তখন বাংলা বিভাগের প্রধান, আর সুনীতিবাবু ছিলেন তখন একজন পরীক্ষক। সুনীতিবাবু থিসিস্টি পড়ে খুব অবাক হয়ে যান। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে। তখন—সালটা ১৯৩১—কবির সত্তর বছর বয়স পূর্তি উপলক্ষে উৎসব চলছে। সঙ্গে ছিলেন রঙিন হালদার আর কালিদাস নাগ। তিনদিন ছিলাম। প্রত্যহ দু'বেলা আলোচনা হত। কবি বলেছিলেন, আমি যা পারিনি, বৈজ্ঞানিক-ভাবে তুমি তা করেছ। 'বলাকা' থেকে কবি পড়তে লাগলেন। আমি যেমন স্ক্যান করেছিলাম প্রশান্ত মহলানবীশ মিলিয়ে পড়ে বললেন, হ্যাঁ ঠিকই আছে।

অমূল্যধনের মধুর আকর্ষণীশক্তিতে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ আলাপেই আমি ওঁর বন্ধুস্থানীয় হয়ে উঠলুম।

১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত অমূল্যধন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। এই পাঁচ বছরে তিনি বহুদিন আমার কাছে এসেছেন। গল্পগাছা করেছেন, সাহিত্য-আলোচনা করেছেন।

মনে পড়ছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অমূল্যধনের মৌলিক গবেষণার জন্যে ১৯৬৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। আমি অভিনন্দন জানাতে তিনি বললেন, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আমি ছাত্র, সেখান থেকে সম্মান পেলে আমায় এক বিশেষ ধরনের আনন্দ হবারই কথা। কিন্তু আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছি রবীন্দ্র-নাথের কাছ থেকে, তিনিই আমাকে বিখ্যাত করেছেন।

একদিন বললেন, সংস্কৃত ছন্দের ওপর কাজ করার ইচ্ছে আছে, বিষয়টা সম্পর্কে নতুন ভাবনার অবকাশ আছে। তাঁর ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করেছিলেন, যদিও অপটু শরীরের জন্য সময় লেগেছে। তাঁর শেষবয়সের অসাধারণ গবেষণা-গ্রন্থ 'স্যাংস্কৃট প্রোসডি—ইট্‌স ইভোলিউশন' প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে।

তাঁর মুখেই শুনেছিলাম তিনি ছিলেন ক্রিকেটের ভক্ত—যৌবনে ঐ খেলায় আম্পায়ারিং করেছেন, বুড়োবয়সেও মাঠে হাজির হয়েছেন। ক্রিকেটে আমারও আকর্ষণ, ফলে আমাদের গল্পে ব্র্যাডম্যান, নাইডু, মুস্তাক আলি, পাতৌদি, গাভাসকার প্রমুখকে টেনে এনেছি।

মনে পড়ছে একদিন বলেছিলেন, আনন্দবাজারের আনন্দমেলায় আপনার লেখা ছোটদের গল্প কয়েকটা পড়েছি। আমিও মশায় ছোটদের জন্যে বেশ কয়েকটা কাহিনী লিখেছি। শুনে আমি বলেছিনুম—বই ছাপিয়ে দিন, দেরি করবেন না। তিনি বলেছিলেন, দেখি কবে বার করতে পারি। হাঁা, বেরিয়েছে সে-বই, তাঁর মৃত্যুর বছর চারেক আগে—নাম্ : 'নবাব কাহিনী'।

৩

এবার প্রশ্ন, অমূল্যধন সম্পর্কে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় লেখা কেন! অনেক তরুণ গ্রন্থাগারিকদের মনে এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই এসেছে। আবার কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন, অমূল্যধনের কথা 'গ্রন্থাগার'-এ স্থান পেল, সেকি এইজন্যে যে তাঁর এক পুত্র ড° বরুণকুমার মুখোপাধ্যায় হলেন একজন গ্রন্থাগারিক।

আসল কথা, অমূল্যধন নিজের অধিকারেই গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে স্মর্তব্য ও উল্লেখনীয়। অমূল্যধনের পৈতৃক ভিটা হল হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ায়—যে বাঁশবেড়িয়াকে আমরা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান বলে গণ্য করি। এই আন্দোলনের প্রথম পর্বের তিন দিক্‌পাল মুনীন্দ্র দেবরায়, তিনকড়ি

দত্ত ও মণীন্দ্র রুদ্র—এঁরা সকলেই বাঁশবেড়িয়ার লোক। অমূল্যধন এঁদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ ক'রে গ্রন্থাগার-আন্দোলনের শরিক হন। বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারের তিনি ছিলেন একজন কর্ণধার। উনিশ শ' তিরিশ ও চল্লিশের দশকে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন উৎসাহী সংগঠক ছিলেন।

অমূল্যধনের সঙ্গে আলাপচারিতে লক্ষ্য করেছি, তিনি গ্রন্থাগার-আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন বলেই হোক অথবা ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার জন্যেই হোক, লাইব্রেরিয়ানের কাজের গুরুত্বটা বিলক্ষণ বুঝতেন। বহু তাবড়ো তাবড়ো শিক্ষাবিদ্ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের বলতে শুনেছি: লাইব্রেরিয়ানদের কাজ হল বই সাজানো ও বই দেওয়া-নেওয়া করা। অমূল্যধন বলতেন, লাইব্রেরিয়ানদের কাজটা কী, তা তো ডক্টর জন্সনের কথাতেই বলা আছে: To know where we can find information upon a subject.

কিশোর-সাহিত্যে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

নির্মলেন্দু ভৌমিক

ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের মূল পরিচয় ছিল—ছান্দসিক রূপে, অতঃপর সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে। জীবনের প্রথমদিকে লিখেছিলেন বাঙলা ছন্দ-বিষয়ক গ্রন্থ,—আর শেষবয়সে লিখেছেন সংস্কৃত ছন্দ নিয়ে—অর্থাৎ জীবনটা আগাগোড়াই ছন্দের ব্যাপার ছিল। মূল্যবোধ ও মানসিকতার দিক থেকে বিশ শতকের প্রথমদিককার বুদ্ধিজীবী বাঙালীর প্রতিনিধি তিনি। এই মূল্যবোধের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিতে স্নাত হয়েও স্বাদেশিকতাকে অঙ্গীকার করা। এরই কারণে বহু ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক বাংলা সাহিত্যের সমালোচক রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এইসব অধ্যাপকবর্গের মধ্যে আবার দু'টি উপবিভাগ কল্পনা করা যায়। এক দল কেবল সমালোচনা-সাহিত্য ও নানা তাত্ত্বিক আলোচনায় রত ছিলেন; অপর দল, অধ্যাপক হয়েও সৃষ্টিধর্মী রচনার দিকে আকৃষ্ট হন এবং নিজ নিজ প্রতিভাকে সেই দিকে নিয়োজিত করেন।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মূলত প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত হলেও, কিছু পরিমাণে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যেরও অনুশীলন করেছেন। দুরূহ ছন্দের আলোচনা বা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনার অবসরে তিনি কখনো-কখনো কিশোরদের জগতেও বিচরণ করেছেন। এরই ফল তাঁর 'নবাব কাহিনী' (প্রাইমা পাবলিকেশন্‌স্‌, রথযাত্রা, ১৩৮৭) নামে গল্পগ্রন্থটি। একজন বুদ্ধিজীবীর পরিণত কলমে যখন এই ধরনের খোশগল্প রচিত হয়, তখন তার বিচারও করতে হয় একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে।

শিশু বা কিশোরদের জন্য সাহিত্য-রচনা করাটা নিতান্তই সহজ কোনো ব্যাপার নয়। এলোমেলো কিছু উৎকট কল্পনা এবং কিছু বিবরণ বিবৃতি—তাই দিয়ে খাঁটি কিশোর বা শিশুদের সাহিত্য রচিত হতে পারে না। এর জন্য চাই শিল্পীর সাধনা; সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও চাই মানবজীবন ও মনস্তত্ত্বের বোধ ও তার যথাযথ প্রকাশ। কিশোর-সাহিত্য কিশোরদের লেখা নয়; সর্বদাই তা প্রাপ্ত ও পূর্ণবয়স্কের রচনা। সেই প্রাপ্ত ও পূর্ণবয়স্ককে শিশু

বা কিশোর সেজে নিতে হয় মনে-মনে। এই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে: কিশোর-সাহিত্য কি কেবল কিশোরদেরই পাঠ্য? বয়স্ক মানুষও কি তা পড়তে পারেন না? আমার মতে, সেই সাহিত্যই খাঁটি কিশোর-সাহিত্য, যা ক্ষণকালের জন্য বয়স্ক মানুষকে কিশোর বা শিশু করে দেয়। সৃষ্টির অলঙ্ঘ্য বিধানে কিশোর বা শিশু তো তাদের মানসিকতাই অর্জন করবে; কিন্তু, সেই সৃষ্টির অপর লঙ্ঘনীয় বিধানে বয়স্ক মানুষও যখন জীবন-প্রবাহের উজানে চলে আসে যে-সাহিত্যের প্রভাবে, তার মূল্য অল্প নয়। কোনো লেখক কিশোর বা শিশুসাহিত্যিক রূপে সফল কিনা, তার বিচার এই দৃষ্টিকোণ থেকে করলে কেমন হয়?

২

শিশু বা কিশোর-সাহিত্য বিচারের আরো কয়েকটি দিক আছে। এর কিছু-কিছু দিক—কোনো জাতির দেশ-কাল-ঘটিত; অন্যদিক, সেই লেখকের নিজ মানসের বিশেষত্ব।

অন্য দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে আমাদের বাঙলাদেশ ও বাঙালীর কিশোর-সাহিত্যের কথা বলি। ঊনবিংশ শতকে যে শিশু-পাঠ্য সাহিত্যের প্রচলন হয়, স্বাভাবিক কারণেই তা ছিল তখনকার জীবন ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত। শিশু বা কিশোর-সাহিত্য বলতে তখন ছিল নীতি-কবিতা ও নীতি-বিষয়ক রচনা। এই নীতি-বিষয়ক রচনাগুলি ছিল মূলত exemplary বা আদর্শ-দৃষ্টান্ত-মূলক। 'রাম বড়ো সুবোধ বালক, যাহা পায় তাহা খায় এবং কখনোই পিতা-মাতার অবাধ্য হয় না'; কিংবা, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারা দিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি'। এমন-এমন চরিত্র-কাহিনী-ঘটনা-দৃশ্য রচিত হত, যা পাঠ বা শ্রবণে শিশু-কিশোরের নীতিজ্ঞান জেগে ওঠে। শুধু কিশোরই বা কেন, প্রাপ্তবয়স্কদের পাঠ্য নাটক-উপন্যাসেও সেই একই কথা। রেনেসাঁসের ফল হিসেবে বাঙালীর তখন আদর্শ এক জাতি হিসেবে গড়ে ওঠবার প্রেরণা এসেছিল। সেই আদর্শবোধের মধ্যে ছিল একধরনের নীতিগত বিশুদ্ধতা। সেজন্যেই কি সাধারণ সাহিত্যে, কি কিশোর-সাহিত্যে নীতিগত দিক প্রাধান্য পেয়ে গিয়েছিল।

এই নীতিগত দিক ছাড়া, বঙ্গীয় কিশোর-সাহিত্যের ছিল আর ক'টি বিশেষত্ব: সাধারণ জ্ঞানের দিক, এবং সেই সূত্র ধরে ভ্রমণকাহিনী ও দুঃসাহসিক

অভিযানের দিক। কিশোর-সাহিত্যের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক নারীশিক্ষার দিকটিও কোনো এক সময়ে প্রায় অজ্ঞাতে জড়িত হয়ে যায়। দুঃসাহসিক অভিযান, 'অ্যাডভেঞ্চার' প্রভৃতির পেছনে ছিল মূলত ইংরেজি ও পাশ্চাত্য অন্যান্য সাহিত্যের প্রভাব। এই দুঃসাহসিক অভিযান শেষে, পরবর্তী কালে, স্বাদেশিকতার প্রভাবে কোনো কোনো আদর্শবাদী চরিত্রে পরিণত হয়। এর ফলে অসৎবৃত্তির লোকেরাও (যেমন, প্রখ্যাত ডাকাত বা এই ধরনের চরিত্র) দেশপ্রেমিক ও সমাজপ্রেমিক আদর্শরূপে গৃহীত হয়।

হাসি, কৌতুক-ব্যঙ্গ ও বোকামি-চালাকির গল্প এবং তার নায়ক-চরিত্রের বিশেষত্ব বাংলা কিশোর-সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য উপকরণ। এর পটভূমিতে আছে ইস্কুল-ছাত্র, শিক্ষক এবং বিশেষ কোনো অকালপক্ক বা অতি-বোকা চরিত্র। এদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও false analogy এসব ক্ষেত্রে হাস্যরস সৃষ্টি করে। একদিকে অতি-সপ্রতিভ, অন্যদিকে অতি-সরল-চরিত্র কিশোরের বয়ঃসন্ধির দুই বিপরীত দিক হয়ে ওঠে।

আড্ডা এবং আড্ডাধারী কোনো নায়ক-চরিত্রের মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের নানা বিচিত্র দিকের বিচিত্রতর সংবাদপ্রদান কিশোর-সাহিত্যের আর এক দিক। বস্তুত, এই দিকটিকেই কিয়ৎপরিমাণে খাঁটি ভারতীয় দিক বলা চলে, যদিও কোনো-কোনো বিশেষ দিকে পাশ্চাত্য প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বঙ্গীয় তথা ভারতীয় জীবনে বৈঠকখানা, চণ্ডীতলা, বারোয়ারীতলা প্রভৃতি স্থানে নানাজনে মিলে নানা রকম অভিজ্ঞতার কথা বলা অপরিচিত কিছু নয়। এইসব সভায় একজন মূল আড্ডাধারী নায়ক থাকেন, জীবন সম্পর্কে যাঁর ভূয়োদর্শন আছে। তাঁকেই কেন্দ্র করে আড্ডাটি জমাট বাঁধে। গ্রামে-জনপদে যেমন, তেমনি এর উন্নততর সংস্করণ দেখা যায় রাজা-জমিদার-নবাব ইত্যাদির সভামঞ্চে। রাজা-মহারাজাদের এজন্য বেতনভুক কথক বা ওই ধরনের চরিত্র থাকবেই। শোনা যায়, ঈশপ নাকি কোনো রাজার সভা-কথক ছিলেন। আকবরের রাজসভায় বীরবল বা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় গোপাল ভাঁড় এমনই চরিত্র। এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই ভূয়োদর্শন, তির্যক্‌দৃষ্টি, রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক-বিদ্রূপ করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। উপস্থিত-বুদ্ধি ও সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব এঁদের স্থানে স্থানে বিশেষত্ব প্রদান করেছে।

এইপ্রকার উপস্থিত-বুদ্ধিসম্পন্ন, সপ্রতিভ চরিত্রগুলিই কালে-কালে বঙ্গীয়

কিশোর-সাহিত্যের নায়ক-চরিত্রে রূপ লাভ করেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা, সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা—সবই এই একই উৎস থেকে জাত। এইসব চরিত্রগুলি সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি হেন বিষয় নেই, যা না জানে। এদের মধ্যে দেখা যায়, এদের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে, প্রতিদিন বা সময়ে সময়ে সেখানে তারা আসে; তাদের একটি নির্দিষ্ট সভা আছে, সেই সভার সভাসদ্ ও শ্রোতা আছে। অর্থাৎ রাজসভা ও চণ্ডীতলার মিশ্রণে; এবং চণ্ডীতলা ও রাজসভার কথকের মিশ্রণে; সঙ্গে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের কিছু আনুষঙ্গিক উপাদানে এই চরিত্রগুলি গড়ে উঠেছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এরা সবাই 'দাদা'। কেন অন্য কোনো সম্পর্ক স্থাপন করা হয়নি? বাঙলা কিশোর-সাহিত্যে 'দাদা'র পর মেসো, মামা। আসলে দাদু-ঠাকুরদা এবং মামারাই চিরকাল গল্প বলে এসেছেন। ছোটোদের দাবী পূরণের জন্য নানা সময়েই শোনা কথা বা সত্যকথাকে রঙ চড়িয়ে তাঁদের বলতে হত। অতঃপর সেই ধারাই পুষ্ট হয়ে এখন এক সাহিত্যিক ঐতিহ্য লাভ করেছে।

তা হলে, পরিবেশের দিক থেকে বাঙলা কিশোর-সাহিত্যের যে আঙ্গিকটি একটি বিশেষত্ব অর্জন করেছে, সেটি এই: ১. কোনো বিশেষ আড্ডা, সভা, স্থান; ২. কোনো বিশেষ একটি নায়ক-চরিত্র: তার অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন ও পর্যবেক্ষণ; ৩. কিন্তু তা অতিরঞ্জিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিত্তিহীন এক মানস-বিলাস: হাসির ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে তা কিন্তু সীরিয়াস; ৪. এদের একদল শ্রোতা বা বাহিনী থাকে; ৫. তাদের মধ্যে একজন নায়ক-চরিত্রের ভক্ত, সহায়ক ইত্যাদি হয়।

৩

এই সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও পটভূমিকায় অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 'নবাব কাহিনী'র কাহিনীগুলি বিচার করলে এর বৈশিষ্ট্য ও ধারাটি সহজেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। 'নবাব কাহিনী'র দুটি অংশ: এক অংশে 'নবাব কাহিনী' শিরোনামে ছ'টি গল্প (বিনিপয়সার ভোজ, কুচ্ মহল, গরমাগরম, ঢালাও ঘি, বাঘ শিকার, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায়), আর 'অন্যান্য গল্প' শিরোনামে দু'টি গল্প (দাদা কাহিনী, পূজায় ভ্রমণ)। প্রথম অংশই মূল দিক।

প্রথম অংশ বা 'নবাব কাহিনী' অংশে যে ছ'টি গল্প আছে, তার মূল নায়ক নবাব নন,—সেই নবাবেরই ভৃত্য আব্দাল্লা। নবাব আজ নামেই নবাব। আজ সে হতশ্রী, নিতান্ত দরিদ্র, দিন চলে না এমন দীন। কিন্তু নবাবী চাল তার পুরোদস্তুর আছে। তার কথাবার্তায়, চালচলনে অতীতের গৌরবের রেশটুকু পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত। এই ধরনের চরিত্রগুলির পেছনে একধরনের কারুণ্য জড়িয়ে থাকে। এদের অহঙ্কার থাকে অতীতকে আঁকড়ে, বর্তমানে এরা নিঃস্ব হয়ে অসহায়। বর্তমান যুগের সঙ্গে এদের মন-মানস ও মূল্যবোধ খাপ খায় না। এইজন্য তারা নিজস্ব একটি জগৎ গড়ে নেয়। সেই জগতে তারাই ঠাঁই পায়, যারা সেই জগৎকে বিশ্বাস করে। এই নবাবের যেমন পার্ষদগণ। তারাও নবাবেরই মতো চলে-যাওয়া অতীতকে এখনো আঁকড়ে আছে। তাদের কথা-বার্তা, গাল-গল্প অন্য কারো ভালো লাগবে না, তাদের কাছে এসব নিছক ভিত্তিহীন মানসিক বিলাস মাত্র। কাজেই স্বয়ং নবাব এবং তার পার্ষদগণ যে এক কল্পনাময় অতীত রাজ্যে বিচরণ করছে, তার সঙ্গে যে বর্তমান ও বাস্তব জগতে তারা বসবাস করছে,—তার কোনো যোগ নেই। এই যোগ না-থাকাটাই একটি বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করেছে। ফলে তাদের কল্পনাময় অতীতের রাজ্যটি একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো স্বতন্ত্র হয়ে ধরা দেয়।

আসলে এই ধরনের পরিবেশ অন্যান্য দেশের সাহিত্যেও সুপরিচিত। এ হল যুগসন্ধির একটি বিশিষ্টতা। তা বড়োদের সাহিত্যেও যেমন কিশোরদের সাহিত্যেও তেমনি দেখা যায়। তবে প্রকাশটা ভিন্ন হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুর্দা' গল্পে কিংবা তারাশঙ্করের তাবৎ সাহিত্যে আমরা এই দুই যুগের সন্ধি-ক্ষণের ছবি পাই। একটি মধ্যযুগীয় ও সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার বিলীয়মান দিক, অন্যটি শিল্পোৎপাদনের ফলে আধুনিক সভ্যতার উদীয়মান দিক। এই দুই দিকের বিপরীত আকর্ষণে এই ধরনের চরিত্রগুলির কার্যকলাপ হাস্যরসের ও করুণরসের কারণ হয়ে ওঠে।

তাঁর 'নবাব কাহিনী'-মালায় অমূল্যধন কিশোর-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে প্রতিবেশ গ্রহণ করেছেন, তার দুটি উৎস আছে। একটি, আগেই বলেছি, কিশোর-জগৎকে পরিস্ফুট করবার জন্য, কোনো উপস্থিত-বুদ্ধিসম্পন্ন, সপ্রতিভ, বহুদর্শী (সদর্থে ও কদর্থে) চরিত্রের অবতারণা। 'নবাব কাহিনী'র আব্দাল্লা হল এই ধরনের চরিত্র। অপরটি, সেই বিশেষ চরিত্রটির পরিস্ফুটনের পরিপোষক-

রূপে গৃহীত একটি প্রতিবেশ,—এখানে নবাবের বৈঠকখানা। নবাবের বৈঠক-খানায় বিচিত্র প্রসঙ্গের আলাপন যদি না হত, তবে আব্দাল্লার বিশেষ-বিশেষ সঙ্কটময় ক্ষণে আবির্ভাবের এবং তার প্রতিভার পরিচয় দানের কোনো অবকাশই থাকত না। আবার আব্দাল্লা না থাকলে গৃহীত প্রতিবেশটিও ম্লান ও নিরর্থক হয়ে যেত। সুতরাং একদিকে নবাব ও তার বৈঠকখানা এবং অন্যদিকে আব্দাল্লা চরিত্র—এই দুই দিক মিলিত হয়েই গল্পগুলির মূল প্রতিবেশ রচনা করেছে। একটিকে অপরটি থেকে বিযুক্ত-বিচ্ছিন্ন করা চলে না কিছুতেই।

প্রশ্ন এই, লেখক কেন অতীতের গত-গৌরবেরপটভূমি গ্রহণ করলেন? এ কি চলে-যাওয়া গৌরবময় বিংশ শতাব্দীর-প্রথম ভাগ, যার মধ্যে লেখক নিজে গড়ে-বেড়ে উঠেছেন, তারই জন্যে পরোক্ষে দীর্ঘশ্বাস? তাঁর নিজের কিশোর-জীবন বাঁধা আছে যে প্রাক্-প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের কাছে, তাকেই একটি রোমাণ্টিক জগৎ বলে মনে করে নিয়ে কিশোর-সাহিত্যরূপেই তাকে প্রকাশ করা!

৪

এইবার আব্দাল্লার কথা বলি।

আব্দাল্লাকে আপাতদৃষ্টিতে একজন বাক্-চতুর, উপস্থিত-বুদ্ধিসম্পন্ন ভৃত্য বলে মনে হলেও, তাকে নিছক ভৃত্য বলেই গ্রহণ করা যায় না। পৃথিবীর বহুদেশের সাহিত্যে এই ধরনের ভৃত্য বা তৎস্থানীয় চরিত্র মেলে। এই চরিত্র-গুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: একদল আছে, যারা নিরীহ, রসিক, সমবেদনাপূর্ণ ও উপকারী। উল্টো দিকে আছে, হিংস্র, ক্ষতিকারক, প্রতিশোধ-পরায়ণ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এক বিশেষ অর্থে ন্যায়পরায়ণ, নিজস্ব যুক্তিতে এরা চলে থাকে। এদের জীবননীতি হল—measure for measure, শঠের কাছে শঠ হওয়া, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর মারা, যেমন বাঘা ওল তেমনি বুনো তেঁতুল হওয়া। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ঘুঘু-ফাঁদ দুই ভাইকে নিয়ে যে লোককথা-ধারা চলিত আছে তার মধ্যে ঘুঘু এই ধরনের চরিত্র। আর আমাদের আব্দাল্লা প্রথম ধারার প্রতিনিধি।

কিন্তু আব্দাল্লাকে যতই নিরীহ মনে হোক, তারও একটি নির্দিষ্ট জীবননীতি আছে। আব্দাল্লা মূলত সূপকার, পাচক, বাবুর্চি। রন্ধনশালাই তার উপযুক্ত

স্থান। কিন্তু যখনই তার হুজুর বিপদে বা সঙ্কটে পড়ে, কিংবা আলোচ্য অভিজ্ঞতার অনুরূপ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করবার ডাক আসে, সে তখনই কেবল রন্ধনশালা থেকে বৈঠকখানায় আত্মপ্রকাশ করে। নচেৎ নয়। অর্থাৎ কখনোই সে নিজের থেকে হুজুরের বৈঠকখানার আলোচনায় অংশগ্রহণ করে না। এই জন্যেই তাকে বাচাল বা অকারণে অনধিকার-প্রবেশকারী কোনো অবাঞ্ছিত চরিত্র বলে মনে হয় না। তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, সে সুমিতবাক্ পুরুষ। যতটুকু প্রয়োজনীয় তার অতিরিক্ত কোনো কথা সে বলে না। যেন খুব তাড়াতাড়ি যে কথা-ক'টি বলবার জন্য এসেছে, তা বলে নিয়েই সে আবার যথারীতি রান্না করতে যাবে।

তার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল, বৈঠকখানায় যখন যে বিশেষ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে হুজুরের পার্ষদগণের মধ্যে, সে-আলোচনাকে সে কল্পনার অবাস্তব বিষয় জেনেও নিজেও সেই সুরে কথা বলেছে। খোঁচা দিয়ে বা বিরুদ্ধাচরণ করে কল্পনার সেই ফানুসটিকে ফাটিয়ে দেয়নি। এইখানেই তার উপস্থিত-বুদ্ধি ও কল্পনাকুশলতার সঙ্গে তার সমবেদনাবোধ জড়িত হয়েছে। সে জানে, তার হুজুরের অবস্থা নিতান্তই এক দরিদ্রের মতো, সেই হুজুর তার সহচারীদের নিয়ে অতীত গৌরবের দিনগুলির রঙীন কল্পনায় মশগুল,—তাকে সেই রোমন্থনশীল জীবন থেকে আব্দাল্লা কখনোই বাস্তবের খোঁচা দিয়ে রূঢ়তার মধ্যে টেনে আনতে চায়নি। বরং তার হুজুর সঙ্কটে পড়লে আপন উপস্থিত-বুদ্ধি ও সপ্রতিভতার জোরে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে; কখনো-কখনো সে তার বিপুল অভিজ্ঞতার ভান করে বৈঠকখানার অন্যান্য বক্তাদের ছাপিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে সত্যি, কিন্তু তার মধ্যে কোনো উগ্রতা নেই।

ঠিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সে আর-একটি পরিস্থিতি তৎক্ষণাৎ নির্মাণ করে নিতে পারে। এর মধ্যে লেখক একটি 'সৃষ্টি'র দিক লক্ষ্য করেছেন: "...এই আব্দাল্লার জন্যই তার মনিবের নবাবী চাল বজায় রয়েছে। এটা বোধ হয় শুধু প্রভুভক্তি নয়, এতেই বোধ হয় আব্দাল্লা একটা গোপন সৃষ্টি-সুখ পায়।" এই সৃষ্টির মধ্যেই আব্দাল্লা শিল্পী হয়ে যায়। আব্দাল্লা লেখকেরও শিল্পসামর্থ্যের নিঃসন্দিগ্ধ নিদর্শন।

৫

দ্বিতীয় অংশের 'দাদাকাহিনী'র দাদা-চরিত্রকে আব্দাল্লারই অন্য সংস্করণ বলে ভাবা যেতে পারে, যদিও শোনা যায় যে, প্রেসিডেন্সি কলেজে ও হিন্দু হোস্টেলে থাকার সময় কোনো একজন বুদ্ধিমান ও ডানপিটে 'সিনিয়র' ছাত্রের কাণ্ডকারখানা অমূল্যধনকে 'দাদা' চরিত্রের প্রেরণা যুগিয়েছিল। আব্দাল্লার অনেক গুণ ও বিশেষত্বই 'দাদা'র মধ্যে সঞ্চারিত। দাদার যে তিনটি কাহিনী এতে দেওয়া হয়েছে, তিনটি তিন রকমের। প্রথমটি রসিকতার, যদিও তার মধ্যে একটু বিদ্রূপের আভাস আছে; দ্বিতীয়টি পুরোই বিদ্রূপের; এবং তৃতীয়টি মানবিকতা ও পরোপকারের। প্রতিটি দৃষ্টান্তই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। কিন্তু যেহেতু একই চরিত্রের প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তগুলি প্রদত্ত, সেইহেতু চরিত্রটির বৈচিত্র্য-বহুমুখিতার সঙ্গে অখণ্ডতা ও ঐক্যও সংরক্ষিত হয়েছে।

আব্দাল্লার মধ্যে যে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা আছে, পরিস্থিতির প্রয়োজন-পূরণের জন্য যে কল্পনার সৃষ্টিধর্মিতা আছে—স্বাভাবিকভাবেই তা দাদা-র মধ্যে মেলে না। স্থানে স্থানে সাদৃশ্য ব্যতীত দুটি চরিত্রের বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়। দাদা ও আব্দাল্লা দুজনেই পরিস্থিতির প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে প্রতিক্রিয়া করেছে, কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্যও আছে। আব্দাল্লার প্রতিক্রিয়া অতীতমুখী, তার জীবনে অতীতে যা ঘটেছে কিংবা অতীতে সে যা দেখেছে,—বর্তমানে সে তারই বিবরণ-বৃত্তান্ত প্রদান করছে। দাদা সেখানে বর্তমানকেই ভিত্তি করেছে। দাদার কর্মকাণ্ডের সবটাই এই মুহূর্তের জীবন্ত বর্তমানকে অবলম্বন করে প্রদর্শিত। বুঝতে পারা যায়, বয়সের পার্থক্যই এইপ্রকার দৃষ্টিকোণের পার্থক্য রচনা করেছে। একজন যেখানে নানা বর্তমান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জায়মান, অপরজন সেখানে পরিপূর্ণরূপে পরিপক্ক। একজনের দেখাশোনা শেষ হয়েছে, অপরজনের কেবল শুরু হয়েছে।

উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য হল, আব্দাল্লা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ ও পক্ক বলে যেখানে বাগাশ্রয়ী, দাদা সেখানে কর্মাশ্রয়ী। আব্দাল্লা রান্নাঘরের নেপথ্যলোক থেকে যেন বহু কথার ভাণ্ডার রূপে হঠাৎ আবির্ভূত হয় এবং হঠাৎই প্রস্থান করে। তার সবই কেবল মুখের কথায়, কোনো বাস্তব কর্ম-প্রদর্শন নয়। দাদা সেখানে হাতে টাইমপীস্ বেঁধে খেতে যায়, লম্বা কোটের পকেটে বেড়ালের বাচ্চা নিয়ে কলেজ স্কোয়ারের পাদ্রীকে বোকা বানায়, সিঁড়িহীন বিপজ্জনক

ছাদে ওঠে দারোয়ানের ছেলেকে ছাদে-পড়ে-যাওয়া ঘুড়ি পেড়ে দেওয়ার জন্ম। সবই বাস্তব কর্ম।

তথাপি আমরা বলব, আব্দাল্লার সপ্রতিভ বাক্‌নিপুণতা এবং দাদার কর্ম-নিপুণতা যেখানে এক হয়ে গেছে, সেই যোগফলের মধ্যেই লেখকের পূর্ণ জীবন-তত্ত্বকে মিলবে। তিনি এযাবৎ পরিচিত ছিলেন মূলত ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, বাংলা সাহিত্য-সমালোচক, বাংলা ছন্দ-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ ও সংস্কৃত-ছন্দের ইতিহাসকার হিসেবে। 'নবাব কাহিনী'তে পাওয়া গেল সম্পূর্ণ অন্ত এক অমূল্যধনকে—কিশোর-সাহিত্যে যাঁর দখল অনায়াসসাধ্য। অত্যন্ত আক্ষেপের কথা, এই একটি ব্যতীত অপর সৃষ্টিধর্মী রচনার ক্ষেত্রে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখনী ধারণ করেননি।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : জীবনী-তথ্যপঞ্জী

"I have nothing but great admiration for the lecture we have listened to this evening."

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণের সূচনায় উচ্চারণ করেছিলেন এই বাক্যটি। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অভ কালচার কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় -প্রদত্ত লিখিত ভাষণের শেষে এই কথা বলে সভাপতি অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। ভাষণটি প্রদত্ত হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অভ কালচার-এ।

আজ সেই সভাপতি নেই, বক্তাও চিরবিদায় নিয়েছেন।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় (জন্ম : রবিবার ২৫শে মে ১৯০২, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮, পাটগ্রাম, জেলা—জলপাইগুড়ি, অধুনা বাংলাদেশের রংপুর জেলাভুক্ত। মৃত্যু : মঙ্গলবার প্রত্যুষ। ২০ মার্চ ১৯৮৪, ৬ চৈত্র ১৩৯০। ১২৮/২০ হাজরা রোড, কলকাতা ২৬) ছিলেন অব্যবহিত পূর্ববর্তী প্রজন্মের সাহিত্য-গবেষকবৃন্দের অন্যতম।

তাঁর পিতৃকুলের পরিচয় তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন এইভাবে :

"ভরদ্বাজ গোত্র, খড়দহ মেল। যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের বংশ। প্রপিতামহ অম্বিকাচরণ, পিতামহ কালাচাঁদ, পিতা দুর্গাচরণ।"

তাঁদের আদি বাসভূমি ছিল যশোহর জেলার (অধুনা বাংলাদেশ) নবগঙ্গা নদীতীরস্থ কাশীপুর গ্রামে। (নবগঙ্গা হল মধুমতী নদীর শাখানদী)।

সেখান থেকে কর্মোপলক্ষে দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় কুচবিহারের মহারাজার অধীনস্থ চাক্‌লাজাত এস্টেটের ঘোড়াঘাট গ্রামে চলে যান। এই এস্টেটের কোষাগারের দায়িত্ব পান ট্রেজারার হিসেবে। চাক্‌লাজাত এস্টেটের সদর দপ্তর ছিল দেবীগঞ্জে, যেটি ছিল দুর্গাচরণের কর্মস্থল। সেখান থেকে অবসর নিয়ে দুর্গাচরণ সপরিবারে চলে আসেন হুগলী জেলার ভাগীরথী নদীতীরস্থ বংশবাটি (অধুনা বাঁশবেড়িয়া) গ্রামে ১৯০৮-০৯ সালে। বর্ধমানের মহারাজার আনুকূল্যেই তিনি নিজস্ব জমি ও গৃহের স্থাপনা করেন বাঁশবেড়িয়াতে।

দুর্গাচরণের হাত ছিল লেখায়, নৈপুণ্য ছিল অভিনয়ে। দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটকে দিল্‌দারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, 'অম্বা' নামে একটি পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন। দুঃখের বিষয় তা মুদ্রিত হয়নি। দিল্‌দার-চরিত্রের প্রতি অমূল্যধনের বিশেষ পক্ষপাতের মূলে হয়ত-বা তাঁর পিতার দিল্‌দার-ভূমিকাভিনয় ক্রিয়াশীল ছিল।

দুর্গাচরণের স্ত্রীর নাম পান্নাময়ী দেবী। তিনি সুন্দরী ছিলেন। দুর্গাচরণ-পান্নাময়ীর চার পুত্র, চার কন্যা। চার পুত্র—মন্মথধন, অমূল্যধন, অমিয়ধন, অপূর্বধন। জ্যেষ্ঠ মন্মথধন বঙ্গ সরকারের আবগারি বিভাগের ইনস্‌পেক্টর ছিলেন। গীতবাদ্যে তাঁর নিপুণতা ছিল। সেজ অমিয়ধন প্রবেশিকা পরীক্ষায় অঙ্কে দুটি 'লেটার' পেয়েছিলেন। তিনি বাঁশবেড়িয়া জুট-মিলে সারা জীবন কাজ করেছিলেন। অমূল্যধনের মৃত্যুর তিন দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। ছোট অপূর্বধন বাঁশবেড়িয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কবিতা-লেখায় ও কিশোর-সাহিত্য-রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল। কয়েক বছর পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়।

অমূল্যধনের চার ভগিনী—নির্মলা, গোলাপসুন্দরী, উমাশশী, শশিমুখী। এদের মধ্যে দুই ভগিনীর বিবাহ হয় পূর্ববঙ্গে। সেজ ভগিনী উমাশশীর বিবাহ হয়েছিল হুগলী জেলার ত্রিবেণী-বৈকুণ্ঠপুরের বিখ্যাত সংস্কৃতপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশে।

দুর্গাচরণের জ্ঞাতি-সম্পর্কিত ভাই হলেন ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও সমাজবিজ্ঞানী রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

অমূল্যধনের বাল্যকাল কেটেছে রংপুর-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার অঞ্চলে। তৎকালীন রাজসাহী বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়ে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেবীগঞ্জ হাইস্কুলে তাঁর সহপাঠীদের অন্যতম ছিলেন যতীন্দ্রনাথ তালুকদার, আই. সি. এস.। অমূল্যধন বরাবরই সরকারী বৃত্তি পেয়ে বি. এ. পর্যন্ত পড়েন। ১৯২২-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণী পেয়ে উত্তীর্ণ হন। বি.এ. পরীক্ষায় আবশ্যিকপত্র বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করায় তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। বি. এ.-তে তাঁর অন্য পাঠ্যবিষয় ছিল অঙ্ক আর সংস্কৃত। বি. এ. পড়ার সময়ে ইডেন হিন্দু হস্টেলে অমূল্যধন দু'বছর ছিলেন। এসময়ে তাঁর সহপাঠী ও সহ-আবাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—শৈবালকুমার গুপ্ত, আই. সি. এস., সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত,

তারাপদ মুখোপাধ্যায় (দুজনেই প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক), চারুচন্দ্র চক্রবর্তী ('জরাসন্ধ' নামে খ্যাত, অমূল্যধনের আত্মীয়), বিজয়কুমার ভট্টাচার্য (বি. ই. এস., হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক); শৈবালকুমার ও বিজয়কুমার সহপাঠী, বাকিরা সমসাময়িক। এঁদের সকলের সঙ্গেই তাঁর আজীবন বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর অমূল্যধন সাংসারিক কারণে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হতে পারেননি। একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে অ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল অভ বেঙ্গলের আপিসে অডিটর নিযুক্ত হন। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ও দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য ঐ পদে তাঁকে স্থায়ী করা হয়নি। ১৯২৬-এ নন্-কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক পান।

১৯২৭-এ রংপুর কারমাইকেল কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ পর্যন্ত সেখানে কাজ করেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে ১৯৩৮ সালে কলকাতার আশুতোষ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

১৯২৮ সালে পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্নের দৌহিত্রী, গিরীন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতিভাময়ী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা শিবরাণী দেবীকে বিবাহ করেন।

সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ঐতিহাসিক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শিবরাণী দেবীর জ্ঞাতিভ্রাতা। সেই সূত্রে অমূল্যধনের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারে অমূল্যধনের মামাতো ভাইয়ের বিবাহ হয়।

রংপুরে থাকাকালীন অমূল্যধন বাংলা ছন্দ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। 'অলকা', 'বিচিত্রা' ও ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় ছন্দ সম্পর্কে লেখালেখি শুরু করেন।

তাঁর নিজের কথায় :

"রংপুর কলেজে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, রবীন্দ্রনাথের প্রথমযুগের ছাত্র গৌরগোবিন্দ গুপ্তের প্রেরণাতেই ছন্দ নিয়ে লেখার সূত্রপাত। সেটা উনিশশো সাতাশ। 'বলাকা'র ছন্দ নিয়ে কথা হতেই গৌরবাবু বললেন, বেশ তো, লেখো না! শুধু বলাকা নয়, বাংলা ও সংস্কৃত কবিতার ছন্দ নিয়ে লেখালেখি করেছি

তখন।···বেশ মনে আছে। গৌরবাবু বললেন, কই হে অমূল্য, কি করলে ? সেই রাত্রেই লিখতে বসলাম। মাস ছয়েকের মধ্যে থিসিস্ শেষ। অধ্যাপক মণীন্দ্র রুদ্র, আজ আর নেই, ও-ইস্টাইপ করে দিলে। 'স্টাডিজ ইন বেঙ্গলী প্রোসোডি। ভল্যুম ওয়ান : প্রিন্‌সিপলস্'। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। সুনীতিবাবু ছিলেন একজন পরীক্ষক। উনি পড়েই খুব অবাক হয়ে নিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে। তখন (১৯৩১) কবির সত্তর বছর পূর্তি উৎসব চলছে। সঙ্গে গেলেন রথীন হালদার আর কালিদাস নাগ। তিন দিন ছিলাম। রোজ দু'বেলা আলোচনা হ'ত। বললাম, আপনি কবি, স্রষ্টা, ছান্দসিক। কবি স্মিত হেসে বললেন, আমি যা পারিনি, বৈজ্ঞানিকভাবে তুমি তা করেছ। 'বলাকা' থেকে কবি পড়তে লাগলেন। আমি যেভাবে স্ক্যান করেছিলাম, প্রশান্ত মহলানবীশ মিলিয়ে পড়ে বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই আছে। ধূর্জটিপ্রসাদ একসময় দিলীপ রায়কে চিঠিতে জানান, আমার ছন্দোসূত্রই ঠিক।" [বিচিত্রা : 'অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়'। কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়। 'অমৃত', বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২৭, ২রা অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ / ১৮ নভেম্বর ১৯৭৭।]

ঐ সাক্ষাৎকারেই অমূল্যধন আরো বলেন :

"বাংলা ছন্দ সাঙ্গীতিক, মিউজিক্যাল। কবিতার লাইনকে পর্বে ভাগ করা হয়। পর্ব-পর্বাঙ্গের গোড়ার কথাটা ত আমার 'বাংলাছন্দের মূলসূত্র' বইতে পড়েছ। কি জানো, হয়ত আমার মত অনেকে মানবেন না, কিন্তু বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দ নিয়ে গবেষণা করতে করতে আমি যেভাবে এর বৈজ্ঞানিক দিকগুলি তুলে ধরেছি, বলতে পারি, মহর্ষি পিঙ্গলও আমার মতো করে সংস্কৃত ছন্দকে বোঝেন নি। ছন্দবোধ দার্শনিক ব্যাপার নয়, বৈজ্ঞানিক।"

১৯৩০-এ 'প্রিন্‌সিপল্‌স্ অভ বেঙ্গলী প্রোসডি' গবেষণাপত্র দাখিল করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (PRS) লাভ করেন, এবং মোয়াট স্বর্ণপদক পান।

১৯৩৮-এ কলকাতার আশুতোষ কলেজে যোগ দেন এবং ১৯৬৫ পর্যন্ত আশুতোষ কলেজ ও যোগমায়া দেবী কলেজে (পূর্বে আশুতোষ কলেজের প্রাতর্বিভাগ) পড়ান। ১৯৫৬ সাল থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে ইংরেজির পার্ট-টাইম লেকচারার নিযুক্ত হন এবং সেখানে

দশ বছর পড়ান।. ১৯৬৫-তে যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে অবসরগ্রহণ করলে পাঁচ বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ-জি-সি-র অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-রূপে গবেষণা করেন। ১৯৬৮-তে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনন্যসাধারণ গবেষণার জন্য' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক' দিয়ে সম্মানিত করে।

'বাংলাছন্দের মূলসূত্র' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (আগস্ট ১৯৩২)। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে আরো আটটি সংস্করণ হয়।

১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে 'হার্ট-ব্লকেড' হয়ে অমূল্যধন অচৈতন্য হয়ে যান। তিনমাস বাদে বুকে 'পেস্‌মেকার' লাগিয়ে ফিরে আসেন এস্‌. এস্‌. কে. এম্‌. হাসপাতাল থেকে। পরবর্তী দশ বছরে আরো তিনবার নতুন নতুন 'পেস্‌মেকার' লাগানো হয়।

দশ বছরের (১৯৫১—৬১) মধ্যে প্রকাশিত হয় আরো তিনখানি বই : 'কবিগুরু' (১৯৫১), 'আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা' (১৯৬১), 'রবীন্দ্রনাথের মানসী' (১৯৬১)।

বারবার হাসপাতালে যাওয়া ফিরে আসার মধ্যেই তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান ; এসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে সংস্কৃত ছন্দের উপর প্রবন্ধ পড়েন ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যে। এই অসাধারণ গবেষণার ফল 'Sanskrit Prosody : Its Evolution' (1976)।

এ সম্পর্কে অমূল্যধনের উক্তি :

"এসিয়াটিক সোসাইটিতে সংস্কৃত ছন্দের ওপর একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছি। সুনীতিবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিদ্যায়তনের চেয়ারম্যান প্রফেসর লুডো রোশারের সঙ্গে। করমর্দন করে বললেন : 'অসমমাত্রিক সংস্কৃত ছন্দের বিষয়ে আপনার প্রবন্ধ খুব ভাল লাগল। অনেক কিছু শিখলাম।' পরে রোশার এক চিঠিতে লিখেছিলেন : 'সংস্কৃত ছন্দের জ্ঞান আমাদের সীমিত। এসিয়াটিক সোসাইটিতে আপনার বক্তৃতা আমার মনে আছে। আপনার মত গভীর অধ্যয়নের ফলে আপনার পদ্ধতি ও আবিষ্কার অনুসরণ করে এটি বুঝবার সুযোগ পাব।" (উপরিধৃত সাক্ষাৎকার)

এই অসাধারণ গবেষণা-গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লেখেন :

"I have great pleasure in commending this very fine piece of research to all lovers of Sanskrit and Indo-Aryan poetry and metrics interested in the question of the origin and development of Sanskrit prosody. A complete and satisfactory account of the development of Indo-Aryan metrics during the last two thousand and five hundred years, still remains a desideratum. Here the author of the present treatise has stepped to fill up the lacuna."

অমূল্যধনের অসাধারণ গবেষণা কর্মের স্বীকৃতিতে এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে 'ফেলো' নির্বাচিত করেন (৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮)।

অমূল্যধন ইংরেজি ও বাংলায় বহু প্রবন্ধ লেখেন। গ্রন্থবদ্ধ হয়নি এমন রচনার সংখ্যা কম নয়। 'বেতালভট্ট' ছদ্মনামে তিনি ব্যঙ্গ ও রম্য-রচনা লেখেন ('শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত "কাব্যের উপেক্ষিত", পৌষ ১৩৪৯, ডিসেম্বর ১৯৪২ ; "তোমরা ও আমরা", চৈত্র ১৩৫৩, মার্চ ১৯৪৬ ; "পূজোর ছুটি", ভাদ্র ১৩৫৭, আগস্ট ১৯৫০)। আনন্দবাজার বার্ষিক সংখ্যাগুলিতে তাঁর বেশ-কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

অমূল্যধনের ছয় পুত্র (অরুণকুমার, বরুণকুমার, অজয়কুমার, অশোককুমার, অসীমকুমার ও অমিতকুমার) ও তিন কন্যা (রেণুকা, মঞ্জুলিকা, শান্তা)। এদের মধ্যে অসীমকুমার শৈশবেই মারা যায়।

অমূল্যধনের ছাত্র, বন্ধু ও অনুরাগীরা তাঁকে প্রথম প্রকাশ্য সংবর্ধনা দেন তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে (২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬, ১১ মে ১৯৭৯) দক্ষিণ কলিকাতার দেশবন্ধু গার্লস কলেজ ভবনে। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁর ছাত্র অধ্যক্ষ ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু। দ্বিতীয় প্রকাশ্য সম্বর্ধনা তিনি পান পরবৎসর (১১ মে ১৯৮০) তানসেন সঙ্গীত সভাগৃহে। ১৯৮১-র ফেব্রুআরিতে নিজ ঘরে পড়ে গিয়ে হিপ্ জয়েণ্ট ভেঙে যাওয়ায় তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। পরবর্তী তিন বছর শুয়ে-বসে কাটান। এসময়ও তিনি বই পড়তেন, প্রুফ দেখতেন। ১৯৮৩-তে প্রকাশিত হয় 'বাংলাছন্দের মূলসূত্র' ৭ম সংস্করণ। ১৯৮০-তে প্রকাশিত হয় ছোটদের জন্য

লেখা গল্পগুচ্ছ 'নবাব কাহিনী'। তখন তিনি হাসপাতালে।

অবশেষে ১৯৮৪ সালের ২০ মার্চ, ১৩৯০ বঙ্গাব্দের ৬ চৈত্র ব্রাহ্মমুহূর্তে ৮২ বছর বয়সে অমূল্যধন লোকান্তরিত হন।

অমূল্যধন ছিলেন পুষ্পপ্রেমিক। রংপুর কারমাইকেল কলেজে থাকাকালীন তাঁর বাংলোর বাগানে ছিল গোলাপফুলের সমারোহ। অমূল্যধন ছিলেন খেলার সমজদার। ক্রিকেট, হকি, ফুটবলে তাঁর উৎসাহ ছিল। বিশেষত ক্রিকেটে। কর্মজীবনের প্রথমভাগে বহুবার ক্রিকেটের আম্পায়ার-রূপে তাঁকে দেখা গেছে।

শেষজীবনে তাঁর নিত্য ব্যবহার্য গ্রন্থের মধ্যে ছিল 'স্তোত্রাবলী' ও 'স্তবকুসুমাঞ্জলি'। আর ইন্দো-এরিয়ান সাহিত্য ও ছন্দসম্পর্কিত আলোচনা-গ্রন্থাদি, শেক্সপীয়র-রচনাবলী ও ইংরেজি রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার বই ছিল তাঁর চিরসঙ্গী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী এবং রবীন্দ্ররচনাবলী ছিল অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর টেবিলে ছিল তাঁর পিতা দুর্গাচরণকে উপহার-দত্ত 'বাইবেল' (১৮৮৮ সংস্করণ)। এটি দুর্গাচরণকে উপহার দিয়েছিলেন পাদ্রী জয়নাথ চৌধুরী (ময়মনসিং)। আর ছিল দুটি ইংরেজি কবিতার সংকলন—'The Golden Treasury of Modern Lyrics', Volume I, Ed. by L. Binyon. এটি অমূল্যধন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরস্কার পেয়েছিলেন—লেখা আছে 'University Prize 1926', আর Leaves from English Poetry—যেটি তিনিই সঙ্কলন করেছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

অমূল্যধনের গ্রন্থাদি

বাংলাছন্দের মূলসূত্র (১ম সং শ্রাবণ ১৩৩৯, আগস্ট ১৯৩২। ৭ম সং ফাল্গুন ১৩৮৯, মার্চ ১৯৮৩। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

কবিগুরু (১ম সং রাসপূর্ণিমা ১৩৫৮, ১৯৫১। ২য় সং দশহরা ১৩৭১, ১৯৬৪। মিত্রবিহার, কলকাতা-৬)।

আধুনিক সাহিত্যজিজ্ঞাসা (শ্রীপঞ্চমী ১৩৬৭, ১৯৬১, বীডার্স কর্নার, কলকাতা-৬)।

রবীন্দ্রনাথের মানসী (জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১, ১৯৬১, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯)।

নবাব কাহিনী (রথযাত্রা ১৩৮৭, ১৯৮০, প্রাইমা পাবলিকেশনস্‌, কলকাতা-৭)।

Sanskrit Prosody : Its Evolution (1976, Saraswat Library, Calcutta-6).

Leaves from English Poetry (co-edited with Srikumar Banerji, 1952, Orient Longmans, Calcutta-13).